সংখ্যা-১-১২
১৩৫৯-১৩৬০
370.5
Sh 61

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ | ১ম সংখ্যা

আলোচনা

নূতন বর্ষ

এই অগ্রহায়ণে শিক্ষা একাদশ বর্ষে পড়িল। অনেক বাধা বিঘ্নের মধ্যে বৎসরটি কাটিয়াছে, তবু আমাদের লেখক, গ্রাহক ও পাঠকদের সহানুভূতি ও সহযোগিতায় 'শিক্ষা'র কাজ স্থিরভাবে চলিয়াছে। কাগজখানার স্বল্প পরিসরে আমরা একটি বিশেষ লক্ষ্য ধরিয়া চলিয়াছি। স্বাধীন ভারতের এই ভাঙাগড়ার সময়ে দেশের শিক্ষার দিকে দৃষ্টি না থাকিলে, উন্নতির সমস্ত পরিকল্পনাই যে বৃথা যাইবে; পঞ্চবার্ষিকী বা অন্য কোন পরিকল্পনাই তো প্রাণবন্ত হইবে না, যদি জাতির শিক্ষার বুনিয়াদ পাকা না হয়। শিক্ষার সমস্যাকে আজ তাই শুধু একদিক দিয়া দেখিলে চলিবে না, জাতীয় কল্যাণের একটি সমগ্রভাবকে লক্ষ্য করিয়া নানা দিক দিয়া শিক্ষাকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিতে হইবে। সেই বিপুল কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে 'শিক্ষা' পত্রিকা যদি সামান্যতম অংশও নিতে পারে, তবেই আমাদের চেষ্টা সার্থক হইবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন

বিগত ২১শে নভেম্বর শ্রীলক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়ারের নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন কলিকাতায় আসেন। কমিশনের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীদের কথা আমরা 'শিক্ষা'য় পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। এই কমিশন বাংলায় আসিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রী অপূর্বকুমার চন্দকে কমিশনের 'কো-অপ্‌টেড্' সদস্য করিয়া লন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার, বিশিষ্ট অধ্যাপক ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, শিক্ষাসচিব, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কমিশনের কাছে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করেন। মাধ্যমিক শিক্ষার মান, পাঠক্রম, শিক্ষার মাধ্যম, রাষ্ট্রভাষা ও ইংরাজি ভাষার ভবিষ্যৎ, বিদ্যালয়ের পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদা ইত্যাদি নানা বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। কমিশন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ঘুরিয়া তাঁহাদের প্রশ্নোত্তরের সংগৃহীত ফলাফলের বিষয় আগামী মে-জুন মাসের মধ্যে জানাইবেন বলিয়া জানা গেল।

মাধ্যমিক কমিশন তাঁহাদের প্রশ্নগুলির কি উত্তর

পাইয়াছেন, এখনও জানা না গেলেও বিদ্বান ও চিন্তাশীল শিক্ষাব্রতীদের সুচিন্তিত মতামতের উপর যে কাঠামো গড়িয়া উঠিবে, তাহার ফল অবশ্যই ভাল হইবে। কিন্তু শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে কি মতামত পোষণ করেন, তাঁহাদের নিজস্ব কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, থাকিলে তাহার সঙ্গে কমিশনের সাক্ষ্যে প্রাপ্ত মতামতের কোথায় মিল ও কোথায় অমিল, ইত্যাদি সুবিস্তৃত ভাবে জানিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

নিখিল ভারত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী কে এম্ মুন্সীর নেতৃত্বে কাশীতে যে বিশ্ব সংস্কৃত পরিষদের অধিবেশন হয়, তাহাতে সমস্ত ভারতের জন্য একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিষদ রাষ্ট্রীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই বিষয়ে অবহিত হইতে বলেন। তাঁহাদের মতে প্রাচীন ও আধুনিক দুই পদ্ধতিতেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার কাজ চলা উচিত। শিক্ষার মাধ্যম হইবে সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতেরা বিভিন্ন দেশে গিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চাকে পুনর্জীবিত করিবেন।

এই পরিষদের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে এবং পরবর্তী উচ্চ শিক্ষার স্তরেও সংস্কৃতকে অবশ্য-পাঠ্য করিতে হইবে। বিশ্ব পরিষদ্‌বৃত্তি স্থাপন করিতে হইবে, যাহাতে বিখ্যাত পণ্ডিতগণকে এদেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনা সম্ভব হইতে পারে।

উপসংহারে শ্রীযুক্ত মুন্সী বলেন, আমাদের দেশের বিখ্যাত সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ৮০০।৯০০ বৎসর পূর্বে আক্রমণকারীদের হস্তে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আজও আমরা দেশে বিদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জন্য পরিচিত। এই ভাষা ও সাহিত্যকে তাহার পূর্ব গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে সংস্কৃতের অনুরাগীদের একান্ত মনে সাধনা করিতে হইবে, ধাপে ধাপে চেষ্টা করিয়া এই ভাষাকে আবার জনপ্রিয় করিতে হইবে।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজি পাঠ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ইংরাজির তিন পরীক্ষাপত্রের পরিবর্তে দুই করা হউক, আর পাশের নম্বর বর্তমান ৩৬এর বদলে ৩০ করা হউক।

বর্তমানে ইংরাজির পাশ নম্বর তিন পত্র মিলিয়া ১০৮, বাংলায় ৩৬, অন্যান্য বিষয়ে ৩০। এই কমিটি বলেন, এই বৈষম্য না রাখিয়া সব বিষয়েই পাশের নম্বর সমান করা হউক।

জাতিগঠনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যুক্তপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত মুন্সীর কয়েকটি কথা আমাদের খুবই ভাল লাগিল। শিক্ষার পাঠকদের জন্য এখানে তাহার মর্মার্থ উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীযুক্ত মুন্সী বলিলেন, আজ দেশের নানা দিকে একটি নূতন প্রাণের স্পন্দন দেখা যাইতেছে, কর্মীদের মনে নূতন আশা ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, কেবল বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই যেন নূতন জীবনের কোন স্পর্শ লাগে নাই।

কিন্তু সৃজনের কাজ তো বসিয়া থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে দেশের নৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রচেষ্টার কাজে অবশ্য যোগ দিতে হইবে, নতুবা আবর্জনার মত পথের পাশে তাহাদের স্থান হইবে। তাই আজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সম্মুখে দুইটি লক্ষ্য। এক, আমাদের সামাজিক জীবনধারার দ্রুত পরিবর্তন, দ্বিতীয় লক্ষ্য, জাতির জীবনগঠনের যাহা পরিপন্থী সেই সব জঞ্জাল দূর করা। জীবনধারায় যদি পরিবর্তন সাধন না করি, তবে আমাদের অর্থনৈতিক

বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, আর দৃঢ়হস্তে যদি দ্বিতীয় কাজটি না করি, তবে অদূর ভবিষ্যতে আবার পরের দাসত্বই আমাদের করিতে হইবে।

সেজন্য এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে আমাদের দেশের বিদ্যা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মন্দিরের মত করিয়া গড়িতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণাগার, সেই গবেষণাগারে শিক্ষক নিজের জাতীয় সংস্কৃতির মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবেন, আর নিজের সৃজনী শক্তির দ্বারা আপনার কর্ম ও চিন্তাধারায় সজীবতা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করিবেন। তাহার চেয়েও বড় কথা, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের হওয়া উচিত এক একটি আশ্রমের মত, যেখানে চিন্তাশীল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ এক মন্ত্র এক লক্ষ্য লইয়া তাঁহাদের সাধনা-লব্ধ সত্য ও জ্ঞানের প্রয়োগ ও অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকিবেন।

শক্তিগড়ে নূতন শিক্ষাকেন্দ্র

বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের শিক্ষাধিকার অনতিবিলম্বে বর্ধমান জেলায় শক্তিগড় উন্নয়ন ব্লকে একটি নূতন বুনিয়াদী শিক্ষণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। আরও জানা গিয়াছে যে, শক্তিগড় উন্নয়ন ব্লকের প্রাথমিক শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার শ্রীযুক্ত বিমলকুমার ভট্টাচার্যের উপর অর্পিত হইয়াছে। সমাজ উন্নয়নের কার্যে প্রাথমিক শিক্ষার যে গুরু দায়িত্ব রহিয়াছে তৎসম্বন্ধে সচেতন থাকিয়াই সরকার শ্রী ভট্টাচার্যের ন্যায় কৃতবিদ্য, দেশপ্রেমী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির উপর এই ভার অর্পণ করিয়াছেন। উন্নত প্রণালীতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষকসংগ্রহ কর্মিসংগ্রহ ইত্যাদি যাবতীয় কার্যের ভার শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য লইতে স্বীকৃত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য 'শিক্ষা'র পুরাতন লেখক, তাঁহার লেখায় আমাদের পাঠক পাঠিকারা যে সুস্থ ও সতর্ক দৃষ্টির পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে আমরা সকলেই আশা করিতে পারি যে শক্তিগড়ে জাতির নূতন শক্তির সন্ধান মিলিবে।

শিশুরা জাতির সম্পদ

মধ্যভারতের সাঁচির বৌদ্ধস্তূপটি সৌন্দর্যে ও গাম্ভীর্যে অপরূপ; সম্প্রতি বহু শতাব্দীর মৌন ভঙ্গ করিয়া সাঁচির স্তূপের কাছে দেশের ও বিদেশের বহু নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। সাঁচির অদূরে প্রাচীন নগরী বিদিশা, বর্তমান ভিলসা, সেখানে একটি শিশুবিদ্যালয় এই সময়ে খোলা হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রাচীন কীর্তির গৌরবের আলোকে এই শিশু বিদ্যালয়টি দেশের শিশুদের কল্যাণ করুক, এই আমাদের কামনা।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, শিক্ষার মানে নয় বই মুখস্থ করা, আর পরীক্ষায় পাশ করা। শিক্ষার প্রণালী যদি ভাল হয় তবে বই বেশি লাগে না; লাগে ব্যবহারিক শিক্ষা। সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া চলাই মানুষের লক্ষ্য, আর ভাল শিক্ষা পদ্ধতি তাহাকেই বলিব যাহা সেই লক্ষ্যপথে চলিবার উপযোগী শরীর ও মন গঠন করিয়া দিতে পারে। এই জন্যই আজ দেশে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তন আবশ্যক, বুনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তিতে সমগ্র শিক্ষার বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন, শিশুরা দেশের সম্পদ, কিন্তু আমাদের দেশের শিশুরা সর্বাঙ্গসুন্দর বিকাশের সুযোগ সুবিধা পায় না। এদেশের শিশুরা অন্য দেশের শিশুদের চেয়ে কোন অংশে তো কম নয়, অভাব তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিচালনার। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহারাও ভবিষ্যতে বড় হইতে পারিবে। আমাদের উচিত প্রাক্-বুনিয়াদি শিক্ষার প্রচলন করিয়া অতি শৈশবেই তাহাদের চরিত্র গঠনের চেষ্টা করা।

পণ্ডিতজীর এই ভাষণে বুনিয়াদী ও প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার উল্লেখে আমরা আশান্বিত হইতেছি। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, আমাদের দেশ গ্রামের সমষ্টি, এই গ্রামে-গাঁথা দেশের ছোট বড় সকলকে যদি প্রকৃত শিক্ষা দিয়া চালিয়া সাজাইয়া কাজের মানুষ তৈয়ারি করিতে হয়, তবে বুনিয়াদী শিক্ষা ছাড়া অন্য কোন্ পন্থা এই দরিদ্র দেশে সম্ভব?

বিপদ হইতেছে এই যে আমরা অধিকাংশ সময়েই যাহা দেখি তাহা নামেই বুনিয়াদী, কাজে বুনিয়াদী নয়।

——

ভূদেববাবুর শিক্ষাব্রতের একপর্ব

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

মনস্বী ভূদেবচন্দ্রের নাম বাংলা সাহিত্যে সুনির্দিষ্ট। সমাজে, ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে বাঙালী হিন্দুর যাহা শিখিবার তাহার সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি বিস্তারিত নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া শুধু শিক্ষাপ্রসারের চেষ্টাও তিনি জীবনে করিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ের পর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লীগ্রামের মধ্যে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার করিবেন, এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আজকাল আমরা দেশে নূতন প্রাণসঞ্চারের উপায় ভাবিতেছি। তাঁহার জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণের কথা এই সময়ে একবার স্মরণ করিতে চাই।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পুত্র; পিতার সাহচর্যে বড় হইয়াছেন, তথাপি নিজের একটা গোঁ আছে, যাহা স্থির বুঝিবেন তাহা শক্ত করিয়া ধরিবেন, সেইজন্যই তো ভূদেব পিতার প্রথমটায় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ইংরেজি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। যখন দেখা গেল, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কতকগুলি অংশ তৈরি হয় নাই, তৈরি করিবার জন্য সময় এক-রাত্রিও চাহিয়া পাইলেন না, অগত্যা নীরবে প্রহার খাইতে হইল, স্বতই তখন তাঁহার মন বলিল—সংস্কৃত পড়িয়া যদি লোকে এত নিষ্ঠুর হয়, তবে ইংরেজিই পড়িব। আজকার দিনে আমরা এ বিচারে কৌতুক অনুভব করিতে পারি, কিন্তু কিশোর ভূদেবের চিত্তের ইহা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাইল। কৈশোরে সনাতন ধর্মের বিষয়ে এক সময়ে তিনি খানিকটা সন্দিহান হইয়াছিলেন, ইহাও বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু সে সন্দেহ অল্পকালেই দূর হইল, বিচারে স্বধর্ম ভাল প্রতিপন্ন হইল। ইংরেজ শিক্ষকের সঙ্গে থাকিয়া, চিন্তার নানা দিক হইতে আলোচনা করিয়া, তাঁহার চিত্তের সঙ্কীর্ণতা বাড়িল না, উদারতাই বাড়িল।

এই উদারতা তাঁহাকে শিক্ষালাভের পর এক নূতন কর্মে প্রণোদিত করিল—খানিকটা দেশি টোলের অনুকরণে তিনি বিদ্যালয় আরম্ভ করিলেন—সেখানে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে খানিকটা স্বধর্ম শিক্ষাও দেওয়া হইত। ১৮৪৭ খৃঃ, অর্থাৎ এখন হইতে একশত বৎসরেরও কিছু অধিক কাল হইল, তিনি চন্দননগরে এক সেমিনারি স্থাপন করিলেন। ধর্মপ্রচারকদের মত উৎসাহ লইয়া তিনি এই কার্যে ব্রতী হন। অবশ্য অল্পদিন মধ্যেই স্কুলের উন্নতি হইল—ছাত্রসংখ্যা একশতে গিয়া দাঁড়াইল, বিদ্যালয়ের মাসিক আয় হইল ৮০৲ আশি টাকা। এই টাকা দিয়া মালীর ও বিল-সরকারের বেতন দেওয়া হইত, বাড়ী ভাড়াও দেওয়া হইত। যাহা

উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহাতে শিক্ষকদের আহারাদির ব্যয় নির্বাহ হইত। হায়রে সেকাল!

তরুণ শিক্ষকেরা সকলে প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া পালাক্রমে কোনও প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় কবির উৎকৃষ্ট কবিতা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেন। তাহার পর সকলে একত্রে গঙ্গাস্নানে গিয়া সাঁতার দিতেন। অন্য আসবাবপত্র দূরে থাকুক, প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট পরিধেয় বস্ত্রও ছিল না—আলনায় কয়েকখানি কাচা কাপড় ও চাদর ঝুলিত। সরল জীবন যাপন ও উচ্চ চিন্তা—এই ছিল তাঁহাদের মন্ত্র।

উপরে তরুণ শিক্ষকদের আহারাদির ব্যয় নির্বাহের কথা লিখিয়াছি, সে আহারই বা কি? সকালে বিকালে পেট ভরিয়া সামান্য একটা তরকারি উপলক্ষ্য করিয়া, কখনো বা শুদ্ধ লবণ দিয়াই তাঁহারা ভাত খাইতেন; জলখাবার কিছু বরাদ্দ থাকিত না। বিকালে চন্দননগরে গঙ্গার ধারে বাঁধানো রাস্তায় সকলে এক আধ ঘণ্টা বেড়াইতেন। ভূদেব প্রায়ই রাত নয়টায় শুইতেন, ভোর তিনটায় উঠিতেন। তিনিই ছিলেন এইসব তরুণ উৎসাহী শিক্ষকদের কেন্দ্র; সকল বিষয়ে তাঁহার কথাই ছিল প্রামাণ্য। তিনি নিজে প্রথম শ্রেণীতে Richardson's Selections পড়াইতেন।

প্রায় এক বৎসর পরে ভূদেববাবু এই ধরণের আধুনিক টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা হইতে কোনও কারণে বিরত হন। সে কারণ, পিতৃভক্তি ও পারিবারিক কর্তব্যবোধ। তাহাও তাঁহার চরিত্রের এক উজ্জ্বল দিক। ঘটনাচক্রে পিতৃ-কর্মে তাঁহাকে অর্থগ্রহণ করিতে অর্থাৎ চাকুরের জীবনে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। শিক্ষাপ্রসারের দিক তাহাতে অবশ্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই; নানাভাবে তিনি দেশে শিক্ষার ধারা পুষ্ট করিতে থাকেন, সে আর এক কথা।

কিন্তু চন্দননগর সেমিনারির শাখা হুগলী জেলার শ্রীপুরে স্থাপিত হয়, এবং উলা শান্তিপুর প্রভৃতি নানা স্থানে আরও শাখা প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা ভূদেববাবুর ছিল। তাঁহার সহকর্মীর চেষ্টায় স্থাপিত বহরমপুরের অনুরূপ একটি স্কুলে মহারাণী স্বর্ণময়ী মাসিক ৭০৲ ও তদানীন্তন বড়লাটের প্রতিনিধি ৫০৲ সাহায্য দিতে রাজি থাকেন। আমূল, তমলুক ও শিয়াখালা—এই তিন জায়গায়ও বিদ্যালয় হয়। ভূদেববাবুর অনুপ্রেরণা অল্পেই শুখাইয়া যায় নাই, এবং শিক্ষাব্যাপারে তাঁহার তরুণ বয়সের এই উৎসাহ ও চেষ্টা বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। তাই ভূদেব-জীবনীতে বিবৃত কাহিনীর এখানে পুনরুক্তি করিলাম। পারি-প্রমিক প্রায় কিছুই না লইয়া শিক্ষাদান করিব, প্রাচীন চতুষ্পাঠীর ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চেষ্টা করিব, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাঠের ধারা থাকিবে উদার, ইউরোপীয় কাব্য ও বিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিব না, তথাকথিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গণ্ডী না মানিয়া বিদ্যাকে এক অখণ্ড জ্ঞানরূপে গ্রহণ করিব, কঠোরতার সঙ্গে এইরূপ ধারণা লইয়া জীবনের পথে যাত্রা আরম্ভ করার দুর্নিবার সাহস তরুণ ভূদেববাবুর ছিল, এবং আজ আমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি তাহার মূলে বহু কারণের সঙ্গে ভূদেববাবুর জীবনের এই স্বল্পকালব্যাপী সাধনাও উপেক্ষণীয় নহে। এইরূপ পরীক্ষামূলক কর্মের দ্বারাই শিক্ষার ধারা প্রাণবন্ত থাকে।

পশ্চিম বঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা

শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে যে সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষা শুরু হয় বাঙলা দেশে সে সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করা সম্ভব হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশে তখন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্তনের সুযোগে কংগ্রেস-গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই গভর্মেণ্ট উদ্যোগী হয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করেন। বাঙলাদেশে কংগ্রেস-গভর্মেণ্ট হয় নাই বলে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তিত হয় নাই। বাঙলায় বুনিয়াদী শিক্ষা সরকারি ভাবে আরম্ভ হয় দেশ স্বাধীন হবার পর।

সরকারি ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা আরম্ভ হবার কিছু পূর্বেই বে-সরকারি ভাবে কংগ্রেস কর্মীদের চেষ্টায় কয়েকটি জেলায় কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব কর্মীদের জনবল ছিল না, অর্থবলও ছিল না। তার ফল হয় এই যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয় আরম্ভ করলেও যে ভাবে সেগুলিকে গড়ে তোলা প্রয়োজন ছিল তা হয়ে ওঠে না। আশা করা গিয়েছিল, জাতীয় গভর্মেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর গভর্মেণ্টের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য পাওয়া যাবে এবং বিদ্যালয়গুলিকে ভাল করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু তা হয় নাই। বিদ্যালয়গুলিকে ভাল করে গড়ে তোলা দূরে থাকুক, সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন গভর্মেণ্ট অনুভব করেন না। তার ফলে কতকগুলি বিদ্যালয় উঠে যায়, কয়েকটি সরকারি শিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করে। এখন আর স্বাধীন-ভাবে পরিচালিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় নাই বললেই হয়। নিখিল ভারত শিল্পরক্ষা সমিতির পরিচালিত শিল্পসদনগুলিতে যে কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই কয়েকটি এবং পশ্চিম বঙ্গের একটি সংঘ কর্তৃক পরিচালিত এক বুনিয়াদী বিদ্যালয় আজ বোধ হয় একমাত্র বেসরকারি বুনিয়াদী বিদ্যালয়।*

স্বাধীনতা লাভের পর সরকারি ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। গভর্মেণ্ট বুনিয়াদী শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষানীতি স্বরূপে গ্রহণ করেছেন এবং সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে ক্রমে ক্রমে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবেন বলে স্থির করেছেন। তার আয়োজনও যথারীতি হয়েছে। প্রথম বৎসরেই শিক্ষণ-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক তৈয়ারীর জন্য দুটি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় এবং শিক্ষক তৈয়ারীর জন্য ছটি শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করা হয়েছে। শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় দুটিকে একত্র করে একটি মহাবিদ্যালয় করা হয়েছে, এবং আরও নাকি শিক্ষণ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অধ্যাপক, শিক্ষক ও পরিদর্শক তৈয়ারির দিক্ থেকে একটা মোটামুটি ব্যবস্থা এখন হয়েছে বলা যায়।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও কিছু কিছু করে হচ্ছে। গত তিন বছরে গড়ে ৫০টি করে ১৫০টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় হয়েছে। এ ছাড়া একটি শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয় ও ১১টি শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ১১টি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও আছে।

বর্তমানে সমস্ত পশ্চিম বঙ্গে প্রায় ১৪,০০০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। স্কুলে যাবার বয়সের সব ছেলে আজ স্কুলে যায় না। প্রাথমিক শিক্ষা যখন সর্বত্র আবশ্যিক হবে এবং এই বয়সের

* বর্তমান হরিজন সেবক সংঘ পশ্চিমবঙ্গে তিনটি হরিজন বিদ্যালয় পরিচালনা করেন—ভায়মণ্ডহারবারে একটি, সুতাহাটার নিকটে একটি ও মেদিনীপুরের আলোকক্ষেত্রে একটি।

সব ছেলে মেয়ে স্কুলে যাবে তখন এর চেয়ে অনেক বেশি বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে। বুনিয়াদী শিক্ষা যখন জাতীয় শিক্ষানীতি, তখন এই সমস্ত বিদ্যালয়ই বুনিয়াদী বিদ্যালয় হবে। এই হিসাবে বর্তমানে যে কয়েকটি বুনিয়াদী বিদ্যালয় হয়েছে তা বলতে গেলে কিছুই নয়। এখন যে হারে বছরে বছরে বুনিয়াদী বিদ্যালয় হচ্ছে তাতে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা যদি নাও বাড়ে তা হলেও সবগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত করতে প্রায় ২৮০ বছর লাগবার কথা। এই দিক থেকে দেখলে সমস্ত বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয় করার আশা এক রকম দুরাশা বলেই মনে হয়। পশ্চিম বঙ্গ গভর্মেণ্ট ২০ বছরের মধ্যে সব বিদ্যালয়গুলিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয় করতে চান বলে প্রকাশ করেছেন। তা করতে হ'লে বছরে গড়ে ৭০০টি করে বুনিয়াদী বিদ্যালয় করতে হবে। উপযুক্ত উদ্যোগ আয়োজনের অভাবে প্রথম দুই এক বছর এই হারে বুনিয়াদী বিদ্যালয় করা সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু তারপর থেকে তো এই হারে বিদ্যালয় করবার জন্যই চেষ্টা করা উচিত। সে চেষ্টা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না, এবং অদূর ভবিষ্যতে যে সে রকমের চেষ্টা হবে তাও মনে হচ্ছে না।

এই তো গেল বিদ্যালয়ের সংখ্যার কথা। বিদ্যালয়ের গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করতে গেলে সেখানেও ভরসা করার মত কিছু দেখা যায় না। প্রথমত, শিক্ষকদের যে ভাবে তৈরার করা উচিত তা হচ্ছে না। যাদের আমরা শিক্ষকতা করবার জন্য নির্বাচন করছি তাদের সাধারণ শিক্ষা যথেষ্ট নয়। সেইজন্য শিক্ষণ শিক্ষার সময় তাদের সাধারণ শিক্ষারও খানিকটা ব্যবস্থা করতে হবে। তার উপর হাতের কাজ আছে। এই হাতের কাজের মাধ্যমেই ভবিষ্যতে ছেলেদের শিক্ষা দিতে হবে। সুতরাং হাতের কাজ যেমন তেমন করে শিখলে চলবে না, ভাল করে শিখতে হবে। এক বছরের শিক্ষণ শিক্ষা কালের মধ্যে এই সমস্ত ভাল ভাবে হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষণ শিক্ষা ভাল হচ্ছে না। তা ছাড়া আবার একটা কথা আছে। শিক্ষণ শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ হচ্ছে ছেলে পড়ান—যাকে ইংরেজীতে বলা হয় 'প্র্যাকটিস্ টিচিং'। কোন শিক্ষণ বিদ্যালয়েই এর উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। তবে ফলে এই হয়েছে যে, শিক্ষণ শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকটা যদিও খানিকটা আয়ত্ত হয়, তার ব্যবহারিক দিকটা তেমন হয় না। শিক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে যারা বেরিয়ে যায় তারা শিক্ষকতা করতে গিয়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তারা না পারে হাতের কাজ করতে, না পারে ক্লাস নিতে।

দ্বিতীয়ত, যে ভাবে শিক্ষক সংগ্রহ করা হচ্ছে তাতেও কাজের বাধা হচ্ছে। মাগ্‌গি ভাতা নিয়ে শিক্ষকের বেতন হয়েছে ৬৩৸০ আনা। আজ-কালকার দিনে বাড়িতে থেকে কাজ করতে গেলে এই বেতনে যদি বা কোন রকমে চলে, বাড়ির বাইরে গেলে একেবারেই চলে না। আলাদা করে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা যেখানে করতে হয় সেখানে এই টাকার প্রায় সবটাই শিক্ষকের খাওয়া-পরায় খরচ হয়ে যায়, বাড়িতে দেবার মত কিছুই থাকে না। এই অবস্থায় লোকের পক্ষে কাজ করা সম্ভব নয়। সেইজন্য শিক্ষণ শিক্ষা গ্রহণ করে যারা শিক্ষকতার জন্য তৈরারী হচ্ছে তাদের পক্ষে শিক্ষকতা করা সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ স্কুলে বাইরের শিক্ষকের পক্ষে কাজ করা তবু খানিকটা সম্ভব হয়। কারণ, সেখানে বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে আরও কিছু রোজগার করবার সুবিধা আছে। বুনিয়াদী স্কুলে তা নাই। এক তো বুনিয়াদী স্কুলের খাটুনি সাধারণ স্কুলের চেয়ে অনেক বেশি; সেই খাটুনি খেটে তারপর আর অন্য কাজের জন্য সময় করা শক্ত। তার উপর বুনিয়াদী স্কুলে ছেলেকে বাড়িতে পড়া তৈরারী করে আনতে বলা হয় না।

যেটুকু পড়াবার তা শিক্ষক স্কুলেই পড়িয়ে দেন। সেইজন্য ছেলেকে বাড়িতে পড়াবার কোন প্রয়োজনই হয় না। এই ব্যবস্থার ফলে আজ যথেষ্ট শিক্ষক তৈয়ারী হওয়া সত্ত্বেও বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য দরকার মত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। এমন স্কুল খুব কমই আছে যেখানে পাঁচটা শ্রেণীর জন্য পাঁচজন শিক্ষক আছেন।

তৃতীয়ত, স্কুলের বাড়ি এবং সাজসরঞ্জামেরও অভাব। অনেক টাকা খরচ করে ভাল করে বাড়ি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ি হয়েছে খুব কম জায়গাতেই। যতদূর জানি, অধিকাংশ স্কুলেরই বাড়ি এখনও তৈয়ারী হয়নি। বেশির ভাগ জায়গাতেই সাধারণ স্কুলের যে বাড়ি তাই কাজের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তবু সেখানে ছেলেদের ঘরে পড়া হয়তো কোন রকমে চলে, কাজ করা সেখানে একেবারেই চলে না। সেইজন্য বাড়ি হতে দেরি হওয়ার ফলে স্কুলের কাজের খুবই ব্যাঘাত হচ্ছে। সাজসরঞ্জামের সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সাধারণ স্কুলে সাজসরঞ্জামের কোন বালাই ছিল না। অধিকাংশ স্কুলে এখনও লাইব্রেরী বলে কিছু নাই, ম্যাপ, চার্ট, গ্লোব প্রভৃতিরও অভাব। ভাল করে শিক্ষা দিতে হলে এসব তো চাইই, তাছাড়া কাজের ভিতর দিয়ে যেখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেখানে কাজের সাজসরঞ্জামেরও প্রয়োজন। বর্তমান বুনিয়াদী স্কুলগুলিতে এর কোনটিরই উপযুক্ত ব্যবস্থা হচ্ছে না। যার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে তাই যদি না থাকে তো শিক্ষা হবে কেমন করে? কাজের সরঞ্জামের অভাবে কাজও সম্ভব হচ্ছে না, কাজের মাধ্যমে যে শিক্ষা দেওয়া হবে তাও না। অধিকাংশ বুনিয়াদী স্কুলে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, সেখানে সাধারণ স্কুলে যা হয় তাও হয় না।

চতুর্থত, বিদ্যালয়ের কাজ পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা নাই। সাধারণ বিদ্যালয়েও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে কাজ ভাল চলে না। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন আরও বেশি। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। শিক্ষকদের এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নাই। সেই জন্য বুনিয়াদী শিক্ষায় অভিজ্ঞ পরিদর্শকের মাঝে মাঝে বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিদর্শন ও সেখানে যেমন প্রয়োজন শিক্ষকের সাহায্য করা খুবই দরকার। এর কিছুই হচ্ছে না।

এই অব্যবস্থার ফলে বুনিয়াদী শিক্ষার অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে। বুনিয়াদী শিক্ষার উপর লোকের আস্থাও দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। একে তো আমাদের দেশের লোক নূতন জিনিস সহজে গ্রহণ করতে চায় না এবং সেইজন্য বুনিয়াদী শিক্ষাকে কেউ সুনজরে দেখে না, তার উপর বুনিয়াদী শিক্ষার এই নমুনা যদি ক্রমাগত চোখের সামনে দেখতে থাকে তাহলে এর পর আর কেউ বুনিয়াদী শিক্ষার নামও করবে না।

আমাদের শিক্ষা বিভাগের যাঁরা এই শিক্ষা পরিচালনা করছেন তাঁরা সকলেই বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক। তাঁরা এটা বোঝেন না, এ হতে পারে না। তবু এই জিনিসটা কেন তাঁরা হতে দিচ্ছেন জানি না। সকল দিক বিবেচনা করে পশ্চিম বঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকারময় বলেই আমার মনে হচ্ছে। যাঁরা বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকৃত অনুরাগী তাঁদের আজ এই অবস্থার বিষয়ে সচেতন হবার প্রয়োজন হয়েছে।■

(সংগঠন, শ্রাবণ সংখ্যা হইতে)

অনুপ্রেরণার উৎস

[শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য]

১

একটু ভেবে দেখলে দেখবেন, আমরা জীবনের সব স্তরে পরীক্ষা দিয়েই চলেছি। পড়াশোনার ব্যাপারে দেখুন, কোন্ ছেলেবেলা থেকে সেই যে সুরু করেছি, চশমা নিয়ে, কোল-কুঁজো হ'য়ে, শরীরটাকে পাত করে পরীক্ষা দিতে দিতে এম্-এ কিংবা তারও পরে এসে থেমেছি। তারপর চাকুরির ক্ষেত্রে ঢুকতে পরীক্ষা, উঠতে পরীক্ষা, পাকা হয়ে বসতে পরীক্ষা;—পরীক্ষার সমুদ্রে হাবুডুবু খেয়েই চলেছি। তারপর গৃহিণীর কাছে সহিষ্ণুতার পরীক্ষা, প্রমোশনের জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা, ছেলেপুলেদের সামলাতে ক্রোধাদি সংযমের পরীক্ষা, সংসার চালাতে তিতিক্ষার পরীক্ষা, বারোয়ারী চাঁদা আদায়কারী ও অন্যান্য পাওনাদারদের এড়াতে বুদ্ধির পরীক্ষা, ভিড় ঠেলে বাসে উঠতে বলের পরীক্ষা, ইত্যাদি ইত্যাদি আছেই! এত রকমের এবং এত গুলো পরীক্ষা আমরা দিয়েছি, দিচ্ছি এবং দেবো যে পরীক্ষাটাই যেন জীবনের মূল উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে—পরীক্ষার ফলটা নয়।

আপাতত আসুন, পরীক্ষার মধ্যে বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব খুঁজে বার করতে চেষ্টা না করে পড়াশোনার পরীক্ষা নিয়ে একটু আলোচনা করি। ঐ দেখুন, শ্যামবাবুর মেয়েটি এবারে ক্লাস থ্রি থেকে ক্লাস ফোরে উঠতে না পেরে বড়ই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আছে। বাড়ীতে মার বকুনি খেয়ে বেচারী কাঁচুমাচু হয়ে ছিল, আমি আপিস থেকে ফিরে আসার পর আমার সাড়া পেয়ে আমার কাছে পালিয়ে এসেছে। তার যত দুঃখ কষ্ট এবং মনের কথা সে আমার কাছেই বলে। আজও সে তাই আমার কাছে এসে প্রশ্ন করল, আচ্ছা জ্যেঠামশাই, পরীক্ষাটা কেন হয়? পরীক্ষা না করে ক্লাসে উঠিয়ে দিলে কি দোষ? —ভাববার কথা বটে!

২

পরীক্ষাটা নিই কেন? সারা বছর ছেলে-পুলেগুলো কি লেখাপড়া করল না করল তার একটি খতিয়ান করতে। আমাদের লেখাপড়া শেখানোর ধরনটাই এমন যে কোন না কোন রকম পরীক্ষার বন্দোবস্ত রাখতেই হবে, নইলে কিছুতেই টের পাব না, পড়াশোনার গতি কোন ফল হচ্ছে কি না। আর আমাদের ধাতটাও এমন গড়ে উঠেছে যে পরীক্ষার ভয়টা না থাকলে আমরা পড়াশুনার ধারই ধারতাম না। 'ক' আর 'খ' 'কখ' জানলেও যখন ক্লাসে উঠব, আর না জানলেও যখন ক্লাসে উঠব, তখন জানবার দরকারটা কি? ঐ সময়টা জাম গাছে চড়ে জাম পাড়লে বা গুলি-ডাণ্ডা খেললে কাজ হবে।

আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থার যতদিন না আমূল পরিবর্তন হচ্ছে, ততদিন ভাল হোক, মন্দ হোক, পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখতেই হবে এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে ভাল মন্দ বাছাই করতেও হবে। পরীক্ষাটা যে শুধু ছেলে বা মেয়ে কতদূর পড়াশোনা করেছে জানিয়ে দেয় তা নয়, কত ভাল পড়াশোনা কে করেছে তাও জানিয়ে দেয়, এবং এই পরীক্ষার মাপকাঠির উপর নির্ভর করে আমরা তার পুরস্কার-তিরস্কারেরও ব্যবস্থা করি। একটি বিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার ছেলে-মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে; ভাল ছেলেমেয়েদের জন্য কুড়িটা বৃত্তিও নির্দিষ্ট আছে। এই বয়সে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের কতটা বিদ্যা আয়ত্ত করা উচিত তার একটা নিয়তম আন্দাজও আছে।

কতজন ঐ নিম্নতম মানের উপযুক্ত, আর কত-জনই বা উচ্চতর মানের, আবার তাদের মধ্যে কত জন উচ্চতম মানের, যাতে সেই বৃত্তিগুলো পেতে পারে তা জানতে হোলে আমাদের একটা সর্বজনগ্রাহ্য উপায় অবলম্বন করতে হবে, এবং সেই উপায়ই হচ্ছে পরীক্ষা। আবার দেখুন, একটি চাকুরি খালি আছে। চাকুরি খালি মানে কি? কোন সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠান বা অমুক কোন ব্যক্তি মূল্যের বিনিময়ে এক জনের শ্রমকে তাদের বা তার নিজের কাজে লাগাতে চায়। সে নিশ্চয়ই তার মূল্যের বিনিময়ে যতটা ভাল কাজ পেতে পারে তা চাইবে—আর এক্ষেত্রে তার বেছে নেওয়ার একমাত্র পন্থা পরীক্ষা। সুতরাং পরীক্ষাকে আমরা যতই গালাগালি দিই না কেন, সমাজের বর্তমান কাঠামোতে ওটা একটা অপরিহার্য ব্যবস্থা।

৩

পরীক্ষার অনেক দোষগুণের বর্ণনা অনেকে দিয়েছেন, আজ পর্যন্ত যে ধারায় পরীক্ষার কাজ চলে আসছে, তাতে মোটামুটি ভালই ফল পাওয়া গেছে, অর্থাৎ ভালমন্দ বাছাইয়ের কাজ বেশ একরকম হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যাঁরা ভাল করেছেন উত্তর জীবনে তাঁরা সচরাচর কিছু মন্দ করেন নি। কিন্তু পরীক্ষাকে গালাগাল দিয়ে একেবারে তুলে দেবার পক্ষপাতী লোকও কিছু কম নেই তবে তাঁরা যে সব দোষ দেখান, অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন, সেগুলো পরীক্ষার চেয়ে পরীক্ষকদের মেজাজ, সিলেবাসের ত্রুটি, পরীক্ষার মানের সর্বজনগ্রাহ্য মাপকাঠির অভাব, এই সব ধরনের আপত্তির কথা। অর্থাৎ পরীক্ষা জিনিসটার উপর তাদের ততটা রাগ নেই, যতটা রাগ পরীক্ষা নেবার বিশেষ কোন ত্রুটির উপর। একটা উদাহরণ নিন। আমি হয়তো একটু কড়া লোক। আমার কাছে সে ছেলেটি ইংরেজিতে ছত্রিশ নম্বর পেল, আপনি অতটা কড়া পরীক্ষক নন, আপনার কাছে হলে সে হয়তো চল্লিশ নম্বর পেয়ে পাশ করে যেত। ওঁরা বলবেন, তবেই দেখুন, রামের খাতা আপনার কাছে না পড়ে ম-র-ড-এর কাছে পড়েছে, ছেলেটি সেল ফেল হয়ে; আর শ্যাম-এর খাতা ম-র-ড-এর কাছে না পড়ে আপনার কাছে পড়েছে—সে ছেলেটি রামের চেয়ে পড়াশুনায় নিকেশ হয়েও পাশ করে গেল। তবে আর পরীক্ষার মূল্যটা কি? এটাতো স্রেফ লটারির খেলা, মশায়, লটারির খেলা ভাগ্যের পরীক্ষা। আমার ঐ ভজন বাবুর মেজো ছেলের কথাটাই ধরুন। সে ছেলেটি পরীক্ষায় বসে সব গুলিয়ে একাকার করত, সেকেণ্ড-ডিভিসনে আই-এ পাশ করে তিনবারেও বি-এটা পাশ করতে পারলে না। কিন্তু দেখুন, বাড়ীতে বসে বই পড়ে সে কম বিদ্যা অর্জন করেনি; বাজারে সাহিত্যিক হিসাবে তার জয়জয়কার। পরীক্ষায় পাশ করেনি বলে বলতে চান যে সে ছেলে খারাপ ছিল? তাহলে পরে তার মাথা খুলল কি করে? আবার ঐ যে আশু মিত্তিরের ভাগ্নে সুরঞ্জিৎ ঘোষ। ছোকরা সাধারণ ছেলে, 'ঘোস্ট অভিনারি' ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছে,—কিন্তু খেটে খুটে দুবারের বার আই-এ-এস-এ কেমন বেরিয়ে গেল। আর কালীমোহনের ভাইপোটা মশাই, বি-এ তে ফার্স্ট ক্লাস, এম-এ ফার্স্ট ক্লাস, কিন্তু বি-সি-এস্‌টাও পাশ করতে পারলে না, আই-এ-এস তো দূরের কথা। কি করে বলি তাহলে পরীক্ষাটা একটি—ওর নাম কি বলব গিয়ে—একটা সত্যিকারের পরীক্ষা? এটা কি লটারির খেলা নয়, মশাই? এছাড়া আরও সমালোচনা আছে। ছেলেটি সব বিষয়ে ভাল করেও 'এগ্রিগেটে' ফেল হল, সব বিষয়ে পাশ করে অঙ্কে দু নম্বরের জন্য ফেল করে তার জীবনটা ব্যর্থ হল। এ আবার কি ধরনের পরীক্ষা মশাই!—এ রকম কথা হামেশাই শুনতে পাচ্ছি আজকাল।

আগেই বলেছি, এই সব সমালোচনা শুনে

আমরা অন্তত এটুকু ধারণা করতে পারি যে পরীক্ষা জিনিসটার চেয়ে যে ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে তার উপরই আধুনিক সমালোচকদের আক্রোশ। এই আক্রোশের জন্যই তাঁরা পরীক্ষার আসল ব্যবস্থাকে পাল্টিয়ে নতুন কিছু করতে চান।

৪

সমালোচক বলেন, এমন কিছু প্রণালী উদ্ভাবন কর, যাতে কোন ত্রুটি থাকবে না, ইংরেজীতে যাকে বলব fool-proof methods। যেমন ধর, প্রশ্ন এমন হবে আর তার উত্তরও এমনটি হবে যে তাতে পরীক্ষক নিজের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ না করেই নম্বর বসাতে পারেন, কতকটা যান্ত্রিক ভাবেই। সংস্কৃতের পরীক্ষা হচ্ছে; প্রশ্নপত্রের অনেক প্রকার আদর্শ উত্তর পরীক্ষকের কাছে পছুত রইল, যার বাইরে, ভুল বা ঠিক, কোন রকম উত্তরই আর হয় না, তারপর তাদের কোনটাতে কত নম্বর দেওয়া হবে তাও ঠিক রইল। পরীক্ষক সেই উত্তরের গোছাটা নিয়ে বসলেন, এবং ছাত্রদের উত্তরগুলো তাদের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে নম্বর দিয়ে যেতে থাকলেন। এতে যিনি সংস্কৃত জানেন না, তিনিও খাতা পরীক্ষা করে নম্বর দিতে পারেন। একেবারে অটোমেটিক ব্যাপার আর কি!

শুনতে ব্যাপারটা বেশ, শুনলে মনে হয় জিনিসটাও সোজা। এই ধরুন না, পরীক্ষকদের মেজাজ-মর্জির কথাটাই উঠল না, ছক কাটাই আছে, দেখ আর নম্বর দাও। পরীক্ষকদের চিন্তার ঝামেলাই নাই, খাতা পুনরায় পরীক্ষা করার বায়নাক্কা নাই, আরও কত কি নাই, অথচ নিরপেক্ষভাবে সমান মাপকাঠিতে বিচার করে খাতাটি দেখা হল। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝবেন, এতে গলদ কতখানি। প্রথমত ফিসফিসানির গলদ—ছেলেরা যে কত রকমের উত্তর দিতে পারে তার ধারণা করা যায় না। সুতরাং ঐ রকম উত্তরপত্র তৈরী করা বড় সহজ হবে না। দ্বিতীয়ত, আদর্শ উত্তরপত্রের ব্যবস্থা থাকলেই ছেলেরা আর মাথা ঘামাতে চাইবে না, যত রকম উত্তর হতে পারে মুখস্থ করে কাজ সারবে। তৃতীয়ত, আমরা সব নম্বর নিখুঁত উত্তরটা চাইনা দেখতে চাই পরীক্ষার্থী কিভাবে জিনিসটা গ্রহণ করতে পেরেছে এবং কতটা পেরেছে, আর তার প্রকাশভঙ্গী কি রকম। এক কথায় তার ভিতর সৃষ্টির ক্ষমতা কতখানি আছে, তাই দেখতে চাই। এই জিনিসটাই এতে ব্যর্থ হবে। আদর্শ উত্তরমালায় বন্দী শিশুর মন তার নিজস্ব গ্রহণক্ষমতা, প্রকাশভঙ্গী ও সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলবে; তার বুদ্ধির অপচয় ঘটবে এবং শেষে আঘাত হবে। আমরা অনেক সময় পরীক্ষার্থীকে সামান্য উপাদান দিয়ে অথবা একেবারেই উপাদান না দিয়ে একটা জটিল জিনিস গড়ে তুলতে বলি। প্রবন্ধ রচনা করতে দেওয়া এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতে করেই তার বুদ্ধি এবং সৃষ্টিক্ষমতার সম্যক্ পরীক্ষা হয়। এই জিনিসটাই আমরা নষ্ট করব, যদি এই নূতন পথে আমরা চলতে চাই।

৫

তবে পরীক্ষা তুলে দিলে কি হয়? একটা বন্দোবস্ত করলেই তো হয়—প্রত্যেক শিক্ষক অল্প কয়েকজন ছাত্র নিয়ে থাকবেন, তাদের শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ তাঁর হাতে থাকবে। তিনি রোজকার রোজ তাদের পড়াশোনার তদারক করবেন ও কতটা লেখাপড়া তাদের এগোল তার হিসাব রাখবেন। সেই হিসাবের উপর নির্ভর করে তাদের ক্লাসে তুলে দেওয়া হবে ও সার্টিফিকেট ইত্যাদি দেওয়া হবে। সোজা কথা, 'টিউটোরিয়াল' (Tutorial)-এর ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাটা খুবই ভাল, এতে ব্যক্তিগতভাবে ছেলেদের উপর নজর রাখা যায়। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, পরীক্ষা থেকে যে সব কাজ আমরা পাই, সেগুলো এক্ষেত্রে পাচ্ছি কি না? এক নম্বর, পরীক্ষকদের মেজাজ-মর্জির যে আপত্তিটা তুলি,

সেটার এক্ষেত্রে প্রচুর অবকাশ আছে ; কারণ যতই হোক, শিক্ষক মশাইরাও রক্তমাংসের মানুষ। তাঁদেরও ভাল লাগা মন্দ লাগা আছে। নিজের অজ্ঞাতসারেও তাঁরা অবিচার করে বসতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, ছেলেদের পড়াশোনার উন্নতিটা এক্ষেত্রে বড়ই বেশিরকম ভাবে শিক্ষক-মশায়ের ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যিনি ভাল পড়াতে পারেন, তাঁর ছাত্রের দল ভাল শিখবে। যিনি তত ভাল পড়াতে পারেন না, তাঁর ছাত্রের দল ভাল শিখবে না, এবং যিনি কিছুই পড়াতে পারেন না তাঁর ছাত্রের দল কিছুই শিখতে পারবে না। তারপরে এই প্রথায় না হয় একটা ছোট দলের উৎকর্ষ-অপকর্ষতার হিসাব পেলাম ; বিরাট সমষ্টির হিসাব পেতে গেলে তো আমাকে সেই পরীক্ষার রাস্তাতেই থাকতে হবে ?

কাজেই দেখছি, পরীক্ষাটা দরকার। আপনি যদি এটাকে ভাল চোখে না দেখেন, বলতে পারেন এটা 'অত্যাবশ্যক খারাপ বস্তু' (necessary evil) ; আর, যদি ভাল চোখে দেখেন, বলতে পারেন, পরীক্ষা প্রতিযোগিতার সুযোগ দেয়, কাজেই সর্বোত্তম জিনিস, তৈয়ারী হবার এটা উৎকৃষ্ট পন্থা, এবং ভাল করবার উৎসাহ বাড়ায় বলে এটা একটা মহান অনুপ্রেরণা।

৬

পরীক্ষা সম্বন্ধে আর কয়েকটা কথায় এবার একটু আলোচনা করা যাক। প্রথমেই দেখুন, পরীক্ষার নাম শুনলেই ভয় হয়। আমরা বরাবর দেখে আসছি, পরীক্ষার সব কিছুই গোপনতার ঘন যবনিকা দিয়ে ঢাকা। এই যে রহস্যময় কুহেলি, এই যে গোপনতা, এইটাই পরীক্ষার প্রতি ভয়ের প্রধান কারণ। যে ছেলে পরীক্ষায় ভাল করতে পারেনি, সে এই গোপনতার আবরণ ভেদ করতে না পেরে ভাবে, বুঝি তার উপর অবিচার করা হয়েছে। সত্যি বলতে কি, এই গোপনতার আবরণে যে অন্যায় একেবারেই হয় না, তা নয়। এতো গেল ছাত্রদের তরফ থেকে ভয়ের কথা। পরীক্ষকের দিক দিয়েই দেখি, তিনি যদি বিবেচক ও বিবেকী লোক হন, তাঁর তরফ থেকে সর্বদা ভয়, এই বুঝি অন্যায় করে কম দিয়ে ফেললেন অথবা ভুল করে বেশি দিয়ে ফেললেন।

পরীক্ষার কোন কোন স্তরে গোপনতা একান্ত প্রয়োজন, এ কথা এক শ' বার স্বীকার করছি। কিন্তু তার পরে অথথা গোপনতার কোন মূল্য নাই এবং গোপনতার আসল উদ্দেশ্যকে ব্যর্থই করে দেয়। এ জন্য আমাদের মনে হয়, অতি আবশ্যক ক্ষেত্রটুকু ছাড়া বাকী ক্ষেত্রে গোপনতা যতটা কম অবলম্বন করা যায় ততটাই ভাল—পরীক্ষকদের এবং পরীক্ষার্থীদের দিক দিয়েও। প্রশ্নপত্রের ব্যাপারে নিশ্চয়ই গোপনতা অবলম্বন করা হবে ; কি ভাবে নম্বর দেওয়া হবে, গোপন না করলে ক্ষতি কি ? অন্তত অকৃতকার্য হলে ছেলেরা জানতে পারবে, কেন পাশ করেনি, অন্যেরাই বা কেন পাশ করেছে।

মানুষ কখনও দোষগুণের অতীত হতে পারে না। আবার প্রত্যেক মানুষের মনোবৃত্তিও স্বতন্ত্র। কাজেই সকল পরীক্ষক যে সমান হিসাবে নম্বর দেবেন, তা আশা করা যায় না। কেউ বেশি দেবেন, কেউ কম দেবেন—এটা স্বাভাবিক। এটা পরীক্ষার্থী-দের উপর অবিচার, তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই এই জিনিসটা যাতে না হয় তার বন্দোবস্ত করতে হবে। উত্তর পত্রের পুনর্বিচারের কোন "fool-proof" ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত করা না গেলেও যতটা সুষ্ঠু ভাবে এর প্রতিকার করা যেতে পারে তা করা উচিত। একটা মান নির্দিষ্ট করা উচিত, যার ব্যতিক্রম হবে না, এবং সকল পরীক্ষকই মোটামুটি সেটাকে অনুসরণ করতে বাধ্য থাকবেন। যে সব উত্তরপত্র পাশ ফেলের সীমানার, সেগুলো বিশেষ বিবেচনা করে দেখতে হবে। সর্বোপরি, কোন খাতা

পুনরায় পরীক্ষা করার অনুরোধ এলে সেটা সত্যি সত্যিই যেন পুনরায় পরীক্ষা করা হয়—'যায় যায়া' গোছ না করা হয় অথবা সহকর্মীর প্রতি চক্ষু লজ্জার জন্য অন্যায় করা হয়েছে জেনেও চেপে যাওয়া না হয়। ভুল মানুষের হয়ই ; সেটাকে স্বীকার করে সংশোধন করাটা মনুষ্যত্বের কাজ, তাতে অগৌরবের কিছু নেই।

প্রশ্ন পত্র তৈরী করবার সময় কত দিকে যে চোখ কান খোলা রাখতে হয় তার ঠিক আছে? এই দেখুন না, প্রশ্নগুলো সিলেবাসের বাইরে হয় নি তো? এমন হয়েছে তো যে নির্দিষ্ট বয়সের নির্দিষ্ট স্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ ছেলে উত্তর দিতে পারবে তো? এমন প্রশ্ন হয় নি তো যে ছেলেরা ঘাপ্পা হয়ে উঠবে? যদি ক্রুদ্ধ অভিভাবক এসে বিদ্যালয়ে তার ঘরে প্রশ্ন পত্র এবং পত্র রচয়িতাকে গাল দিতে থাকেন, তার গালটা জবাব দেওয়া যাবে তো? প্রশ্ন পত্র দীর্ঘ নয়তো, যতটা সময় দেওয়া আছে তার মধ্যে ছেলেরা উত্তর দিতে পারবে তো? আর সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রশ্নপত্রে ছেলেমেয়েরা কতটা পড়াশুনা করেছে তার সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যাবে তো? ইত্যাদি নানা রকমের ভাবনা ভেবে তবে প্রশ্নপত্র ছাপতে দেওয়া হয়, বা দেওয়া উচিত। প্রশ্নপত্র তৈরী করবার সময় ছেলেদের মনের বয়সের কথাও ভাবতে হবে।

৭

যতই যাই বলুন, শিক্ষক মহাশয়দের চেয়ে ভাল পরীক্ষক আর কেউ হতে পারে না। তাঁরা ক্রমাগত ছেলেদের মনের বুদ্ধির পরিমাপ ও হিসাব করছেন। তাঁদের অভিজ্ঞতাও তাই অত্যন্ত বেশি ও মূল্যবান। তাঁরা ছেলেপুলেদের উত্তরের যে দাম কষে দেন, তাই তার প্রকৃত দাম।

কিন্তু কথা আছে। দেখা গেছে, অনেক সময় শিক্ষক মহাশয়দের রকমারি বাতিক থাকে, আর তার ফলে ভুগতে হয় ছেলেদের। আমার মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় এক পণ্ডিত মশায়ের কাছে 'মারা গেল' লিখে একটি ছেলে যা নম্বর পেয়েছিল, আর একটি ছেলে 'পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল' লিখে তার চেয়েও বেশি পেয়েছিল, আর সব চেয়ে বেশি পেয়েছিল যে লিখেছিল, "করাল কালের কাল কবলে কবলিত হইল" পণ্ডিত মশায় গাল-ভরা অনুপ্রাস বড় ভাল বাসতেন, কাজেই সোজা বাংলায় লিখলে তাঁর কাছে নির্ঘাত ফেল! এই সেদিনের কথা, 'ড়' এবং 'র' এর প্রভেদ জ্ঞানহীন এক শিক্ষক 'ঘুরিয়া'কে কেটে দিয়েছিলেন 'ঘুড়িয়া' না লেখায়। এই সব বাতিকগ্রস্ত লোকদের খেয়ালে পরীক্ষার্থীদের কি কম ভুগতে হয়? তার উপর ছেলেদের ভুল দেখতে দেখতে কোন কোন শিক্ষক মশায়ের চোখ এমন হয়ে যায় যে, নম্বর যেন তাঁদের হাতে উঠতেই চায় না। দোষগুলো যদি না থাকে এবং তাঁরা যদি একটু সহানুভূতির সঙ্গে খাতা দেখেন, তো তাঁদের চেয়ে ভাল পরীক্ষক আর হতে পারে না।

পরীক্ষকদের মনে রাখতে হবে যে তাঁরা সমালোচক নন, সমালোচনার ক্রুর রক্ত চক্ষু নিয়ে তাঁরা সুকুমারমতি বালকবালিকাদের রচনা পরীক্ষা করতে বসেন কি। তাঁরা শুধু দেখতে এসেছেন ছেলেগুলি পড়াশুনার একটা নির্দিষ্ট মান অর্জন করেছে কিনা, এবং সেই মানের ভিতর কে কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে। তাঁরা সন্ধানী চোখ দিয়ে শুধু সেইটুকু খুঁজে বেড়াবেন, কোন রকম পক্ষপাতিত্ব বা গোঁড়ামি বা বাতিকগ্রস্ত মন না রেখে, আর পরীক্ষার্থীদের মনকে সহানুভূতির সঙ্গে বোঝবার মত মনের প্রসারতা নিয়ে।

৮

ভুললে চলবে না, পরীক্ষার ভিত্তি হচ্ছে পরীক্ষার্থীর কতটা শেখা উচিত সেই মানের হিসাবে দেখা। যিনি এই মানের খবর রাখেন না, তিনি

পরীক্ষক হবার অনুপযুক্ত। ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের "লুসি-গ্রে" কবিতাটি শিশুও পড়ে, আবার বি-এ, ইংরাজী অনার্সের ছাত্রও পড়ে; শেলীর মেঘের উপর কবিতা একটা স্কুলের ছাত্রও পড়ে, আবার এম্-এ, পরীক্ষার্থীও পড়ে। শিশুর উত্তরের মধ্যে বি-এ, বা এম্-এ পরীক্ষার্থীর উত্তরের মান যিনি খুঁজবেন অথবা বি-এ, এম্-এ পরীক্ষার্থীর কাছে শিশুর মানের উত্তরেই যিনি খুসী হন, এই দুই পরীক্ষককেই বলব বাতুল। এই মান কি রকম হবে তার একটা ধারণা প্রত্যেক পরীক্ষকেরই মোটামুটি থাকে, কিন্তু সেটা ঝাঁকজোক করে ঠিক কতখানি হবে তার কোন হদিস দেওয়া বড় শক্ত। এইখানেই পরীক্ষকের নিজের বিচারশক্তি ও পরকে বোঝার ক্ষমতার একটা পরীক্ষা দিতে হয়, এবং তাতেই বুঝতে পারি কে ভাল পরীক্ষক, কে মন্দ পরীক্ষক।

৯

পরীক্ষার অনেকগুলি উদ্দেশ্যের কথা আমরা প্রসঙ্গত আলোচনা করেছি। এবার আর একটা উদ্দেশ্যের কথা বলে ছুটি নেব। পরীক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার মান উন্নত করা। পরীক্ষার ফল দেখে কোন বিশেষ বিদ্যালয়ে কি রকম বিদ্যাদান করা হচ্ছে তার বেশ একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন বিশেষ বিষয়ে যদি একশ্রেণীর ছাত্র ক্রমাগত খারাপ করতে থাকে, তবে বুঝতে হবে সেই বিষয়ে শিক্ষাদানের কোন ত্রুটি কোথাও হচ্ছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক তৎক্ষণাৎ বিশ্লেষণ করে সেই কারণটি খুঁজে বের করে তাকে দূর করেন। কোন কোন সময় দেখা যায়, শিক্ষকের শিক্ষাদানের দোষে এইরকমটি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে অবশ্য শিক্ষকের শিক্ষাক্ষেত্র হতে সরে দাঁড়ানোই উচিত।

———

বানান ভুল

[শ্রীসুকৃতিরঞ্জন গুপ্ত]

'শিক্ষা'য় বানান ভুল সম্বন্ধে একটি লেখা পড়লাম। সে প্রবন্ধে লেখক যে মতামত প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে একটু আলোচনা করব।

প্রথমত আমাদের ভেবে দেখতে হবে, বানান ভুলকে সাধারণত আমরা যতটা মারাত্মক মনে করি ততটা করার কোন কারণ আছে কি না। লেখা আমরা যাচাই করি তার ভাষার সৌন্দর্য, ভাবের অভিব্যক্তি, চিন্তার গভীরতা এবং তার প্রকাশ-ভঙ্গীর সুন্দর, সহজ ও সাবলীল গতি দিয়ে। প্রত্যেক ভাল লেখার গানের মতই একটি মূল সুর থাকে। লেখা মাত্রই হল সেই সুরের প্রকাশ। এই প্রকাশ-ভঙ্গী ভাল লেখকের হাতে কত যে বৈচিত্র্যময় ও কবিত্বপূর্ণ হতে পারে তা আমরা প্রতিদিন দেখছি। বানান ভুল সত্ত্বেও যে লেখা ভাল হতে পারে, সে বিষয়ে আশা করি কেউ সন্দেহ করবেন না।

দ্বিতীয় কথা, বানান ভুল কেন হয় তা আমরা এখনও ভাল করে জানি না। ইদানীং এই নিয়ে অনেক মনস্তত্ত্ববিদ্ চিন্তা করছেন। মোট কথা, ছাত্রের বেশির ভাগ ভুল হয় তার লেখাপড়ার অবহেলার জন্য; বানান ভুলের বেলায় কিন্তু এ নিয়ম সব ক্ষেত্রে ঠিক খাটে না।

সে যাই হোক, ভাল লেখায় যদি বানান ভুল না থাকে তো আরও ভাল, এ মানতেই হবে। ওষুধ খেয়েই হোক বা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা করিয়েই হোক, বানান যাতে ঠিক হয় প্রত্যেক

পরীক্ষার্থীর সে চেষ্টা করাই কর্তব্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এই ত গেল পরীক্ষার্থীর কর্তব্যের কথা। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বানান ভুল সম্বন্ধে পরীক্ষকের কি কর্তব্য, এখন সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলব। খারাপ হাতের লেখার মতই ভুল বানান দেখলে পরীক্ষক স্বভাবতই বিরক্তি বোধ করবেন। কিন্তু তাঁকে সব সময়ে সচেতন থাকতে হবে, যাতে এই বিরক্তি তাঁর ন্যায় বিচারকে আচ্ছন্ন করতে না পারে। শুধু বানান ভুলের জন্য বিরক্ত পরীক্ষক যদি ভাল রচনাকে ভাল বলে চিনতে না পারেন তাহলে ছাত্রের দুর্ভাগ্য। এ কথা সব সময়ে মনে রাখতে হবে, অবিচারের জন্য ছাত্র যদি কম নম্বর পায় তাহলে সে লজ্জা পরীক্ষকের, ছাত্রের নয়। মোট কথা, বানান ভুল বিষয়ে পরীক্ষকের মনে কোন বিশেষ রকম গোঁড়ামি থাকলে চলবে না।

ভুল বানান দেখলে লাল পেন্সিলের দাগ দিয়ে নম্বর কাটা ছাড়া পরীক্ষকের আরও একটি কাজ আছে। এটি হল, এ ভুলের কারণ কি তা জানবার চেষ্টা করা। আগেই বলেছি এখন পর্যন্ত এর কারণ আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। পরীক্ষক ও শিক্ষকেরা মিলে যদি কি রকম ছাত্র কি ধরনের বানান ভুল করে তার একটি খসড়া তৈরি করে এ ভুলের মধ্যে কোন নিয়ম বা সামঞ্জস্য আছে কি নেই, তা মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের সামনে তুলে ধরতে পারেন, তা হলে হয়ত এ ভুলের অজানা কারণ আমাদের কাছে আর খুব বেশি দিন অজানা থাকবে না।

সব শেষে বলতে হয়, আজকাল বানানকে যতদূর সম্ভব সহজ করে নেবার যে চেষ্টা চলছে তাকে শুধু সহজ মনে স্বীকার করে নিলেই চলবে না; সে চেষ্টার ফল যাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হয় তার দায়িত্বও পরীক্ষক ও শিক্ষকদের মাথা পেতে নিতে হবে।

দশম বর্ষের প্রবন্ধ সূচী

অভিভাষণ	অধ্যক্ষ শ্রীভবানীচরণ গুহ
আবৃত্তিঃ সর্বশাস্ত্রাণাং	শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়
আমাদের ইতিহাস পাঠনা	"
আলোচনা	
ইস্কুলের বাংলা মাতৃভাষা নয়	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়
উচ্চারণের ত্রুটি ও সংশোধন	শ্রীকণা সেনগুপ্ত
একটি বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র	শ্রীমধুসূদন রায়
গল্প বলার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য	শ্রীকপিভূষণ বিশ্বাস
গান্ধীজীর বালপোথী	শ্রীঅনাথ নাথ বসু
জার্মানীর বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা	" দিলীপকুমার বিশ্বাস
নঈ তালিম	আচার্য বিনোবা ভাবে

নয়ী তালিমের নূতন দিন	কাকা সাহেব কালেলকার	
নিরক্ষর শিক্ষা	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ	
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পশিক্ষার স্থান	শ্রীললিতকুমার মুখোপাধ্যায়	
পরীক্ষার ব্যর্থতার জন্য দায়ী কে ?	শ্রীসুপ্রভা দাসগুপ্ত	
পরীক্ষায় পাসের হার	ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র দাসগুপ্ত	
পশ্চিম বঙ্গের শিক্ষাব্রতন	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	
পাঠাগার ও বাংলা পড়ানো	শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়	
পুস্তক পরিচয়		
প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান সমস্যা	শ্রীপ্রবোধকুমার সেনগুপ্ত	১৯
প্রবন্ধ সূচী		১৫
প্রাথমিক শিক্ষার দায়ী	শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৮৮
প্লেটোর শিক্ষানীতি	" জীবেন দে	
ফ্রয়েবেল ও মন্তেসরী	" মোহিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪৯
বস্তিবা খাদি শুরুকুল	শ্রীঅতুলচন্দ্র মিত্র	৪২
বয়স্ক শিক্ষার প্রসার	ডঃ কল্যাণী মল্লিক	৬৮, ৯৯
বসন্তের উৎসব	শ্রীকুমারলাল দাসগুপ্ত	১৫২
বানান ভুল	" প্রিয়রঞ্জন সেন	১৩৬, ১৯১
বাংলা ব্যাকরণের উপাদান	" বৈদ্যনাথ পাল	১৮৫
বিদ্যালয়ে পারিতোষিক বিতরণ	" পারুল দাসগুপ্ত	১০০
বিদ্যালয়ে বসচক্র	" সুধাময় মুখোপাধ্যায়	১৩৭
বুনিয়াদী শিক্ষা	" জ্যোতিষচন্দ্র রায়	১৬৩
বুনিয়াদী শিক্ষায় চারু ও কারু শিল্প	" গৌরী দে	১৬৯
বৈশালী (নাটিকা)	" পবিত্রকুমার চক্রবর্তী	৯
ভারতে উচ্চশিক্ষার ধারা	" ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়	৯৯
মেলবোর্ণের চিঠি	" সুধীরচন্দ্র রায়	১৮০
শিক্ষা ও সমাজ	" জীবেন দে	৫২
শিক্ষাব্রতীর আমেরিকা ভ্রমণ কাহিনী	" দিলীপকুমার বিশ্বাস	২৬, ৩৯, ১০৩, ১৪০
শিশুদের মন	কাকাসাহেব কালেলকার	
শিশু ও তার স্মৃতিকথা	শ্রীনগেন্দ্রনাথ রায়	
শিশু ও অভিভাবক	" স্নেহ চৌধুরী, এম. এ. বি. টি.	
শিশুরা মিথ্যা কথা বলে কেন ?	" কুলদাপ্রসাদ চৌধুরী	
শ্রেণীকক্ষের পৃঙ্খলা	" বকুলবালা সেন	

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | পৌষ ১৩৫৯ | ২য় সংখ্যা

আলোচনা

মাদ্রাজে বুনিয়াদি বিদ্যালয়

গত ১৮ ডিসেম্বর মাদ্রাজের গান্ধীগ্রামের প্রবোধক ও সেবাগ্রামের অন্যতম প্রবীণ কর্মী শ্রী রামচন্দ্রন কইম্বাটোরের দ্বিতীয় প্রাদেশিক বুনিয়াদি শিক্ষাসম্মেলন উদ্বোধন করিতে গিয়া যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত। তিনি বলিয়াছেন যে, মাদ্রাজে পাঁচ শত বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং ষাটটি বুনিয়াদি শিক্ষণ-বিদ্যালয় আছে; কিন্তু ইহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকই ঠিকমত চলে।

বুনিয়াদি শিক্ষার সহকারী ভারপ্রাপ্ত কর্মী শ্রীযুক্ত মাথাই বলেন যে কতকগুলি বুনিয়াদি বিদ্যালয় শিক্ষাদানেই অপটু; উপযুক্ত সরঞ্জাম তাহাদের নাই। আবার বুনিয়াদি শিক্ষণ বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া শিক্ষিত শিক্ষকেরাও সহজে কর্ম পান না।

দৈনিক সংবাদপত্রের এই বিবরণ পড়িয়া স্বতই মনে হয়, সংখ্যাই তবে বড় কথা নয়। মাদ্রাজ আমাদের চেয়ে অগ্রসর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। আমাদের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫০০ হইবে না, শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সংখ্যাও ৬০ হইবে না, যদিও মাদ্রাজ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় রাষ্ট্রই বুনিয়াদি বিদ্যালয় একসময়েই গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু অল্পসংখ্যক বিদ্যালয়ও যদি আমরা ভালভাবে চালাইতে পারিতাম।

অসুবিধার কিছুটা নিশ্চয় দূর করা যায়। সরকার যখন বুনিয়াদি বিদ্যালয়কে সরকারি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন 'সরঞ্জাম নাই' এ অভিযোগ ওঠে কেন? অল্প কয়টি শিক্ষালয়ের সরঞ্জাম ঠিক মত দিয়া কেন দেখা হোক না! সরঞ্জাম ছাড়াও কথা আছে; এখনও সাধারণের নিকট বুনিয়াদি শিক্ষার উৎকর্ষের কথা প্রচার করিতে হইবে, লোককে বুঝাইতে হইবে। তবেই না লোক অভ্যস্ত পথ ছাড়িয়া নূতন পথ ধরিবে, বুনিয়াদি শিক্ষাকে গ্রহণ করিবে।

শিক্ষা ও সমাজ-সেবা

সম্প্রতি মাদ্রাজে যে অন্তর্জাতীয় সমাজ-সেবা সম্মেলনের ষষ্ঠ সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে শিক্ষা

সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। কর্মীর জন্য শিক্ষা তো চাই-ই, তা ছাড়াও জীবনযাত্রার মান উঁচু করার সঙ্গে শিক্ষার যে কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা লইয়াও একদিন বেশ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। একজন বক্তা খুব জোর দিয়াই বলিয়াছেন, শিক্ষা সমাজ-সেবার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া দেখাইয়া রাখিলে চলিবে না। অর্থনৈতিক উন্নতির কথা ভাবিবার পূর্বেই শিক্ষার কথা ভাবিতে হইবে, নতুবা আমরা বাস্তববাদী হইয়া বিভ্রাট ঘটাইব, সমাজকে বিভ্রান্ত করিব। আজ যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন, টেকনিক্যাল সাহায্যের প্রয়োজন, তাহা কেন? একমাত্র কারণ যে লোকে দিন দিন জ্ঞানের প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছে। বক্তা ছিলেন স্কান্ডিনাভিয়ার জনৈক মহিলা। তিনি বলিলেন যে, তাঁহাদের দেশে শিল্পীকরণের পূর্বে, বড় বড় কলকারখানা হওয়ার পূর্বে, দেশে শিক্ষার প্রসার হইয়াছিল। কয়েক পুরুষ শিক্ষিত কৃষকের পরে বর্তমান পুরুষকে পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষাই যে আসল সাধন, ঘরি-অর্জনের কথাই ভাবি। অর্জনের যোগ্য হইতে হইলে কি অর্জন বাড়াইতে হইলে 'শিক্ষিত' না হইলে চলিবে না। সুতরাং স্বাস্থ্য, আশ্রয়গৃহ ও শিক্ষা—সমাজ-সেবীদের ইহাদের কথা সর্বাগ্রে ভাবা উচিত, কোনও পরিকল্পনায় ইহাদের স্থান সর্বাগ্রে হওয়া উচিত। সে শিক্ষা শুধু বই হইতে পাইব না, জীবন হইতে, কাজ হইতে শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন শিখিতে হইবে, তেমনি অন্যকেও শিখাইবার বিদ্যা অর্জন করা চাই।

—আমাদের কর্তাদের এসব ভাবিয়া দেখিবার কথা।

শিক্ষার জন্য অনশন

পূর্ববাঙ্গপুরের অন্তর্গত মঙ্গলপুরের মহকুমা বিদ্যালয়কে উচ্চবিদ্যার শিক্ষাধিকার অনুমোদন প্রদান করুন, এই দাবি জানাইবার জন্য স্থানীয় কর্মী শ্রীমণিভদ্র রায় অনশন আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া 'প্রজাতন্ত্র' জানাইয়াছেন। অনশন পুরাকাল হইতে নানা উদ্দেশ্যে করা হয় বটে; তবে যুগে যুগে উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয়। কিন্তু বিদ্যালয়কে অনুমোদন দেওয়া হউক, এই দাবি লইয়া কর্মীর পক্ষে ব্রত হিসাবে অনশন আরম্ভ করা অভিনব বটে। অপরং বা কিং ভবিষ্যতি—বতই বাঁচিব, ততই শিখিব।

টুইশনি বারণ

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশ দিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে কোনও অধ্যাপক প্রাইভেট টুইশনি করিতে পারিবেন না। এখন যাঁহারা টুইশনি করিতেছেন, তাঁহাদেরও উহা ছাড়িয়া দিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক রিপোর্টে এই কথার উল্লেখ করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে, কলেজের অধ্যাপকেরা যাহাতে ছাত্রদের মঙ্গলের জন্য নিজের নিজের সময় সময় অধ্যয়নে নিয়োগ করিতে পারেন, তাহাই এইরূপ নির্দেশের কারণ।

কিন্তু আপাতত অধ্যাপকদের আর্থিক সংকট সে কিরূপ উগ্র আকার ধারণ করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

অধ্যাপক দাসগুপ্তের পরলোক গমন

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অনেক বৎসর শিক্ষকতা করিয়া অধ্যাপক হিসাবে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি বিশ্বের মালমশলা পণ্ডিতদের নিকট আনিয়া ধরিয়াছিলেন। তবে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে চলিয়া গিয়া তিনি এপর্যন্ত লোকচক্ষুর অন্তরালেই প্রায় ছিলেন, বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রথম জীবনের সংস্কৃত চর্চা, রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুরাগ ও ভারতীয় দর্শনের আলোচনার সহিত যাঁহারা পরিচিত আছেন,

তাঁহারা কবি, ঔপন্যাসিক, গবেষক, দার্শনিক অধ্যাপক দাসগুপ্তের লোকান্তর গমনের সংবাদে অতীতের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখাচ্ছন্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। আমরা অধ্যাপক দাসগুপ্তের আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব—গত ২৪শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চার দিনে সমাপ্ত এবারকার সমাবর্তন উৎসবের একটু বিশেষত্ব আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্রমেই এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে একদিনে সমাবর্তন ও উপাধি বিতরণ শেষ করা একরকম অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবার প্রথমে শুধু ছাত্রছাত্রীদের উপাধি পত্র দিয়া ভাইস-চ্যান্সেলার এই সমাবর্তন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝাইয়া দেন। শেষ দিন সকলে সমবেত হইয়া চ্যান্সেলারের ও সর্বশেষে সমাবর্তনে অভিভাষণ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভিভাষণ শোনেন।

এই দিনে রাষ্ট্রপতিকে আইনের ডক্টরেট উপাধি প্রদান করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, তাঁহার শিক্ষা ও কর্মজীবনের সূচনা এই কলিকাতা নগরীতেই হইয়াছিল। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে এই তাঁহার প্রথম বাংলা দেশে আসা। বহু স্মৃতিবিজড়িত কলিকাতায় আসিয়া তিনি যেমন সাদর অভ্যর্থনা ও সমাদর পাইয়াছেন তেমনই অকাতরে তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে জীবনে দেশের ও দশের জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ বাংলার, বিশেষ করিয়া কলিকাতার শিক্ষিত ও মহান্ ব্যক্তিদের সহিত ঐকান্তিক ঘনিষ্ঠতা লাভের সুযোগের জন্য সম্ভব হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সুযোগ্য প্রাক্তন ছাত্রের বাংলায় লেখা সুচিন্তিত অভিভাষণটি আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। তাহার কোন কোন অংশ আমরা পাঠকদের জন্য পরবর্তী সংখ্যায় উদ্ধৃত করিব।

নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলন

এবার নাগপুরে নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছে। ইহাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের প্রস্তাবলী আলোচনা এই অধিবেশনের অন্যতম বিষয় ছিল। এই সমালোচনার জন্য একটি প্যানেল গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সভাপতিত্ব করিবার সময় বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ অমরনাথ ঝা বলিয়াছেন যে, শিক্ষা-পরিকল্পনা লইয়া যাঁহারা কাজ করিবেন সেই শিক্ষকদের অভাব অভিযোগ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তারের কোন পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। আগামী কাল কি করিয়া চলিবে, এই চিন্তায় যে শিক্ষক ম্লানমুখে ও বিক্ষুব্ধচিত্তে থাকেন, তাঁহার নিকটে কিশোর ও তরুণ ছাত্রছাত্রী কি করিয়া উৎসাহ পাইবে?

তিনি বিদ্যালয়গুলির ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির দুইটি কুফলের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শিল্পের উৎপাদনবৃদ্ধি অত্যাবশ্যক, কিন্তু বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃদ্ধি বন্ধ করাই দরকার। কারণ অত্যধিক ছাত্র নেওয়ায় শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয় না। ক্লাসের বাহিরে তো শিক্ষক ও ছাত্রে কখনও দেখাই হয় না। দ্বিতীয় কুফল, এই ক্রমাগত সংখ্যা-বৃদ্ধির দিকে মন দেওয়ার ফলে কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীর মনোভাব লইয়াই কাজ করেন—শিক্ষাদানের ব্রত দূরে সরিয়া যায়।

পাঠ্যতালিকা, পরীক্ষা, শিক্ষকদের অবস্থা ও তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের এই সব আলোচনার ফলাফল শিক্ষা-কমিশনের সদস্যদের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এই সম্মেলন শাসন-তন্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যাপক গণশিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। ছয় হইতে চৌদ্দ

৬ৎসর বয়স্ক বালকবালিকাদের বিনা খরচে বাধ্যতা-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে। ইহাদের দুপুরের খাবার ও সাধারণ চিকিৎসার দাবীও জানানো হয়।

এই সম্মেলন ইংরাজি শিক্ষা অব্যাহত রাখার পক্ষে মত পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহাদের মতে ইংরাজি ভাষা শিক্ষার পদ্ধতির পরিবর্তন আবশ্যক।

সর্বশেষে এক প্রস্তাবে ছাত্রছাত্রীকে দেশের সেবায় উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিবার ও শারীরিক পরিশ্রমের মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্কুল ও কলেজেই সমাজ সেবার কাজে বাধ্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

বয়স্ক-শিক্ষা সম্মেলন

নিখিল ভারত শিক্ষা-সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষা-সম্মেলন নাগপুরে অনুষ্ঠিত হইল। ইহাতে সভাপতিত্ব করেন মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত হরিসর্বোত্তম রাও, ইনি বয়স্কশিক্ষার প্রাদেশিক সংগঠক। এই সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল সমাজসেবীদের কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন, বয়স্ক শিক্ষার অভিযানে সরকারের কর্তব্য তো আছেই—সমাজ-সেবীদের সহযোগিতাও একান্ত আবশ্যক। তিনি বলেন যে কথকতা ও কীর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামবাসীর সঙ্গে এই যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। প্রত্যেক নরনারীর এই অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা উচিত।

এই সম্মেলনে একটি প্রস্তাব করা হয় যে, প্রত্যেক শ্রমিককে স্বাক্ষর করিয়া লইবার ব্যবস্থা কারখানার মালিকদের করিতে হইবে, সরকার এইরূপ একটি আইন প্রণয়ন করুন।

মহীশূর শিক্ষা-সংস্কার কমিটি ও ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

বড় দিনের বন্ধ অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি বড় বড় সহরে নানা রকম কংগ্রেস, কনফারেন্স, সম্মেলন, বৈঠক ইত্যাদির হিড়িক পড়িয়া যায়। দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা, পরস্পরের অভিজ্ঞতার বিনিময়, যোগাযোগের সম্প্রসার, দূরের কর্মীদের মধ্যে আলাপ আলোচনা এই সব সম্মেলনের লক্ষ্য। এবার যে কয়েকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার দিকে দেশবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহিয়া ছিল, তাহার মধ্যে ভারতের উপ-রাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ রাধাকৃষ্ণন ও মহীশূর শিক্ষা-সংস্কার কমিটির মধ্যে আলোচনা অন্যতম। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন এতদিন ছিলেন শিক্ষাব্রতী, এখন আবার রাষ্ট্রের অন্যতম কর্ণধার, কাজেই তাঁহার কাছে যাহা শোনা যাইবে তাহার তো মূল্য যথেষ্ট থাকিবে।

প্রধানত, যে তিনটি বিষয়ে আলোচনা চলে, তাহাদের সম্বন্ধে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভারত সরকার প্রভূত অর্থ-সাহায্য করিতে পারিবেন, আশা করা যায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গোষ্ঠ গ্র্যাজুয়েট রিপোর্টের ভারও ভারত সরকার গ্রহণ করিবেন বলিয়া ধরা যাইতে পারে; তবে বিনা বেতনে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, কোন রাজ্যসরকারই এই বাবদে আবশ্যকীয় অতিরিক্ত করভার বহন করিতে এখন পর্যন্ত সক্ষম নয়।

দ্বিতীয়, তাঁহার মতে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের জন্য রাজ্যসরকারের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। কাজ চলিতে থাকুক।

তৃতীয়, তিনি বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন এমন ভাবে বাড়াইতে হইবে যেন তাঁহারা অধিকতর লাভজনক বৃত্তি গ্রহণ না করেন। তিনি আরও মনে করেন যে, অধ্যাপক নিয়োগের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকা উচিত, তবে কর্তৃপক্ষকে সরকারের নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ইংরাজির মাধ্যমেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু পাঠ্যতালিকা সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। মহাকাব্যগুলিকে অবশ্যপাঠ্য করিতে হইবে। শিক্ষার মাধ্যম যাহাই হউক, ভারতের সংস্কৃতির সহিত ছেলেমেয়েদের একান্ত যোগ সংসাধিত করা কর্তব্য।

অবশ্য আঞ্চলিক ভাষা উপেক্ষিত হউক, তাহা তিনি চাহেন না। বিশেষত, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমেই হওয়া অবশ্য কর্তব্য। প্রয়োজনবোধে কলেজের শিক্ষা রাষ্ট্রভাষায়ও দেওয়া চলিবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরাজি ভাষার গুরুত্ব বর্তমান জগতে কোন প্রকারেই হ্রাস করা উচিত হইবে না।

শিক্ষক নির্বাচন সম্পর্কে তাঁহার মত, দেশসেবা, ত্যাগের মনোভাব ও শিক্ষকতার আগ্রহ যাঁহাদের আছে, কেবল তাঁহাদিগকেই শিক্ষকের কাজে নিযুক্ত করা উচিত

P30588

নিবেদিতা

[শ্রীকুমুদবন্ধু সেন]

কয়েকদিন পূর্বে নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী মহাসমারোহে সপ্তাহব্যাপী উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সেই জয়ন্তী উপলক্ষে নিবেদিতার শিক্ষার আদর্শ নিয়ে আলোচনা করলে সময়োপযোগী হবে বলে আশা করা যায়।

এদেশে আসবার পূর্বে নিবেদিতা ইংলণ্ডে একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। নিজের শিক্ষা-সমাপ্তির পর তিনি লণ্ডনে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতেন। কিন্তু তখনকার প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি তাঁর আদৌ পছন্দ হত না। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা পদ্ধতি তাঁর কতকটা পছন্দ হয়েছিল। তিনি নিজেই সেখানে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিবেদিতার পিতৃদত্ত নাম ছিল কুমারী মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল্‌। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন প্রথম আমেরিকা থেকে লণ্ডনে আসেন, তখন তাঁর বক্তৃতা, কথাবার্তা এবং আলোচনা শুনে কুমারী নোব্‌ল্‌ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। দ্বিতীয়বার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে স্বামিজী পুনরায় লণ্ডনে এসে জুন মাস পর্যন্ত ছিলেন। সেই সময়ে কুমারী নোব্‌ল্‌ অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসেন। বিবেকানন্দের বাণী তাঁর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং সে কথা নিজেই তিনি বলে গিয়েছেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বিবেকানন্দ কুমারী নোব্‌ল্‌কে বলেন—"আমার স্বদেশে মেয়েদের ভিতর কাজ করবার একটা পরিকল্পনা আছে, তুমি সে বিষয়ে অনেকটা সাহায্য করতে পার।" স্বামিজীর এই আহ্বান নোব্‌ল্‌এর হৃদয়-তন্ত্রীতে বেজে উঠল। এই আহ্বানই তাঁর জীবনকে নূতনভাবে রূপায়িত করেছিল।

এর পূর্বে দু'বার নিবেদিতা তাঁর আহ্বান শুনেছিলেন—সাধারণ ভাবে, এমন প্রত্যক্ষ ভাবে নয়। প্রথম লণ্ডনে, পাঠচক্রে একদিন বিবেকানন্দ গুরুগম্ভীর হৃদয়স্পর্শী সুরে—"জগত চায় বিশটী মহা নারী যাঁরা বাক্‌পথে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন—ঈশ্বর বই আমাদের আর কোন সম্বল নাই।—কে আছে?" এই বলে তিনি চারপাশে শ্রোতাদের ভিতর তাকালেন। নিবেদিতা বলতেন—"তাঁর সেই আকুল আহ্বানের সুর আজও আমার কানে বেজে আছে

—বোধ হয় আজীবন থাকবে।" দ্বিতীয়, পাঠচক্রের একজন সদস্যার কাছে স্বামিজীর একটী চিঠিতে সেই ব্যাকুলতা, সেই মর্মস্পর্শী আহ্বান শুনতে পেলেন। বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, "জগত চায় চরিত্র—জলন্তপ্রেমে আত্মত্যাগী জীবন। প্রেমের বাণীই বিদ্যুদগ্নির মত বহুদিনাবধি প্রকাশ পাবে। জাগ—জাগ মহাপ্রাণেরা—দুঃখ-দুর্দশায় সারা দুনিয়া জলে পুড়ে মরছে—এখন কি তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে?" স্বামিজীর অগ্নিবাণীই নিবেদিতার হৃদয় স্পর্শ করেছিল। তাই তৃতীয়বারে তাঁকে উপলক্ষ্য ক'রে ভারতীয় নারীর কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করতে বিবেকানন্দ আহ্বান করলেন—নিবেদিতা তা'তে আত্মনিবেদন করতে প্রস্তুত হলেন। তিনি জানতেন না স্বামিজীর কি পরিকল্পনা—জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছাও তাঁর মনে উদয় হয় নি।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে কুমারী নোব্‌ল্ এদেশে এলেন স্বামিজীর কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করতে। ব্রহ্মচারিণীর ব্রতে বিধিমত স্বামিজীর নিকট দীক্ষা নিলেন, স্বামিজী তাঁর নাম রাখলেন—নিবেদিতা। সেই নামেই তিনি জগতে সুপরিচিত।

নিবেদিতা বলে গিয়েছেন, বিবেকানন্দ যেমন একদিকে বিশ্বের কল্যাণে ব্রতী ছিলেন অপরদিকে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মেশার পর দেখতে পেলেন —তিনি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় ভারতের কল্যাণ-চিন্তায় নিমগ্ন—স্বদেশপ্রেমের প্রবাহ তাঁর শরীরে ও মনে অনুক্ষণ তীব্র বেগে বইছে—বিবেকানন্দের সংস্পর্শে এসে নিবেদিতা ভারতবর্ষকে ভালবাসতে শিখলেন। ভারতের কল্যাণে তিনি আত্মাহুতি দিলেন।

বাস্তবিকই এখন থেকে নিবেদিতা ভারতবর্ষকে মনে প্রাণে কাজে স্বদেশ বলে পুরোপুরি মেনে নিয়েছিলেন। সেখানে মনে মুখে তাঁর কোন গরমিল ছিল না। স্বামিজীর নির্দেশমত নিবেদিতা নারী শিক্ষা প্রচারের কাজে একান্তভাবে আত্মনিবেদন করলেন। বাগবাজারের বোসপাড়ায় একটি ছোট বাড়ি তিনি ভাড়া নিলেন, একাংশে তিনি বাস করতেন, আর অপরাংশে বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কাজ চলত। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শ্যামাপূজার দিন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। মা সারদামণি দেবী স্বয়ং উপস্থিত হয়ে পূজার্চনা ক'রে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গেলেন। তিনি মৃদুস্বরে গোলাপ মার মারফৎ তাঁর আশীর্বাণী জানালেন—এই বিদ্যালয়ে থেকে আদর্শ পবিত্র-চরিত্র মেয়েরা সুশিক্ষিতা হয়ে উঠুক—জগন্মাতার কাছে তিনি এই প্রার্থনা করেছিলেন। সর্বত্যাগিনী তপস্বিনী নিবেদিতা দুঃখ কষ্ট অভাব অনটন এমন কি ভগ্ন স্বাস্থ্যের ক্লেশকে উপেক্ষা করেও আজীবন একাগ্রচিত্তে শিক্ষাকার্যে আত্ম-বিনিয়োগ ক'রে কঠোর ব্রত পালন ক'রে গিয়েছেন। তাঁর পুণ্য স্মৃতি উপলক্ষ্য করেই সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব হয়ে গেল, আজ মনে হয় ৫০ বছর পূর্বে তিনি যে শিক্ষার আদর্শ আমাদের সামনে ধরেছিলেন, বর্তমান যুগে সে বিষয়ে আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। নিবেদিতার মত মনস্বিনী, মহীয়সী নারী শুধু সমসাময়িকভাবে শিক্ষার আদর্শে প্রাণপাতকারী তপস্যা করেন নাই—তাঁর দৃষ্টি ছিল ভাবীযুগের শিক্ষা বিধানের উন্নতি সাধনে—ভারতে পরহিতব্রতী স্বদেশ প্রেমিক সংযমী নরনারীর চরিত্র গঠনে—জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের সহজ উপায় নির্দেশে—ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বসংস্কৃতির যুক্ত মিলনে, আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রণালীর সমন্বয়ে শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলনে, বিভিন্ন ভাবধারার ঐক্য সাধনে। এইরূপ আদর্শে তিনি শিক্ষাপদ্ধতি চালাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন—শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর রচিত বই ও নানা সাময়িকপত্রে তাঁর প্রবন্ধগুলি এর প্রমাণ। ৪০।৫০ বছরের পূর্বে আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার যে কিরূপ অভাব ছিল,

তা এখনকার তরুণ তরুণীরা ধারণাই করতে পারবেন না।

নিবেদিতা এদেশে এসে শিক্ষার অবস্থা যা দেখেছিলেন তা তিনি নিজেই বর্ণনা করে গিয়েছেন। খ্রীষ্টান পাদরী এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় বাংলা দেশে শিক্ষাপদ্ধতি দু'রকম দেখা যায়। এক প্রাইমারি বিদ্যালয়, যেখানে অক্ষর পরিচয়ের পর লিখতে পড়তে, আঁক কষতে আর পাঠ কণ্ঠস্থ করতে শেখানো হয়। অপর পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ ক'রে বি. এ., এম্. এ. উপাধি লাভই শিক্ষার চরম আদর্শ। মেয়েদের, বিশেষত নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজে, বিয়ের পরই শিক্ষার খতম। বিয়ে হলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার প্রথা নেই। তখনকার দিনে ১০।১২ বছর বয়সেই বালিকাদের প্রায় বিয়ে হ'ত। নিবেদিতা দেখছেন, একমাত্র ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান আর পার্শী সমাজের মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডিগ্রি পেয়েছেন। সে সময়ে তাঁদের সংখ্যাও খুব কম ছিল, সারা বাংলা দেশে শিক্ষিতা নারী শতকরা পাঁড়ে ছয় জন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা তখন নারীশিক্ষায় এগিয়ে চলেছিল। এই রকম পরিবেশের মধ্যে তাঁকে ছোট মেয়েদের জন্য শিক্ষা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল।

নিবেদিতা দেখলেন, ছোট মেয়েরা নানারকম ব্রত করে। এইসব ব্রতের নিয়মগুলির সঙ্গে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির তিনি আশ্চর্য্য রকম মিল দেখতে পেলেন। প্রথম বিষয়বস্তু, গল্প বা কথা, খেলা ও গান, আর তা কাজে পরিণত করা—ব্রতের এই চারটি অঙ্গ দেখা যায়। গল্প বা কথাচ্ছলে বিষয়টি বলা, খেলা দিয়ে পাঠ শেখানো, বারংবার অভ্যাস করানো, গানে, খেলায়, কাজ করানোয় নিবেদিতা এই ব্রতগুলিকেই কিণ্ডারগার্টেন -শিক্ষাপদ্ধতির ছাঁচে ঢেলেছিলেন। নিবেদিতা বলতেন, এই ব্রতগুলি ধর্মকেই কেন্দ্র করে প্রচলিত হয়েছে; তা'তে ধর্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা আর উদ্দীপনা ছোট মেয়েদের মনে জাগায়। কিন্তু এর সঙ্গে গো-সেবা, বীজ বোনা, তিথি-নক্ষত্র চাঁদ-সূর্যের সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান, নানা দেশের কথা কাহিনীতে ভূগোল ও ইতিহাস পুরাণের কিছু পরিচয় দেওয়া হত। মনে হয় ধর্মের ভিতর দিয়ে ব্যবহারিক শিক্ষারও প্রচলন ছিল। নিবেদিতা বলেন—"অতি প্রাচীন কালের শিক্ষাপরিকল্পনার এইগুলি কয়েকটি অংশ।" বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিল্প পরিকল্পনা-রত ইউরোপীয় চিত্তে যে আনন্দ ও সমাদর এই ব্রতগুলি জাগিয়ে তোলে—কোন ভারতবাসী সে ভাবের আদর বা আনন্দ লাভ করতে অক্ষম। ধর্ম ও সমাজের উন্নতিকল্পে প্রাচীন ভারত এই ব্রতগুলির ভিতর দিয়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের অনুশীলন ও বিস্তার করেছিলেন। বর্তমান ভারত ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে তাই করছে। ভারতবর্ষের শিক্ষা ছিল সংযমের দ্বারা অন্তরের প্রকৃতিকে জয় করা আর ইউরোপীয় কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা বাইরের প্রকৃতিকে সংযত করা। সুতরাং দুইটিই পরস্পরের পরিপূরক। নিবেদিতা আশা রাখতেন, যখন উত্তরকালে ভারতের গণশিক্ষা সমস্যার সমাধান হবে, তখন কোন মনস্বী এই ব্রত-গুলিকে নিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান রচনা করবেন—শাশ্বত চিন্তাধারার নিদর্শন স্বরূপে। চরিত্র গঠন আর স্বাবলম্বন জ্ঞান-শিক্ষার মূল স্তম্ভ। নিবেদিতা বলতেন শিক্ষা যখন অর্থকরী হয়ে পড়ে বা চাকুরী লাভ করার উদ্দেশ্যে অর্জন করা হয় তখনই তা'র চরম অবনতি। মানুষের মনুষ্যত্ব জাগানোই তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা। নিবেদিতা ছোট ছোট ছেলেদের মনকে ফুলের বাগানের সঙ্গে তুলনা করতেন। প্রত্যেক ছেলের মনে যে ফুলের বীজ আছে তা অঙ্কুরিত করে বিকাশ করার নামই শিক্ষা। শিক্ষকের শিক্ষাদানের কুশলতা এতেই প্রকাশ পায়। বইগুলো যেন আউড়ে তাদের মাথায় বোঝা চাপানো বা গতানুগতিকভাবে

বইয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি মুখস্থ করানো শিক্ষা নয়। শিক্ষার স্বাধীন চিন্তা, সহজ গতি থাকবে। বস্তুগুলির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে ছাত্রকে স্বাধীন চিন্তায় অভ্যস্ত করাই প্রকৃত শিক্ষকের কাজ। নিবেদিতা বলতেন—এইজন্য শিক্ষকেরও শিক্ষা দরকার।

নিবেদিতা প্রথমে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে ছোট মেয়েদের যে শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করেছিলেন তাই এখন বলব। ছোট ছোট বালিকারা সমবেত ভাবে সুর ক'রে সরস্বতীকে বন্দনা করত। তারপর তারা জপ করত "ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ।" স্বদেশ সেবা আর স্বদেশপ্রেমের বীজ বপন করাই এই মন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল। ইংরেজী, বাংলা সাহিত্য, সাধারণ অঙ্ক ও বিজ্ঞান শেখানো হত। চারুশিল্প বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হত যাতে পুরানো লুপ্তপ্রায় ভারতীয় শিল্প আবার নূতন জীবন পেয়ে বেঁচে ওঠে। শিল্পকার্য শেখাবার কারণ মেয়েরা যাতে হাতে-কলমে কাজ শিখে রোজগার করতে পারে—প্রত্যেকে যাতে ঘরে বসেই স্বাবলম্বী হতে পারে। মেয়েদের, বিশেষত আশ্রমবাসিনী বড় মেয়েদের নিয়ে কতকগুলি শিল্প শিক্ষা দেবার তাঁর খুব আগ্রহ ছিল—ইউরোপ ও মার্কিণের বাজারে যাতে তাদের হাতের তৈরী জিনিস বিক্রয় হয়।

আজ নিবেদিতা জীবিত নাই কিন্তু শিক্ষার আদর্শ তিনি রেখে গিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে আর রচনায়। বর্তমান যুগে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা সমস্যার সমাধানে নিবেদিতার কথা কি আমরা স্মরণ করব না?

পরীক্ষা পদ্ধতি

[শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ]

১৫ ডিসেম্বর ১৯৪২

শ্রীচরণকমলেষু

সপ্রণাম নিবেদন—আপনার চিঠি যথাসময়ে পাইয়াছি।

পরীক্ষার ধারা-পরিবর্তন এখানেও চলিতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—যতদূর মনে পড়ে, গত বৎসরের ৩২ সেট প্রশ্নপত্র আপনাকে পাঠাইয়া ছিলাম। এবারের বার্ষিক পরীক্ষার ৩১ সেট ও এই সঙ্গে পাঠাইলাম। বাণ্মাসিক পত্রগুলি বাহুল্য-বোধে পাঠাইলাম না। যদি আপনার সময় হয়, এর গুণাগুণ বিচার করিয়া আমাকে কিছু উপদেশ দিলে অনুগৃহীত হইব।

আমার অভিজ্ঞতা প্রবন্ধাকারে জানাইতে উপদেশ দিয়াছেন। যদি উহা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে লিখিতে পারি, তৎপূর্বে সময় পাইব না। কিন্তু প্রবন্ধপ্রকাশে আমার রুচিও নাই, মোহও নাই। আমার একটা ধারণা হইয়াছে—এই জাতীয় প্রবন্ধের একমাত্র পাঠক হন লেখক নিজে, আর লেখক যদি তাঁহার কোনো বিশেষ বন্ধুকে অনুরোধ করেন ত সেই বন্ধু—যিনি উহা পড়িয়া বা না পড়িয়া মন্তব্য করেন 'বেশ লিখেছ।'

যাঁহারা এবিষয়ে বীরভাবে আগ্রহ সহকারে আলোচনা করিয়াছেন বা করেন তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিলে উপকার বোধ করিতাম। কিন্তু একমাত্র আপনিই এবিষয়ে কৌতূহল দেখাইলেন—আর কাহারও কাছ হইতে এবিষয়ে যে কিছু আলোচনা বা

চিন্তার প্রয়োজন আছে, এমন কোন ইঙ্গিত পাই নাই।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলি। পরীক্ষার মান বাড়ানো যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয়, তবে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের গ্রাহ্য করিলনা বলিয়া আক্ষেপোক্তি করিলে কিংবা ঘন ঘন পাঠ্যতালিকা পরিবর্তন করিলেই কোনো সুফল পাইবেন বলিয়া আশা করি না। পরীক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন করিলে যদি কিছু সুরাহা হয়। Objective Test-এর বহু দোষ আছে আমিও স্বীকার করি, কিন্তু একথাও উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি, এ প্রণালীতে পরীক্ষা নিলে ছেলেরা পড়াশুনা করিতে বাধ্য হইবে, কোনো Made Easy বা One Hour Preparation Series-এর সাধ্য নাই যে এইরূপ পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীকে সাহায্য করিতে পারে। ছাত্রছাত্রীর মৌলিকতা এবং প্রকাশ-ক্ষমতা অবশ্য এ পরীক্ষায় ধরা পড়িবে না কিন্তু তাহাদের জ্ঞানের পরিধি এবং বিচার-ক্ষমতার মান এই পরীক্ষা দ্বারা সম্পূর্ণরূপেই নিরূপণ করা যায়।

রাধাকৃষ্ণন্ রিপোর্ট বাহির হইয়াছে বোধ হয় ১৯৪৯এর আগস্ট কি সেপ্টেম্বরে। সেই বৎসরেই ভয়ে ভয়ে বার্ষিক পরীক্ষায় দুই সেট্ মাত্র Objective Test দিই, পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা-হিসাবে। তারপর খড়্গপুরে সাহস করিয়া ১৬ সেট্ চালাইলাম। তারপর দুই বৎসর এই বেনেপুকুরে সেই সেট্ই চালাইতেছি। নানাকারণে সংখ্যা আর বাড়াই নাই। বাড়াইতে গেলেই শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের সমর্থন আবশ্যক মনে করি। যতক্ষণ সেই সমর্থন লাভ করা না যায় ততক্ষণ একতরফাভাবে পরীক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন করিতে গেলে কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

এই পদ্ধতিতে পরীক্ষা প্রবর্তনের সর্বপ্রধান বিঘ্ন আমি আশঙ্কা করিয়াছিলাম 'আর্থিক'। কিন্তু অভিজ্ঞতায় মনে হইতেছে, ছাপাখরচ বেশি লাগিলেও কাগজের খরচ অনেক কম লাগে এবং পত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে যে খরচ লাগে নূতন পদ্ধতিতে তাহার অপেক্ষা খুব বেশি একটা কিছু খরচ হয় না।

পরীক্ষার্থীরা এই জাতীয় পরীক্ষা বরং পছন্দই করে। প্রশ্নকর্তাকে একটু খাটিতে হয়। এবং অতি ধীরভাবে সাবধানে প্রশ্ন না করিলে সমস্ত পরীক্ষাই ব্যর্থ হইবে। প্রশ্নকর্তাকে যে কত দিকে কতটা সাবধান হইতে হয় তাহা এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলা যায় না। যে প্রশ্নগুলি আপনাকে পাঠানো হইল ইহার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য দায়ী আমি। পরীক্ষার অল্প কয়েকদিন পূর্বে যিনি যে শ্রেণীতে যে বিষয় পড়ান তিনি নিজে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া আমার হাতে দিয়াছেন। তারপর গ্রহণ, বর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন সবই আমাকে অত্যল্পকালের মধ্যে শেষ করিতে হইয়াছে। তারপর আবার ছাপাখানার মালিকদের কাছ হইতে এক প্রুফ, দেড় প্রুফ, আড়াই প্রুফে ওগুলি আনায় করিতে হইয়াছে। কিন্তু এসমস্ত ব্যাপার একেবারেই তাড়াহুড়োর জিনিস নয়। যথাযথ সময় না দিয়া এ সমস্ত কাজ করিলে তার মধ্যে অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদ অনিবার্য।

প্রশ্নকর্তার দুইটি দিকে অবহিত হইতে হইবে—এক form, দুই standard। এই দুইটি শিখাইতেই আমাকে অতিমাত্রায় বেগ পাইতে হইতেছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী এবং শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রাপ্ত বহু বৎসরের অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট হইতে কী পরিমাণ হাসাকর প্রশ্ন পাইয়াছি তাহার দুই-একটা নমুনা নিম্নে দিলাম—

১। আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ী বীর (ছিলেন/ছিলেন না)।

২। বাবর আত্মজীবনী (লিখিয়াছিলেন/লিখিয়াছিলেন না)।

৩। সিদ্ধার্থ গোপা নাম্নী একটি বালিকাকে বিবাহ (করিয়াছিলেন/করেন নাই)।

৪। শিবাজির অল্প-পরিচয় (ছিল না/ছিল)।

৫। অশোক পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ (ছিলেন/ছিলেন না)।

৬। আলফ্রেডকে মহাপুরুষ বলা (হইত/হইত না)।

৭। পরম জল দিয়া বাসন ধুইলে ভাল (হয়/হয় না)। ইত্যাদি। এই জাতীয় প্রশ্নের মধ্যেই যে উত্তরটির ইঙ্গিত থাকে, কিংবা অনেক সময়ে ভাষাই অর্থহীন হইয়া পড়ে তাহাও প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রবীণ পণ্ডিত-শিক্ষককে চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইতে হয়। একই প্রশ্নের বিভিন্ন দিক্ হইতে বিভিন্ন উত্তরের সম্ভাবনা না থাকে, কোন্ প্রশ্ন কোন্ শ্রেণীর উপযুক্ত—সেসব বিষয়ে যে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ইহা তো বলাই বাহুল্য।

লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, ৫০টি প্রশ্নে ২০ মিনিট এবং ১০০ প্রশ্নে ৪০ মিনিট সময় দিয়াছি। ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছি, ২০ মিনিটের স্থলে ৭ মিনিটেই ছেলেরা খাতা দাখিল করিয়া দিয়াছে, কিন্তু কতকগুলি ছেলে সময় উত্তীর্ণ হইলেও খাতা দেয় নাই। দয়া করিয়া যখনই অতিরিক্ত সময় দিয়াছি, তখনই ছেলেরা অসদুপায়ের চেষ্টা করিয়াছে। এই পরীক্ষার পুস্তক দেখিয়া নকল করিবে এরূপ সম্ভাবনা অবশ্য একেবারেই নাই, কিন্তু বন্ধুর মৌখিক সাহায্যে সাপরপাড়ি দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ।

E. W. Menzel-এর একখানি পুস্তকে পড়িয়াছি, আমেরিকায় এই জাতীয় পরীক্ষা এখন যন্ত্রের সাহায্যে হইতেছে। কিন্তু human element একেবারে বাদ দেওয়া কী করিয়া সম্ভব হইয়াছে বুঝি না। এত একঘেয়ে প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীরা এত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে যে discretion ব্যবহার না করিয়া পরীক্ষা করা এক যাবত সম্ভব হয় নাই; আপনার কৌতূহল হইলে সেগুলি মৌখিক বলিতে পারি। Test-টাকে objective করার অতিপ্রয়াসে প্রশ্নে বেশি বৈচিত্র্য-সৃষ্টির সাহস পাইতেছি না। কিন্তু যত চেষ্টাই করি, ছাত্রছাত্রীর নিকট হইতে একই উত্তর যখন বিভিন্নরূপে চিহ্নিত হইয়া আসে তখন এই testকেও সম্পূর্ণ objective বলা যায় কিনা সন্দেহ হয়। আমেরিকার সেই যন্ত্রটি কি ভাবে ছাত্রছাত্রীর প্রতি অবিচার না করিয়া নম্বর বসাইতেছে, ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

আমি এখানে আর একটি কাজ করিতেছি। Class I হইতে Class VIII পর্যন্ত প্রত্যেক ক্লাসে রামায়ণ-মহাভারতের জ্ঞান এবং কিছু কবিতা-আবৃত্তি (প্রধানত রবীন্দ্রনাথেরই) আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দিয়াছি। প্রত্যেক নূতন প্রয়াসেই কিছুটা গুঞ্জন হয় এবং এক্ষেত্রেও তাহার ব্যত্যয় হয় নাই। তবে এসমস্ত ব্যাপারে এখন পর্যন্ত প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই।

আমার প্রণাম জানিবেন। ইতি—

প্রণত

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

———

অনগ্রসর শিশুর শিক্ষা

[শ্রীঅদিতি রায়]

পড়ানো যাঁদের ব্যবসা তাঁরা জানেন যতই ভাল করে পড়ানো যাক না কেন প্রত্যেক শ্রেণীতে এমন কতকগুলি ছেলে থাকে যারা বড় দেরী করে বোঝে অথবা একেবারে বুঝতেই পারে না। শিক্ষকের বাচনভঙ্গী যত সুন্দরই হক না কেন, পদ্ধতি যতই সরল ও চিত্তাকর্ষক করা যাক না কেন, এদের কাছে সব কিছুই ভস্মে ঘি ঢালার মত। শুধু লেখাপড়ার কাজে কেন, খেলার মাঠে, চিত্রাঙ্কনে, সঙ্গীতে, হস্ত-শিল্প প্রভৃতি নানা কাজে এমনি পেছিয়ে পড়া শিশুর সন্ধান পাওয়া যাবে। অন্য সব কাজের কথা বাদ দিলেও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে এই সব ছেলেদের নিয়ে মুস্কিল। বোঝাই যায়, সাধারণ-ভাবে অন্য ছেলেদের সঙ্গে এদের লেখাপড়া শেখান চলবে না। তবে কি এদের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে? কিন্তু সব পিতামাতারই যে আর্থিক সাচ্ছল্য থাকবে এরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। এইরকম পিতামাতার যদি কোন অনগ্রসর শিশু থাকে তবে সে ছেলের ত আর লেখাপড়া হবে না। সুতরাং প্রাইভেট টিউটর রাখার ব্যবস্থা অচল। অন্য কোন পথ যদি থাকে তারই সন্ধান করতে হবে।

প্রথমত যেসব ছেলে অনগ্রসর তাদের অনগ্রসরতার কারণ কি তাই খুঁজে বের করতে হবে। কতকগুলি ছেলে জন্ম হ'তেই বুদ্ধিতে কাঁচা থাকে সত্য কিন্তু এমন অনেক ছেলে আছে যাদের বুদ্ধি অন্য সকলের মত হওয়া সত্ত্বেও লেখা-পড়ায় তারা পেছিয়ে পড়ছে। শিক্ষাদান যাঁদের কারবার তাঁরা এমন শিশুর সন্ধান রাখেন। সুতরাং এই সব ছেলেদের জন্ম-কাঁচা বলারও উপায় নাই। নিশ্চয়ই এমন কোন কারণ আছে যার জন্য এরা লেখাপড়ায় পেছিয়ে পড়ছে। যাঁরা অনগ্রসর শিশু নিয়ে কাজ করেছেন তাঁরা জানেন শুধুমাত্র একটি কারণের জন্য শিশু অনগ্রসর হয়ে যায় না। এ বিষয়ে যাঁকে আমরা বিশেষজ্ঞ বলে জানি সেই অধ্যাপক Burtই বলেন Backwardness is a complex condition and must be attributed to a variety and usually to a plurality of causes. সুতরাং বুদ্ধি কম থাকার জন্যই যে শিশু পেছিয়ে পড়েছে এমন মনে করার কারণ নাই। হয়ত তার শারীরিক কোন অক্ষমতার জন্য, বা পরিবেশ খারাপ হওয়ার জন্য অথবা আবেগানুভূতিতে কোনরূপ বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা থাকার জন্য তার এই অনগ্রসরতা। সুতরাং অনগ্রসর শিশু পেলে তাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। তার পিতামাতার সঙ্গে তার সম্বন্ধে ভালভাবে আলোচনা করা দরকার। তার শারীরিক কিংবা মানসিক অবস্থার প্রচ্ছন্ন কোন বেদনা থাকলে মনস্তাত্ত্বিক পন্থার দ্বারা তার নিরসনের চেষ্টা করতে হবে। এ ছাড়াও শিক্ষকের কতকগুলো করণীয় আছে। সেগুলিকে ঠিক ভাবে অনুসরণ করলে অনগ্রসরতা দূর হয়। নিম্নে সেগুলির আলোচনা করা গেল।

মনে রাখতে হবে কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় ছাড়া এই সব ছেলেদের লেখাপড়ার কোন উপায় নাই। নানারূপ হাতের কাজ করে, বিদ্যালয় সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্রে কাজ ক'রে এরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে। সেই অভিজ্ঞতাই হবে এদের লেখাপড়া শেখার ভিত্তি। তাছাড়া লেখাপড়াটা যদি কাজের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে কাজ করার আনন্দও লেখাপড়ার মধ্যে সঞ্চারিত হবে।

তাছাড়া এই সব শিশুদের কাছে বিষয়বস্তু খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে উপস্থাপিত করতে হবে। চোখ দিয়ে, কান দিয়ে এরা লেখাপড়ার কাজ যত না করবে তার চেয়ে বেশি করবে হাত দিয়ে এবং প্রয়োজন হলে সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে। এ বিষয়ে একটা পরীক্ষিত সত্যের কথা বলা যাক। একটি ছেলে ধারাবাহিকভাবে গণনা কিছুতেই শিখতে পারছিল না। কাঠির তাড়া, ডেকুসবীচি, যা শিক্ষা-পদ্ধতির পুস্তকে পড়েছি তাই প্রয়োগ করেও এর কাছ হ'তে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। তখন একদিন ডাণ্ডাগুলি খেলার আশ্রয় নিলাম। ডাণ্ডাগুলির মত ছোলাতুলি খেলার নিয়ম হচ্ছে, ডাণ্ডা দিয়ে দুই মুখ ছুঁচোলো গুলিটার একপাশে আঘাত করার পর গুলিটা যখন কিছুটা শূন্যে উঠবে তখন তাকে জোরে আঘাত ক'রে দূরে পাঠিয়ে দিতে পারে। তারপর যেখানে গুলিটা পড়ল সেখান থেকে নির্দিষ্ট একটা গাবু পর্যন্ত যত ডাণ্ডা হবে তত সংখ্যা হবে যে ছেলেটি গুলিটাকে মারতে পেরেছে তার লাভ। সুতরাং ডাণ্ডা দিয়ে গুনতে হলে গণনা শিখতে হয়। সকলের কাছে জিজ্ঞেস করে করে খেলার ছলে সেই অনগ্রসর শিশুটি অল্পদিনের মধ্যেই ২০ পর্যন্ত গুণতে শিখেছিল। এই ছেলেটিকে শুধুই ধারাপাত থেকে সংখ্যা মুখস্থ করালে কোন ফল হত না।

দ্বিতীয়ত এই সব ছেলেকে লেখাপড়ার কাজ দিতে হবে খুব অল্প। সকলের সঙ্গে যখন সে শুনবে তখন তার প্রতি বিশেষ জোর দেবার দরকার নাই। এরা অন্য ছেলের মত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করতে পারে না বলেই না এরা অনগ্রসর। সুতরাং এরা যখন অন্য ছেলেদের সাথে শুনবে তখন তাদের শোনার বাধা না দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আর একবার লক্ষ্য করে সেই জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে হবে। মনটা কাজ করার বহুক্ষণ সময় পাওয়ায় এখন এরা জিনিসটা বুঝলেও বুঝতে পারে।

এই সমস্ত শিশুর কাছে শিক্ষাগত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ক'রতে হবে খুব বেশি করে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে পুনরাবৃত্তির মধ্যে যেন বৈচিত্র্য থাকে। একটা জিনিসকে বোঝাতে হ'লে বিভিন্ন উদাহরণের সহায়তা নিতে হবে। তার কারণ একই জিনিস একই ভাবে বারংবার বললে তাদের ঔৎসুক্য ও মনঃসংযোগ ব্যাহত হতে পারে।

এই সব শিশু যাতে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠতে পারে সে ব্যবস্থাও করতে হবে। সাধারণত শিশু নিজের সম্বন্ধে ছোট ধারণা পোষণ করতে থাকে তখনই যখন সে কাজে বারংবার ব্যর্থ হয়। শেষে এই হীনমন্যতাই তার অনগ্রসরতার একমাত্র কারণ হয়ে ওঠে। সুতরাং এই সব ছেলেদের এমন কাজ দিতে হবে যার পরিণতি কৃতকার্যতায়। কৃতকার্যতা মনকে অফুরন্ত আনন্দ দেয়। যা তারা পারবে না এমন কাজ দিলে সেই বিষয় সম্বন্ধে চরম ভীতি এসে যাবে। পক্ষান্তরে সহজ কাজ থেকে কঠিনের দিকে টেনে নিয়ে গেলে কৃতকার্যতা লাভ করার ফলে কাজে আনন্দ পাবে এবং আগ্রহের সঙ্গে সেই কাজ করতে চাইবে। সুতরাং আত্মবিশ্বাস আগরণের দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

সামান্য কৃতকার্যতায় এদের উৎসাহ দিতে হবে খুব বেশি। যখন কোন কাজে শিশুটি আটকে যাচ্ছে তখন উৎসাহ দিয়ে বলতে হবে একাজ সে পারবেই। তার মত ছেলের একাজ না পারার কোন কারণ নাই। কাজটি পারার পর প্রশংসা তার যেটুকু পাওনা তার থেকে আরও বেশি উজাড় করে দিতে হবে। বারংবার একটি জিনিস বোঝাতে গেলে একটু বিরক্তি আসাই স্বাভাবিক। কিন্তু এদের ক্ষেত্রে শিক্ষককে অত্যন্ত সংযমী হয়ে বিরক্তিকে দমন করতে হবে। বার বার উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও সে যদি অকৃতকার্য হয় তথাপি বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে উৎসাহ দিয়েই বলতে হবে, "এখন হয়ত তোমার মন নাই, তাই এই সহজ

জিনিসটি পারলে না", "যাক এস আমরা খেলাধুলা করি" ইত্যাদি বাক্যে অন্য বিষয়ে মোড় ফেরাতে হবে।

বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিশুরই শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বিকাশের একটী ধারাবাহিক উন্নতি-পত্র সপ্তাহে সপ্তাহে রাখা উচিত। এর দ্বারা বোঝা যায় কোন্ শিশুটি কোন্ বিষয়ে অনগ্রসর। তখন অন্য পন্থায় দ্বারা তাদের সেই অনগ্রসরতা দূর করা যায়। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের উন্নতিপত্র আমরা সপ্তাহে সপ্তাহে রাখলেও পারি। তার কারণ এই সব শিশুদের উন্নতি সহজ দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে। কিন্তু অনগ্রসর শিশুদের বেলায় প্রত্যেক দিনই উন্নতিপত্র রক্ষা করতে হবে। কারণ এদের বিকাশের গতি এত মন্থর যে গভীরভাবে লক্ষ্য না করলে তা' ধরা পড়ে না। সুতরাং প্রত্যেক দিন শ্রেণীর কাজের শেষে এদের মানসিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কথা বিস্তৃতভাবে শিক্ষক লিখবেন। সপ্তাহের শেষে এই পর্যবেক্ষণের কথা পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যাবে তাদের কিছু কিছু উন্নতি হচ্ছে কিনা এবং এই পর্যবেক্ষণ বিবরণীর উপর ভিত্তি করেই তাদের শিক্ষাদান পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে।

অনগ্রসর শিশুকে বিদ্যালয়ের সব কাজের পুরোভাগে আনতে হবে। নানারকম কাজের দায়িত্ব তার মাথায় চাপাতে হবে। ফুলো কাটার সময় তকলী বিতরণ করবে সে। চিত্রাঙ্কণের সময় রঙের ও তুলির হিসাব ক'রে সে ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দেবে। বিদ্যালয়ে যে দোকান খোলা হবে তার হিসাবপত্র রাখা, ক্যাশমেমো প্রভৃতি রাখার কাজও করবে সে। বনভোজনের সময় কত খরচ হবে তার হিসাব নির্ধারণ, সেই অনুপাতে চাঁদা সংগ্রহ করা, উৎসবের সময় তার হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি সমস্ত কাজই সে করবে। বিদ্যালয়ে সে যদি তার নিজ সত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে তবে বিদ্যালয়ের প্রতি তার আকর্ষণ আসবে। এ সমস্ত কাজও তখন সে যেমন দরদ দিয়ে করবে, লেখাপড়ার কাজেও সেই দরদ আনার চেষ্টা করবে।

সাধারণভাবে অনগ্রসরতাকে কেমন করে দূর করা যায় তারই আলোচনা হল। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য পথ থাকতে পারে। বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন রকম সমস্যা। প্রকৃতভাবে বিচার করে সমাধানের সন্ধান করতে হবে। কিন্তু সে ভাবেই আমরা চলি না কেন, অনগ্রসর শিশুটির কাজকর্মে যদি আনন্দের সঞ্চার করতে পারি তবে অনগ্রসরতা দূর হতে বেশি দেরি হবে না।

শিক্ষাবিদ্ কুইনটিলিয়ান

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দে

কোন দেশের শিক্ষা যুগের দাবীকে অস্বীকার করিতে পারে না। সেইজন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে শিক্ষার রূপ বদলায় যুগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। এ কথা অবশ্য সত্য যে, প্রকৃত মানব-সত্তা দেশকালের অতীত প্রকৃত মানুষ হইতে হইলে যে গুণাবলী এবং কর্মসাধনা প্রয়োজন তাহা সকল দেশেই প্রায় এক প্রকার। কিন্তু ইহা ব্যতীত পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে অধিকাংশ নর-নারীকে নিজ নিজ আদর্শ ও কর্ম বাছিয়া লইতে হয় এবং সেই অনুসারে তাহার শিক্ষা অগ্রসর হয়।

প্রাচীন গ্রীস্ দেশে জীবনের সেরা আদর্শ ছিল নির্মল জীবন, অধ্যাত্ম চিন্তা ও স্বদেশসেবা। প্লেটো তাঁহার শিক্ষানীতি এই আদর্শের উপরই ভিত্তি

করিয়া রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে যাঁহারা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁহারা হইবেন জ্ঞানী এবং সত্যদ্রষ্টা ঋষি। সেইজন্য দার্শনিক রাষ্ট্রবিদ্ (philosopher-king) তাঁহার শিক্ষার আদর্শ। রোমে যেমি, শিক্ষার আদর্শ গ্রীক্ আদর্শ হইতে কিছুটা পৃথক্। সাম্রাজ্যবাদী রোমের আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঠিকমত পরিচালনার জন্য এক শ্রেণীর বাগ্মির বিশেষ প্রয়োজন হইল। এই বাগ্মিশ্রেণী অসাধারণ বাচন-ক্ষমতা ব্যতীত চরিত্রে উন্নত, আদর্শে নিষ্ঠাবান্ এবং সুপণ্ডিত হইতেন। জনসভায় বক্তৃতা, আইন প্রণয়ন, পৌরসভা পরিচালন, বিভিন্ন সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সাহায্য রোমক সভ্যতার ধারক ও বাহকদিগের প্রধান কাজ ছিল। সুতরাং বাগ্মিতার সঙ্গে আর একটি গুণ, (যাহার উপর রোমের শিক্ষাবিদ্ কুইনটিলিয়ান বিশেষ জোর দিয়াছিলেন) নির্মল চরিত্র অপরিহার্য। ভিতরে সার না থাকিলে, প্রকৃত কল্যাণকামী না হইলে, কেবল বাচন-শক্তি দ্বারা দেশ ও সমাজের কোন হিত করা যায় না—কুইনটিলিয়ান এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাগ্ বিভূতির সহিত অন্তর-বিভূতির যোগ সাধন করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রকৃত মঙ্গলকামী এক শ্রেণীর উচ্চ চরিত্র-শক্তি-সম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ সৃষ্টি করাই তাঁহার আদর্শ ছিল।

সেই জন্যই কুইনটিলিয়ানের লিখিত গ্রন্থ Institutes of the Orator কেবল অলঙ্কার এবং বাগ্বিধির পুস্তক নহে; ইহা শিক্ষা সম্বন্ধেও একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থরূপে আদৃত হইয়া আসিয়াছে। এই গ্রন্থে লেখক যে মতামত বিবৃত করিয়াছেন, আসলে তাহাই তাঁহার শিক্ষাতত্ত্ব। এই তত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় চিন্তাধারা অগ্রসর হইয়াছে। নিম্নে মতামতগুলি সংক্ষেপে দেওয়া হইল।

শিক্ষায় শিশুর মৌলিক প্রকৃতিকে (Nature) অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষক তাঁহার সকল জ্ঞান, কলা ও কৌশল প্রয়োগ করিয়াও অভিপ্রেত ফল লাভ করিবেন না—যদি শিশুর মৌলিক প্রকৃতি এ বিষয়ে সাহায্য না করে। মানুষের চেষ্টা ও প্রয়াস আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় পাঠরত শিশুর শারীরিক ও মানসিক অনেক অসম্পূর্ণতা দূর করিতে পারে বটে, কিন্তু এখানেও একটি সীমা আছে যাহা অতিক্রম করা যায় না। সেইজন্য শিক্ষাকার্যে মৌলিক প্রকৃতি নানা বিসংবাদ সত্ত্বেও অনুকূল হওয়া চাই একথা সত্য।

কুইনটিলিয়ান শিক্ষাকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করিয়াছেন। প্রথম পর্যায়ে সাত বৎসর পর্যন্ত শিশু গৃহে অধ্যয়ন করিবে। তৎপর সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা, তৎপর অলঙ্কার শাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা।

শিশুর প্রথম পর্যায়ের শিক্ষার উপর কুইনটিলিয়ান বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন। শৈশব ও বাল্যে ইঙ্গিত-গ্রাহিতা (suggestion) ও অনুকরণ শিশুর জীবন গঠনে যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করে তিনি সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন ছিলেন। প্রবণতা ও প্রবৃত্তি যাহাতে শিশুর শিক্ষায় সহায় হয় সেইজন্য তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। যিনি শিশুর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন তাঁহার উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়া দরকার, কথাবার্তায় সংযম থাকা ও রুচি উন্নত হওয়া দরকার। যে সব দাসদাসীর হাতে শিশুকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহাদের কথাবার্তায় যতটা সম্ভব শালীনতা থাকা দরকার। এই সময়ে পড়াশুনার উপর খুব একটা চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। লেখাপড়া শিশুর কাছে যাহাতে আনন্দ, আগ্রহ ও আদরের জিনিস থাকে ইহাই এই বয়সে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবার বিষয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের শিক্ষা অর্থাৎ মাধ্যমিক শিক্ষার কালে শিশুর নৈতিক ও মানসিক উভয়বিধ উন্নতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

মানসিক উন্নতির সাথে সাথে তাহার নৈতিক

উন্নতিও হইতেছে কি না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। যে ছেলে ঘরে উৎফুল্ল, পরাজয়ে ম্লান, বাহিরের প্রতিটি ঘাত-প্রতিঘাতে সচেতন, উন্নত চরিত্র তাহাতেই সম্ভব। ছেলেদের কাজের সাথে খেলা এমন ভাবে মিশাইয়া দিতে হইবে যাহাতে কাজ এবং খেলা উভয়ের প্রতি তাহাদের চিত্তের সমভাব থাকে। কুইনটিলিয়ান ছাত্রদের শারীরিক শাস্তিবিধানের বিরোধী। তাঁহার মতে ইহাতে ভাল ত হয়ই না, বরং মন্দ হয়। ঠিক সময়ে মুখের শাসনে কাজ হয়। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক দিনের মুখের শাসন জমাইয়া রাখিয়া এক দিনের বেত্রাঘাতে শোধন করার চেষ্টা হয়। ইহা ত আসলে আলস্য ও ফাঁকির অপর একটি দিক্। যে মুহূর্তে শিশু ভুল করে অথবা তাহার ব্যবহারের প্রচলিত মান হইতে বিচ্যুতি ঘটে, তখনই তাহা নির্দেশ করিলে তাহার অনেক মুখের শাসনের সীমা ছাড়াইয়া যায় না।

প্লেটোর ন্যায় কুইনটিলিয়ানও স্বীকার করিতেন যে, কেবল সৌন্দর্য ও সুষমা নয়, ন্যায় ও নীতির প্রতিও যাহাতে শিশু-মনের আকর্ষণ থাকে তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

যাঁহারা বলেন যে, ছাত্রদের একসাথে অনেক-গুলি বিষয় পড়াইলে তাহাদের মনোযোগ অসংলগ্ন ও অসংবদ্ধ ভাবধারার সৃষ্টি হইতে পারে, কুইন-টিলিয়ান তাঁহাদের সহিত একমত নহেন। তাঁহার মতে, শিশুর মনের সচেতনতা ও ধারণাশক্তি আমরা যত কম মনে করি তত কম নহে। ঠিকমত আগ্রহ সৃষ্টি করিতে পারিলে শিশু যে একসাথে একাধিক পাঠ্য বিষয় গ্রহণ করিতে পারে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

কুইনটিলিয়ান তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনায় শিক্ষককে একটি বিশেষ স্থান দিয়াছেন। কেবল বিদ্যা ও জ্ঞান নয়, শিক্ষকের নীতিজ্ঞান ও অন্তঃশুচিতাই শিশুকে উন্নতির পথে ধাপে ধাপে লইয়া যাইতে পারে। শিক্ষা সম্বন্ধে আদর্শনীতি, বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, সব কিছুই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। এই সহজ সত্য কুই-ন টিলিয়ানের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়]

The Road to Life: A. S. Makarenko: 8 vols. Current Book Distributors. 9/2, Madan Street, Calcutta-13. Price Rs. 1/8 each vol.

মাকারেনকো ইহাকে শিক্ষা-সংক্রান্ত এপিক বলিয়াছেন। বইটি তিনখণ্ডে প্রায় বারোশত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রুশ-দেশের ১৯২০-২৫ সালের শিক্ষাসঙ্কটের বিষয় লইয়া লেখা।

মাকারেনকো ঐ দেশের বেপরোয়া ছেলে-মেয়েদের লইয়া 'গোর্কি-কলোনী' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নানাধরণের ছেলেমেয়ে নানা-ধরণের অপরাধ-প্রবণতা লইয়া এইখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছে। মাকারেনকো এবং তাঁহাদের সহ-কর্মীরা মিলিয়া তাহাদের বিকৃতভাবে জীবনের পথের নূতন দিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটাইয়া মানুষ করিয়া তুলিলেন, পুস্তকখানি তাহারই এক সুদীর্ঘ ইতিহাস।

মাকারেনকো ছিলেন শিক্ষাবিদ্। কিন্তু শিক্ষা-নীতির বাঁধাধরা নিয়মকে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন

করিয়া করিয়া তিনি ছেলেমেয়েদের মানসিক জটিলতাকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করিতেন। মাকারেনকোর অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারা যায়, শিক্ষানীতির মত তত্ত্বও কেবল শিক্ষা করিয়াই সফল হয় না, তাহাকেও জীবন্ত করিয়া তুলিতে হয়। মাকারেনকো প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া শিক্ষাজগতের নিকট চিরকালের শিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হইয়াছেন। অথচ, ইহারই মধ্যে তাঁহার স্থির লক্ষ্য, সতর্ক পদবিক্ষেপ, আত্ম-বিশ্লেষণ প্রভৃতি গুণ তাঁহাকে সত্যকার জাতীয় শিক্ষাবিদ্ হিসাবে প্রমাণিত করিয়াছে। ছেলে-মেয়েদের কোন্ পথে লইয়া যাইবেন ইহা তাঁহার নিকট স্থির-নিশ্চিত, কেমন করিয়া লইয়া যাইবেন তাহা তাঁহার চরিত্রের গ্রহণ-ক্ষমতার দিক নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। মাকারেনকোর এই চলমান অস্মিতাই সমগ্র পুস্তকে অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে।

ঘটনা-প্রবাহে উপন্যাসের ভঙ্গী, রচনায় কথা-সাহিত্যিকের নিপুণতা; কিন্তু বিষয়বস্তু সত্যকার কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াই বিধৃত হইয়াছে।

ইহার মধ্যে শৃঙ্খলা-পরায়ণতা, শিক্ষা-অধিকারদের পুঁথি-পড়া বিদ্যার সহিত সংগ্রামের দিক, ছেলেমেয়েদের মনের বিচিত্র প্রকাশ, বিদ্যালয়ের নানাবিধ সমস্যা, বিদ্যালয়ের অর্থাগমের দিক এবং অন্যান্য উদ্ভাবনী শক্তি যাহা শিক্ষাব্রতীর অনুধাবনযোগ্য, তাহা পূর্ণভাবে লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

পুস্তকখানি আমাদের দেশের শিক্ষাব্রতীদের নিকটও বর্তমান সময়ের উপযোগী। ঐ সময়ে রুশ-দেশও নূতন জীবন-দর্শনের দিকে অগ্রসর হইতেছে, আমাদের দেশেও তো এখন সেই অবস্থা। মাকারেনকো তাঁহার কর্ম-প্রতিভাবলে শিক্ষার মধ্য দিয়া তৎকালীন সমাজ-ধারার পরিবর্তন করিয়াছেন, বুনিয়াদি শিক্ষাতেও গান্ধীজী সেই কথা বলিয়াছেন; কিন্তু মাকারেনকো কর্মের মধ্য দিয়া, মনের নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া যাহা সফল করিয়া তুলিলেন, আমরা কর্মভীরু হইয়া গান্ধীজীর সেই আদর্শকে ব্যর্থ আর কাল্পনিক প্রমাণ করিবার জন্য পুথির হাতিয়ার লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি।

শিক্ষাজগতে যে কর্মের কত বড় ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে মাকারেনকো তাহা মনোজ্ঞ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। স্বার্থত্যাগ বলিতে, চরিত্রের অস্মিতা বলিতে যে কি বলা হয়, মাকারেনকোর জীবন-বিশ্লেষণ তাহা প্রমাণ করে। মনের প্রবল-শক্তি যে কি বস্তু, তাহা এই পুস্তকে সুনিপুণভাবে বলা হইয়াছে।

আমরা সকল শিক্ষাব্রতীকেই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | মাঘ ১৩৫৯ | ৩য় সংখ্যা

আলোচনা

ইংরাজি ভাষা ও শিক্ষাপদ্ধতি

সম্প্রতি দিল্লীতে ভারতের নয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের এক সম্মেলনে এদেশে ইংরাজি শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অনেকে মনে করেন, হিন্দীকে বুঝি অতঃপর ইংরাজির বিকল্পে ধরা হইবে তবে তো ইংরাজির কদর কমিয়া যাইবে; কিন্তু তিনি এরূপ কোন আশঙ্কার কারণ দেখিতে পান না। কারণ চিরদিনই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একদল লোক ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষভাবে চর্চা করিবেন। কিন্তু বর্তমান ভারতে ইংরাজির স্থান কখনই পূর্বের মত হইতে পারে না। আগে ইংরাজির উপর অত্যন্ত বেশি জোর দেওয়া হইত, ফলে মাতৃভাষার তো অবহেলা হইতই, বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিবার বিফল চেষ্টায় অনেক অমূল্য মেধারও অপচয় হইত। সত্য কথা বলিতে কি, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার অন্যতম সাধক হিসাবে এই ভাষা শিক্ষা করা হইত না, ইংরাজি ভাষার ব্যুৎপত্তিলাভকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা হইত। এখন অবশ্য তাহা চলিতেই পারে না, এখন ইহাকে পাশ্চাত্য জ্ঞান ভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠি হিসাবে ও আন্তর্জাতিক সংযোগের সেতু হিসাবে বিচার করিতে হইবে। তাই আজ প্রশ্ন হইল, এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইংরাজির পাঠ্যতালিকা ও তাহার উপযোগিতা এবং শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? আজ ইংরাজি ভাষা শিক্ষার উপযোগিতার নূতন সূত্র ও ভাষ্য করিতে হইবে, নূতন প্রণালী উদ্ভাবন করিতে হইবে, যাহাতে অল্পতম সময়ে ও আয়াসে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। অধ্যাপক কবীর প্রসঙ্গক্রমে বলেন যে, গত যুদ্ধে বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করিবার যে সব সহজ আশ্চর্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল সে সব আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কি না, তাহাও ভাবিয়া দেখার বিষয়।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরিষদের মুখ্য পরামর্শদাতা

অনার্স যে কি সহাধীন বলেন, ইংরাজির কোর্স সংক্ষেপ করিতে হইবে, কেননা ইংরাজির জন্ত আগেকার মত এত সময় দেওয়া আর সম্ভব নয়, কারণ ছেলেদের একাধিক ভাষা শিক্ষা করিতে হইতেছে। তাছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজির স্থান কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করিতে গেলে দেখিতে হইবে, ছেলেরা ইস্কুলে কতদূর ও কোন্ পর্যায়ের মত শিখিয়া আসিয়াছে।

অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত মহাশয়ের মতে এই যুগ পরিবর্তনের সময়টিতে কলেজে শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজিই থাকিবে; ইহার পরিবর্তে রাষ্ট্রভাষা অনেক পরে আসিবে।

এই সম্মেলন তিনটি কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন, প্রথম কমিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে, ডিগ্রোমা ও রাষ্ট্রচালনা ইত্যাদি পরীক্ষার ব্যাপারে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষার ভবিষ্যৎ পদ্ধতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবেন; দ্বিতীয় কমিটি ইংরাজি ভাষা শিখাইবার প্রণালী ও শিক্ষকের শিক্ষণ সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন, তৃতীয় কমিটি বিচার করিয়া দেখিবেন, কিভাবে ধীরে ধীরে শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজির বদলে মাতৃভাষা বা রাষ্ট্রভাষা করা যায়, রাষ্ট্রের পরিচালন কর্মের জন্ত যেসব পরীক্ষা গৃহীত হয় তাহাতে ইংরাজি ভাষা কতখানি স্থান অধিকার করিবে, ও ইংরাজি ভাষা ও সংস্কৃতির অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্ত অনুসন্ধিৎসু ছাত্রছাত্রীকে কিরূপ সুযোগ সুবিধা দেওয়া যাইবে।

কমিটির অনুসন্ধান ও তাহার ফলাফলের জন্ত আমরা ব্যগ্র ভাবে অপেক্ষা করিব। এই সঙ্গে মনে পড়িল, একজন ইংরাজ অধ্যাপক কিছুদিন আগে বলিয়াছিলেন, ইংরাজ চলিয়া যাইবে, তাহা যেমন সত্য, ইংরাজি ভাষা থাকিয়া যাইবে, ইহাও তেমনই সত্য। বর্তমান সময়ে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরাও ইহা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু কথা হইল, কি ভাবে থাকিবে? ইংরাজি না বুঝিলে ও ভাল করিয়া বলিতে না পারিলে একদিন শিক্ষাদীক্ষা আমাদের ব্যর্থ বলিয়া মনে হইত; আজও কি তাহাই চলিতে পারে? আজ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু অন্যান্য স্বাধীন দেশে ইহাকে যে মূল্য দেয় তাহার বেশি দিতে গেলে চলিবে না। অবশ্য ইংরাজি ভাষা আজ বহু শতাব্দীর সঞ্চিত সম্পদে সমৃদ্ধ, বিশুদ্ধসাহিত্যানুরাগী তাহার জন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে পারেন, তাহার রসমাধুরী উপভোগ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না, বরং তাহাতে আমাদের ভাষা ও চিন্তাধারার উন্নতিই সম্ভব। কিন্তু জোর করিয়া শিক্ষার্থী মাত্রেরই উপর চাপানো, ও এই বিদেশী ভাষা শিক্ষার দুরূহ চেষ্টায় জন্ত জাতীয় শক্তির অপচয়, এই দুইটির কোনটাতেই আমাদের কল্যাণ নাই। মাতৃভাষার অনুশীলন হউক, মাতৃভাষার মাধ্যমে মানুষ জ্ঞান অর্জন করুক, জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠ হউক, তবে আপনি বাহিরের পাঁচটা ভাল জিনিসের আদর হইবে।

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

স্থানাভাবের জন্ত আমরা ইচ্ছা সত্ত্বেও গত সংখ্যায় রাষ্ট্রপতির অভিভাষণের মূল বিশেষ উদ্ধৃত করিতে পারি নাই। এই সংখ্যায় তাহা পাঠকদের সামনে উপস্থিত করিতেছি:

"আপনারা দেখিতে পাইতেছেন কি, স্কুল কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত যুবকযুবতীর সংখ্যা কত বাড়িয়া গিয়াছে, আর প্রতি বৎসর কত বাড়িতেছে? এই সংখ্যা-বৃদ্ধি সন্তোষের কারণ বটে, কিন্তু ইহা চিন্তারও কারণ। যদি আমাদের শিক্ষার পদ্ধতি এই রকম হইত যাহাতে শিক্ষিত কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞানলাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রেরও উন্নতি হইত, আর বিদ্যার্থিগণ এইরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন হইত যাহাতে স্বাবলম্বী হইয়া

নিজের দেহের আর মস্তিষ্কের শক্তির দ্বারা জীবন নির্বাহ করিতে পারিত, দেশ এবং সমাজের জন্য ইহার অপেক্ষা অধিক মঙ্গলকারী আর কিছুই হইতে পারিত না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটির পরিচায়ক ইহাই হইয়াছে যে, শিক্ষিতবর্গের অধিকাংশ লোক কেবল আপিসে ছোটখাটো কাজ করিবার যোগ্যতাপ্রাপ্ত হন, আর সেই যোগ্যতা সকল সময়ে উচ্চ শ্রেণীর যোগ্যতা নহে, আর অধিকাংশ অন্যপ্রকারের স্বাবলম্বী জীবন লাভের যোগ্যতাও হারাইয়া ফেলেন।

"আমার ধারণা, যতক্ষণ শিক্ষা-বিষয়ের এবং শিক্ষাক্রমের মৌলিক পরিবর্তন না হইবে এবং তার দৃষ্টিকোণ একেবারে বদলাইয়া দেওয়া না যাইবে, ততক্ষণ যত গভীরতা ও কার্যকুশলতা আমরা চাই তাহা আসিতে পারিবে না।

"যতক্ষণ ব্যবহারিকতা এবং সত্যকার কর্মের অনুভব যথোচিত স্থান না পাইবে, ততক্ষণ এই ত্রুটি দূর হইতে পারিবে না। আজ যে সহস্র সহস্র যুবকযুবতী কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ছুটিয়া যায়, তাহার কারণ এই যে তাহাদের জীবন-বৃত্তি লাভ করিবার অন্য কোনও পথ নাই। তাই যে-প্রতিষ্ঠান প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার মৌলিক চিন্তার কেন্দ্র হইতে পারে এবং হওয়া দরকার, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকুরির আবেদনকারীদের এক কারখানা মাত্র হইয়া পড়ে।

"আজিকার শিক্ষাক্রমে চরিত্রগঠনের কোন মহত্ত্ব নাই আর স্থানও নাই। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিতে গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। একসঙ্গে বসবাসের ফলে এক প্রকারের ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ঘটিত। আজকাল আমরা প্রায় শুনিতে পাই যে, এক এক স্থানে বিদ্যার্থিগণ শিক্ষকের বিরুদ্ধে হরতাল করিয়াছে, আর কোথাও বা শিক্ষকদের মধ্যেই দলাদলি হইয়াছে। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, ইহার মূল কারণ চরিত্রগঠনে উপেক্ষা এবং এবং ছাত্রদের উপর শিক্ষকসম্প্রদায়ের নৈতিক প্রভাবের হ্রাস।

"আগে আর এক সংস্থা এবং শক্তি ছিল যাহা ইহার ত্রুটি আংশিক ভাবে দূর করিতে পারিত। আমাদের ঘরে ঘরে বরাবরই একরকম না একরকম ধার্মিক অনুষ্ঠানকৃত্য হইত; রামায়ণ মহাভারতের গল্প ও কথা হইত।.....যে উৎসব এবং মেলা আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাপ্রদ ছিল তাহার যোগাযোগ আজ নাই; ক্রমে ক্রমে তাহা লোপ পাইয়া যাইতেছে, সুতরাং তাহাদের যে প্রভাব তরুণদের ও বয়স্কদের উপর পতিত, তাহাও প্রতিদিন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

"আজ পশ্চিমী বিচারের যত প্রভাব এই দেশের উপর পড়িতেছে, পূর্বে কখনও তত পড়ে নাই। হৃদয়কে উপেক্ষা করিয়া কেবল মস্তিষ্কের দ্বারা নিজেকে কিংবা অন্য কাহাকেও সুখী করা যায় না।

"সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতির পূর্ণ সংস্কার প্রয়োজন। শিক্ষক সম্প্রদায়ের অথবা জাতীয় নেতৃবৃন্দের শুধু মুখের কথায় দেশের ছাত্রছাত্রী সমাজ গড়িয়া উঠিবে না। তাঁহাদের নিজেদের চরিত্র ও ব্যবহার সর্বপ্রকারে কথার অনুকূল হওয়া চাই, তবেই জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জাতির ভবিষ্যৎ নির্মাতৃগণ আপনাপন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে।"

জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ গত ১৮ই মাঘ কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলভেডিয়ার প্রাসাদে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্বোধন করেন। এই লাইব্রেরি আগে কলিকাতায় অবস্থিত ছিল। তখন ইহার নাম ছিল ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি। স্বাধীন ভারতে নামের পরিবর্তন হইয়াছে, স্থানেরও। এই ধরণের গ্রন্থাগার কোলাহলমুখরিত লোকালয়ের বাহিরে হওয়াই দরকার। নিভৃতে, মনোরম পরিবেশে জ্ঞানের তপস্যা নিবিঘ্নে ও অবাধে

চলিবে। স্বাধীন ভারত চাহে, এই গ্রন্থাগার জ্ঞান ও বিদ্যার নিলয়রূপে, মনীষার পীঠস্থানরূপে জগতের মধ্যে একদিন শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করুক।

মৌলানা বলেন, বেলভেডিয়ার প্রাসাদটি একদিন স্বাস্তিক রাজশক্তির করায়ত্ত ছিল, সাধারণ লোকের এখানে প্রবেশ কল্পনার অতীত ছিল। আজ এখানে জাতির জ্ঞানভাণ্ডার স্থাপিত হইল। জ্ঞানপিপাসু বিদ্যার্থী অবাধে এই ভাণ্ডারে প্রবেশ করিয়া রত্ন আহরণ করিতে পারিবে। স্বাধীন ভারতের আত্ম-প্রতিষ্ঠার এক বিশেষ গৌরবের অধ্যায় আজ সূচিত হইল।

এই লাইব্রেরির সঙ্গে যাঁহাদের নাম যুক্ত আছে সেই দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বাঙালী মনীষীদের নাম আজ শ্রদ্ধায় স্মরণ করিবার দিন। এই গ্রন্থাগারে ৭৫০,০০০ গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে ৭৫,০০০ গ্রন্থ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহ হইতে তাঁহার ছেলেরা দিয়াছেন, বিদেশের অনেক ভদ্রলোক অমূল্য উর্দু ও আরবি গ্রন্থ এখানে দান করিয়াছেন। মৌলানা সাহেবের অভিভাষণটি বেশ চিত্তাকর্ষক ও তথ্যপূর্ণ হইয়াছিল। এই গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লর্ড কার্জনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, লর্ড কার্জনের আকাঙ্ক্ষা ছিল, এই লাইব্রেরিটি যেন একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান হয়, আজ তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইয়াছে। লর্ড কার্জন একই সময়ে হলওয়েলের মনুমেন্টও স্থাপন করিয়াছিলেন। কালের বিচারে সেই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত অকীর্তি আজ লুপ্ত, কিন্তু বিদ্যার মন্দিরটি কালজয়ী হইয়াছে।

ভাষা ও অনুবাদ

[শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য]

সেদিন আমার একটু দেরি হইয়া গিয়াছিল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখি, রবিবাসরীয় প্রাতঃকালীন আড্ডাটি বেশ জোর জমিয়া উঠিয়াছে। বৃদ্ধ অধ্যাপক গাঙ্গুলী মহাশয়ের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, আজকালকার ছেলেদের ইংরাজিতে অধিক সংখ্যায় ফেল করা লইয়া তর্কটা শুরু হইয়াছিল। গাঙ্গুলী মহাশয় বলিতেছিলেন—আজকাল আর সে দিন কাল নেই মশায়। আমাদের সময়ে ছেলেদের এন্ট্রান্সে গণ্ডা দুই বই পাঠ্য ছিল, তার উপরে রো সাহেবের গ্রামারখানা কণ্ঠস্থ রাখিতাম। বেণীমাধব গাঙ্গুলীর অনুবাদের বইখানা তখনও বেরোয়নি। আজকাল তো এই বইখানার নামই শুনতে পাই না। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাস, শশিভূষণ চাটুয্যের রামের রাজ্যাভিষেক—এইসব উমেদো উমেদো বই থেকে আমাদের অনুবাদ করতে হত। আর, সে সব কি লব্জ!—যেন এক একখানা তোপ। কত্তক দিকি আজকাল ছেলেরা সেই সব অনুবাদ? অত কথায় কাজ কি, মানে বলুক দিকি—'গলদর পটল', 'মরীচিমালী' এইসব কথার!

পণ্ডিত মহাশয় এক টিপ্ নস্য লইয়া বলিলেন, তা যা' বলেছেন। আরে, আজকাল যেন বাংলা ভাষা—যা হল গিয়ে মাতৃভাষা—তারই যেন মা-বাপ নেই, তো ইংরেজি! সেদিন খাতা পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখি ফার্স্ট ক্লাসের এক ছাত্র একটা প্রবন্ধের উপসংহার লিখেছে—বেশ কায়দা করেই লিখেছে—'আমাদের সাধনা যেন বেপথু না হয়ে যায়।' জিজ্ঞাসা করলাম, বাবাজীবন, 'বেপথু'

শব্দটির তাৎপর্য কি? উত্তর পেলাম, 'ভূলগৎ'! এর চেয়ে আর কি অধঃপতন চান?

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন—সেবার ম্যাট্রিকের খাতা দেখছি। 'আমাদের পাড়ার গুরু মহাশয়'—গরুকে মল ছেলে কি অনুবাদ করেছে জানেন?—'The Cow master of our mercury'। অনেক ভেবে ঠিক পেলাম, কেউ কেউ 'ড়' স্থানে 'র' উচ্চারণ করে, তাই 'পাড়া' হয়েছে 'পারা'—আর পারার ইংরাজি তো জানেনই mercury; 'গরু' দাঁড়িয়েছে 'গরু'তে, তাই 'গরু'=Cow 'মহাশয়'=master,—এবার একসঙ্গে জুড়ে নিন, 'The Cow master of our mercury',—বুঝলেন হিং টিং ছটের ব্যাপার? আর ব্যাকরণের কথা কি বলব? 'ব্যাকরণ' বলে কোন বস্তু আছে তাতো এই গর্দভগুলোর লেখা দেখলে মনে হয় না। এমন কি আমরাও যেটুকু জানতাম, পূর্বজন্মার্জিত পাপের ফলে এদের পড়াতে পড়াতে তাও ভুলতে বসেছি। দেখে শুনে ঘেন্না ধরে গেছে মশায়, পরশুরামের ভাষায় বলতে গেলে—'ছি-ছি' বললে যেন পুরো বলা হয় না, তোবা তোবা বলতে ইচ্ছা করে।

নগেনবাবু এক কোণে চুপ চাপ বসিয়া দৈনিক কাগজে বাজারদর পড়িতেছিলেন। এই দলের মধ্যে তিনিই বিদ্যায় একটু নিরেশ, যদিও ব্যবসা করিয়া উপার্জন করেন প্রচুর। কথাটা বোধ হয় তাঁহার গায়ে লাগিল। তিনি কাগজ নামাইয়া বলিলেন—ব্রাদার, খালি ছেলেদের দোষগুলোই দেখ্‌চো, নিজেদেরটা তো বলছ না! আমার ওই ছোট নাতিটা—আট বছর তার বয়েস, এই বছর অনেক হাঁটাহাঁটি করে তাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলাম। ওরে বাবা—ওইটুকু ছেলের বইয়ের বহর দেখ—রাতারাতিই তাকে বিদ্যার জাহাজ বানিয়ে দেবে! ভাষাই শিখতে হবে তাকে তিনটে—ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি। তার উপর অঙ্ক আছে, ইতিহাস আছে, বিজ্ঞান আছে, ভূগোল আছে, স্বাস্থ্য আছে, ড্রয়িং আছে,—বলতে ভুলেছি, আবার সিভিক্‌স্ বলে একটা নতুন বস্তুও এ বছর ধরিয়েছে। নেই শুধু ফিলসফিটা! কোনটা করবে? স্কুলেই বা কতটা পড়াবে? আর ওইটুকু ছেলের উপর তিনটি ভাষা চাপালে কোনটিই বা ভাল করে করবে? তিনটের মধ্যে একটি তো বিদেশী, আর বাঙালীর কাছে হিন্দীটিও একটি বিদেশী ভাষা বলব বই কি। এর উপরের ক্লাসে উঠলে তাকে তো আরও একটি ভাষা শিখতে হবে—সংস্কৃত। ভাল ছেলেদের কথা বলতে পারি না, আমার নাতির বুদ্ধির দৌড় তো আমি জানি—তার পিঠে এ বোঝা চাপালে সে কত আর ভাল করবে?

হারানবাবু চায়ের পেয়ালাটি নামাইয়া রুমালে মুখ মুছিয়া বলিলেন, তা যা' বলেছ একশবার, ব্রাদার। আহে, ভাষার সৃষ্টিতো মনের ভাব প্রকাশের জন্য,—যা তা করে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলেই হল। আমি যাচ্ছি—তা সে I am goingই বলি আর I is goingই বলি, আমি যে যাচ্ছি তা বোঝালেই হল;—গ্রামারের অত কচাকচির মধ্যে যাবার কি প্রয়োজন, আমি তো আর সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাচ্ছি না? কর্তাদের আমলে শুনেছিলাম, bothe are gooda লিখে এক বড়বাবু দুজন উমেদারের চাকরি করে দিতে চেয়েছিলেন। সেই বিদ্যা নিয়েও তো তিনি চালিয়েছেন।

পণ্ডিত মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—সেটা আবার কি গল্প?

হারানবাবু বলিলেন—বড়বাবুর দুজন উমেদার, সম্বন্ধীর ছেলে আর ভাইপো—আর দুটিই তাঁর গলগ্রহ। সাহেবকে ধরা কওয়া করাতে সাহেব বললেন, ডাটু, তেকাল্লী তো মোটে একটা, তুমি বরং পরীক্ষা করিয়া আমাকে জানাও কোন

candidateটি উত্তম আছে। বড়বাবু আর কি বলবেন? দুটোকেই যে ভাল না বললে চলে না। অনেক ভেবেচিন্তে লিখলেন, 'both are good'! তারপরে ভেবে দেখলেন, 'both'-এ 's' নেই, 'good' এও 's' নেই, তবে 'are' কেন হবে? শুধরে লিখলেন, 'both is good', তবু খটকা রাখল, দুজন যে! 'is' কি করে হয়? তখন লিখলেন 'boths are good'; কিন্তু 'both'-এ 's' হবে আর good-এ হবে না, এ কেমন ব্যাকরণ? তাই লিখলেন, 'boths are goods'! অবশ্য, এতে উমেদারদের চাকরি হয়েছিল কিনা জানা নেই। আমার বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে ভাষাকে সংহার করে যা খুশী তাই লেখ। তাহলে তো বলতে পারতাম মাথা নীচের দিকে করে পা উপর দিকে তুলে হাঁট,—হাঁটা নিয়ে যখন কথা, তখন মাথা দিয়েই হাঁটি আর পা দিয়েই হাঁটি, হাঁটলেই তো হল। কাঠের ঘোড়া হলে কি হয়—জল খেলেই তো হল। আমি তা বলছি না। আমি বলছি—মনের ভাব যতটা পারা যায় সুষ্ঠু-ভাবেই ছেলেরা প্রকাশ করুক। কিন্তু ছেলেরা তাই বলে যদি একটা preposition-এর ভুল করে, definite আর indefinite article-এর সামান্য প্রভেদ হয়, কিংবা বহু বিধানের অথবা পর বিধানের সূক্ষ্ম তারতম্য হয়, তবেই তাদের মাথাগুলো হাত দিয়ে কাটবার কি দরকার! ঘোড়া তো তাদের উপর বল চালাচ্ছে না। কবিরা ভুল লিখলে তোমরা বল আর্ষপ্রয়োগ, আর ছেলেরা ভুল লিখলে তোমরা করাও কেন।

সদ্য আনীত চায়ের টে হইতে ধূমায়িত পেয়ালাটি তুলিয়া লইয়া আমি বলিলাম, ভায়া, বিপদ তো ওইখানে—সুষ্ঠুভাবে মনের ভাব প্রকাশই যে ছেলেরা করতে পারছে না। তোমার সাধ্য কি Cow master of mercury-এর মধ্য থেকে পাড়ার গুরু মশায়কে খুঁজে বার কর। আমরা, অর্থাৎ যে কটা সেকেলে শিক্ষাব্রতী আছি, আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি, ছেলেগুলো অন্তত যা বলতে চায় তা গুছিয়ে লিখুক—কিন্তু পারছি কই? ভাষা যত সরল থেকে সরলতর হচ্ছে, শিক্ষার্থীদের লেখা ততই দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে। তুমি তো বললে সূক্ষ্ম তারতম্য—সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্যেও যে প্রাণটা যেতে পারে! সেই গল্পটি জানতো,—এক ব্যক্তির অপর একজনকে বিপদের সম্ভাবনা জানিয়ে কোন স্থানে আসতে নিষেধ করে চিঠি লিখবার প্রয়োজন হয়েছিল; কিন্তু যেটাযির বিরামচিহ্ন ব্যবহারের জ্ঞান তত প্রখর ছিল না। তার লেখবার কথা, 'তুমি আসিও না, আসিলে সমূহ বিপদ।' কিন্তু লিখে বসলেন, 'তুমি আসিও, না আসিলে সমূহ বিপদ'। পত্র পেয়ে লোকটি সেইস্থানে গিয়ে যেযোরে প্রাণটি হারাল। সামান্য একটি কমার স্থান পরিবর্তনে একজনকে ইহ লোক থেকে বিদায় নিতে হল! উদাহরণটি অবশ্য চরমই হল। তাহলেও বলছি, সুষ্ঠুভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে হলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জিনিষকেও অবহেলা করলে চলবে না। মনের ভাব তো নানা প্রকারে প্রকাশ করা যেতে পারে—শুকনো কাঠকে আগুন দিয়েও যেমিয়ে দিতে পার, আবার বলে দিতেও পার—শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে, আবার এও বলতে পার নীরসঃ তরুবরঃ পুরতঃ ভাতি। তিনটের মধ্যে কোনটি শুনতে ভাল লাগে? কোনটির প্রভাব শ্রোতার উপর অধিক হয়? তোমার কথাতেই বলি, সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করাটিই বড় কথা। তাই কথাটিকে এমনভাবে প্রকাশ করতে হবে যেন সেটা হৃদয়গ্রাহী ও মধুর হয়, যে কারণে সেটার প্রয়োগ করছি, প্রয়োগের গুণে তার সার্থকতা হয়। এর জন্যই চাই ভাষার জ্ঞান, প্রয়োগের জ্ঞান, ব্যাকরণের বিধির জ্ঞান। গলাটি মিষ্ট হলেই ভাল গাইয়ে হয় না, তাকে সুর-সাধনা শিখতে হয়। কতকগুলি ভাল ভাল শব্দ জানা থাকলেই হয় না,

সেগুলি প্রয়োগ করবার নিয়মকানুন অর্থাৎ ব্যাকরণও জানা চাই। ব্যাকরণের প্রয়োজন এইখানে। এসব একদিনে জানা যায় না, শেখা যায় না—এর জন্য নিরলস সাধনা চাই। আজকাল ছেলেরা হয় লেকথা মানে না, নয় লেকথা ভুলেছে, তাই ভাষার পরীক্ষায় এত ছেলে অকৃতকার্য হচ্ছে।

হারাণবাবু বলিলেন, কিন্তু ব্রাদার, যে ভদ্রলোক boths are goods বলেছিলেন তাঁর তো কাজ চালাতে অসুবিধা হয় নি? আর ভুলের কথাই যদি ধর, যে ভুল ব্যাস-বাল্মীকির বেলায় হলে বলবে আর্ষ প্রয়োগ, ছেলেদের বেলায় যদি সেই ভুলই হয় তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে কেন?

দার্শনিক গোবিন্দ এতক্ষণ চুপ চাপ উদাসনয়নে বসিয়া ছিল। সে এইবার বলিয়া উঠিল—দাদা, স্বীকার করুন আর নাই করুন ভাষার মধ্যে অর্থের সৃষ্টি হওয়াতেই এত ঝামেলা বেড়েছে। ভেবে দেখুন, আদিম মানব যখন অতীতের অরণ্যে বাস করত, তখন তো তার ভাষার মধ্যে অর্থের বালাই ছিল না। কিন্তু তখন কি সে তার মনের ভাব প্রকাশ করত না? তার ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ, তার আশ্রয়-স্থানের সন্ধান, তার প্রিয়ার সঙ্গে অভিসার—সবই তো সে তখন করত, অর্থহীন ভাষায় তার ভাবের আবেগ হয়তো আরও বাড়ই ছিল। চেয়ে দেখুন, মানুষ ছাড়া প্রকৃতির কোন প্রাণীর অর্থযুক্ত ভাষা আছে? কিন্তু তার মনের ভাব প্রকাশ করতে তো কোন বাধা হচ্ছে না! একটা উদাহরণ নিন, প্রভাতের যেন সোনালী আলোয় পাখীর যে নিরর্থক ভাষার গান, কোন কবিতায় তার সীমা মাপা চলে? রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি করে বলি, অর্থরূপ নিগড়ে ভাষাকে বন্দী করেছে মানুষ। এই শৃঙ্খলে মুক্তিকাম ভাষাকে আবদ্ধ রাখার জন্য তার আপ্রাণ প্রয়াসের ফল হচ্ছে ব্যাকরণ, অলঙ্কার প্রভৃতি আরও নিগড়ের রচনা।

গাঙ্গুলী মহাশয় একটু উষ্ণ স্বরে বলিলেন, আমি বাপু দার্শনিক নই, অত গূঢ় তত্ত্বের মধ্যে যাবার আমার সামর্থ্যও নেই। আমি সেই মানুষ যে অর্থযুক্ত ভাষা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারে না। কাজেই অর্থ যাতে যথাযথ ভাবে সম্যক বোঝা যায় এমন ভাবে ভাষার ব্যবহারই আমি মনে করি সমীচীন। আর সেইটা হচ্ছে না বলেই আমার এত উষ্মা।

আমি বলিলাম, হারাণচন্দ্রের বর্ণিত বড় বাবুর ইংরেজি শুনে হয়তো তাঁর সাহেব কৌতুক বোধ করতেন, কাজেই তাঁর কাজ চলে যেত। কিন্তু যদি অন্য কেউ ঐরকম ভাষায় কথা বলে তাবে, বেশ চলবে, তবে তাকে বাতুলাশ্রমে পাঠানই যুক্তি সঙ্গত। আর হারাণচন্দ্র যে বার বার আর্ষ প্রয়োগের কথা তুলছে, তার উত্তরে বলতে হয়, আর্ষ প্রয়োগ করার যার ক্ষমতা আছে, সেই আর্ষ প্রয়োগ করতে পারে, অন্যে নয়। খরস্রোতা নদী দুর্বার গতিতে পাথর কেটে আপনার পথ আপনি করে চলে; তার জলে দুকূল হয়ে ওঠে সরস—তার তীরে গড়ে ওঠে গ্রাম নগরের মেলা। প্রতিভার সৃষ্ট ভাষা তেমনি মানুষের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলে, ব্যাকরণ তাকে অনুসরণ করেও পঙ্কে ওঠে। কিন্তু যে জলধারার স্রোত নেই, তাকে বইবার পথ না কেটে দিলে সে আবদ্ধ থেকে পচিল আবর্জনাময় অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির সৃষ্টি করে; কাজেই সাধারণ লোকের ব্যাকরণের সাহায্য এত প্রয়োজন।

পণ্ডিত মহাশয় নস্যদানি হইতে পুনরায় একটিপ নস্য লইয়া বলিলেন, ম-র-ণ এর আসার পূর্বে আমরা যে বিষয় আলোচনা করছিলাম তা থেকে কিঞ্চিৎ দূরে সরে এসেছি। আমরা আলোচনা করছিলাম অনুবাদের কথা। আজকাল ইংরেজি বৈদেশিক ভাষা, সংস্কৃত ভাষা পাঠের আর প্রয়োজন নেই, ইত্যাদি কারণ দেখিয়ে সকল ভাষাকেই

অবহেলা করা হচ্ছে, তার ফলে কোন ভাষাই ছেলেরা শিখছে না। অনুবাদ সুষ্ঠুরূপে করবে কি করে? গোড়াতেই যে গলদ—কিছুই শেখে নাই।

নগেনবাবু কহিলেন—আপনারা এতগুলো ভাষা ছেলেদের ঘাড়ে চাপালে তারা শিখবেই বা কি?

আমি বলিলাম—কতগুলি ভাষা ছেলেদের কোন বয়সে শেখানো উচিত তা নিয়ে মাথা ঘামান গাঙ্গুলী মহাশয়ের মত প্রবীণ শিক্ষাব্রতীর্গ, —আমার আপাতত সে বিষয়ে কিছু বলবার নেই। আমার শুধু বক্তব্য যে, যেটা শিখব সেটা ভাল করে শেখা উচিত। কথাটা বহু ব্যবহৃত, কিন্তু দামী কথা। আর, আমার বিশ্বাস একটি ভাষা ভাল করে শিখলে, অর্থাৎ ভাষার ধ্বনি বোঝবার মত কান তৈরি হলে আর একটি ভাষা শেখা এমন কিছু কঠিন ঠেকে না।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—আপনি আবার গোবিন্দবাবুর মত দার্শনিক তত্ত্ব সুরু করলেন যে। আমি তো খুব উচ্চ স্তরের অনুবাদের কথা বলছি না, সাধারণ স্কুল কলেজের ছাত্রদের কথাই বলছি। তাদের ভাষার জ্ঞান অল্প এটা দুঃখের কথা সন্দেহ নেই; তবে বেশি দুঃখের কথা, তাদের জ্ঞান বাড়াবার আগ্রহ নেই।

হারাণবাবু বলিলেন—এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে শুধু তো ব্যাকরণের জ্ঞান থাকলেই চলবে না—তাকে ভাষার শব্দ সম্পদেরও খবরদারি করতে হবে, অর্থাৎ একটা ছোটখাটো অভিধানও মুখস্থ রাখতে হবে। তার উপর চাই তার শব্দচয়নের শক্তি।

আমি বলিলাম, এই জন্য উচিত পাঠ্যপুস্তকের বাহিরের প্রসিদ্ধ লেখকদের লেখা পড়া। তাতে শুধু যে শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি পাবে তা নয়, শব্দচয়নের শক্তিও বাড়বে এবং রচনাশৈলীর কুশলতাও আসবে। আমরা চিরকাল জানতাম, সংস্কৃত অথবা লাতিন প্রভৃতি যাকে তোমরা 'মৃত' ভাষা বল, তাকে ভাষান্তরিত করতে গেলে ভাষানুযায়ী অনুবাদ হওয়া উচিত; আর যাদের তোমরা 'জীবন্ত' ভাষা বল তা থেকে অনুবাদ ভাবানুযায়ী হওয়া উচিত। এই প্রণালীতে অনুবাদের ফলে ভাব ও ভাষা উভয়ই সমৃদ্ধ হতে পারে।

হারাণবাবু বলিলেন—সব কথা মানলাম। কিন্তু ভাবানুযায়ী অনুবাদ করতে গেলেও তো ভাষার জ্ঞান চাই। অনেক কথা আছে, যার অন্য ভাষায় প্রতিশব্দ নেই। তার কি করে অনুবাদ করবে? রবীন্দ্রনাথের উদাহরণ স্মরণ কর—'Horse is a noble animal'—এর মধ্যে 'noble' এর কি বাংলা প্রতিশব্দ দেবে? তোমার বিদেশিনী প্রিয়া তোমার উপর অভিমান করেছেন কিনা, ইংরেজি কোন শব্দ দিয়ে তা জিজ্ঞাসা করবে? জীবন্ত এক ভাষার অনেক শব্দ আর এক জীবন্তভাষা আত্মসাৎ করে নিজেকে সম্পদশালী করে বটে, কিন্তু সেগুলো হয় বহুল প্রচারিত, নয় বহু-পরিচিত শব্দ—যেমন, বাংলায় গির্জা, চেয়ার, টেবিল, প্রভৃতি ইংরেজিতে Satin, goonda, dacoit প্রভৃতি। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য 'অভিমান' তো এদের কোন কিছুর পর্যায়ে পড়ে না। তুমি যদি ইংরেজিতে অভিমান শব্দ চালাতে গিয়ে প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা কর, 'Have you *abhimaned* upon me,' তিনি অভিমান ভুলে হার্লি ষ্ট্রীটের মস্তিষ্ক-বিশারদের নিকট তোমার চিকিৎসার জন্য তৎক্ষণাৎ দৌড়াবেন। অথচ, grief, anger কোন কিছু দিয়েই তুমি এই অভিমান শব্দ বোঝাতে পার না।

আমি বলিলাম—এই জন্যই তো ভাবানুযায়ী অনুবাদের কথা তোলা। যেখানে প্রতিশব্দ নেই বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে ভাবটাকে প্রকাশ করতে হবে কৌশলে। আর এইখানেই অনুবাদকের বাহাদুরি। ছাত্রদের কথা ছেড়ে

সাধারণভাবে বললে বলব, অনুবাদ করার মধ্যে শব্দসৃষ্টিরও অবকাশ প্রতিভাশালী লেখকের আছে। অবশ্য আমার বাল্যকালে আমার এক সমপাঠী শব্দনির্মাণে যে অপরূপ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন সেরূপ দক্ষতার কথা বলছি না। 'archer' কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ তাঁর মনে না থাকায় তিনি অনেক ভেবে চিন্তে লিখেছিলেন, 'ধনুর্বান ছোড়ক'। তবে ছেলেপিলেদের বাঁধানো রাস্তা ছেড়ে অন্য পথে না চলাই ভাল, তাতে ভুল পথে যাবার অবকাশ আছে। পণ্ডিত মহাশয় মন্তব্য করিয়া বলিলেন, অর্থাৎ 'বেপথু' হবার সম্ভাবনা। সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন, আজ আলোচনা এই পর্যন্তই থাক। ইতি মধ্যেই বাড়ীর ভেতর হতে স্নানের তাগাদা এসেছে। আবার আসছে রবিবার। —সভাভঙ্গ হইল।

ছড়ায় শিশুশিক্ষা

[শ্রীবকুলমালা সেন এম. এ]

প্রতিভাবানের প্রতিভাসম্ভূত যে দান তাহা জাতির অলঙ্কার। সংস্কৃতি ও রুচির পরিচয় তাহাতে মেলে। কিন্তু সেই অলঙ্কারদীপ্ত দেহে যে প্রাণলীলা ছন্দে ছন্দে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে, তাহার নিখুঁত ছবি পাইতে হইলে পল্লীর কুটিরে কুটিরে যাওয়া প্রয়োজন।

ছেলেভুলান ছড়াগুলি এমন একটি উপাদান যাহার ভিতর আমরা সেকালের বাংলার খণ্ড খণ্ড চিত্র অবিকৃত ভাবে দেখিতে পাই। কিন্তু শুধু সমাজচিত্র নহে; জননীর কোলে বসিয়া শিশুরা এই ছড়াগুলির সাহায্যে যে শিক্ষা লাভ করে, তাহা যে অবহেলার যোগ্য নহে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত, আলোচনার ক্ষেত্রে আসিয়া আশা করি আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

প্রাকৃতিক পরিবেশে শিশুকে প্রকৃতির সহিত একাত্ম করিয়া গড়িয়া তোলার উপর শিশু-মনোবিদ্‌গণ বিশেষ জোর দিয়া থাকেন। আমরা জানি, সেকালের বাংলা ছিল পল্লী-প্রধান, সুতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশ যত্ন করিয়া সৃষ্টি করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই পরিবেশের সহিত শিশুর আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দিতে জননীরা অবহেলা করেন নাই। নিম্নলিখিত ছড়াগুলিতে আমরা তাহার পরিচয় পাই—

বক মামা বক মামা ফুল দিয়ে যা,
নারকোল গাছে কড়ি আছে গুণে নিয়ে যা।

বক মামার পক্ষে যে ফুল দেওয়া বা কড়ি গুনিয়া লওয়া সম্ভব নহে, জননীটি নিরক্ষর হইয়া থাকিলেও ইহা অবশ্যই জানিতেন। এ শুধু ফুল, নারিকেল গাছ এবং নীল আকাশে উড্ডীয়মান শুভ্র বকের সহিত শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দাওয়ায় বসিয়া ক্রন্দনরত শিশুকে ভুলাইবার সময় সম্মুখের যে মনোরম দৃশ্যে তাহার মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রশান্তি সীমাহীন। অনন্ত নীল আকাশের বুকে দুই-একটি নারিকেল বৃক্ষ বাঁকড়া মাথা দুলিয়া হয়তো দাঁড়াইয়া আছে। তাহার উপর দিয়া বলাকাশ্রেণী কুন্দফুলের মালার মত বাতাসে ভাসিয়া চলিয়াছে, কতদূরে, কে জানে। শিশুকে ভুলাইবার জন্য এই মনোজ্ঞ চিত্রটির দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রয়াস স্বাভাবিক পথ বাহিয়াই আসিয়াছে। ভাবপ্রকাশে ভাষার যে অক্ষমতা,

তাহা শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার পথে কোন বাধাই জন্মায় না।

খুকি মামা খুকি মামা রোদ কর না,
আমরা সবাই শীতে মরি, তা কি দেখ না।

অথবা—

ঘর মরাইয়ে হাত দিয়ে ছোট মরাইয়ে পা দিয়ে
আয় খুকি ঝলমলিয়ে।

'অবারিত মাঠ গগনললাট' পল্লীতে শীতের প্রখরতা বেশি থাকে। সেকালে বর্তমান কালের মত এত রকমারি পোষাকের প্রাচুর্য ছিল না; সুতরাং শীত নিবারণের জন্য খুকি মামার দেওয়া উত্তাপের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইত। শীতের প্রভাতে সুখস্পর্শ উজ্জ্বল রৌদ্রালোক শিশুর দেহ-বেষ্টিত 'ঝোলাই' ভেদ করিয়া তাহার দেহে মনে পুলকের শিহরণ জাগাইত। অনুভবের দ্বার দিয়া অস্তিত্ব যখন এমন স্পষ্ট হইয়া উঠে, সেই পরম-ক্ষণেই তো বস্তুটির সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপন করিতে হয়। শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে পুথির বিদ্যা কিছুমাত্র না থাকিলেও এ সুবর্ণ সুযোগ সেকালের জননীরা হেলায় হারান নাই। প্রকৃতির সঙ্গে শিশু-মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপনের এরূপ প্রযত্নের প্রয়াস অনেক ছড়াতেই আছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্যের সমগ্রতা শুধু নয়, তাহার বিশেষ বিশেষ অংশের বর্ণবৈচিত্র্যের দিকেও শিশুর মন আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা ছড়ায় আছে। আধুনিক শিশুশিক্ষা পদ্ধতিতে বর্ণের বিভিন্নতা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মানোর জন্য বিধিবদ্ধ প্রণালী গ্রহণ করা হইয়া থাকে। নিম্নোদ্ধৃত ছড়াগুলিতে বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতি শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট রূপেই বোঝা যায়।

ওপারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝম্‌ঝম্,
এপারেতে লঙ্কা গাছটি লাল টুকটুক করে।
ওপারেতে কালো মেঘ এবং এপারেতে লাল
টুকটুকে লঙ্কার সঙ্গে শুশ্রূষা ভাইএর জন্য মন কেমন করার হয় তো বা সংযোগ থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে নিবিড় কালো পটভূমিকায় টুকটুকে লালের ঔজ্জ্বল্যই শিশুর মনকে আকর্ষণ করে বেশি। বস্তুর সাহায্যে রংএর সহিত নামের সম্পর্ক স্থাপনে এই জাতীয় ছড়াগুলি যে শিশুশিক্ষায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আতা গাছে তোতা পাখী, জামির গাছে বৌ,
অথবা,—
টিয়ের মার বিয়ে, লাল গামছা দিয়ে—

প্রভৃতিতেও দেখিতেছি গাঢ় লাল ও গাঢ় সবুজের বর্ণমাধুর্য অনুভব করিতে শিশুকে প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে।

পশুপাখী ও নানারূপ ইতর প্রাণীর প্রতি শিশুর স্বাভাবিক প্রীতি ও কৌতূহলকে প্রশ্রয় দেওয়া যে তাহার বিভিন্ন মানসিক বৃত্তি স্ফুরণের অনুকূল, সেকালের বঙ্গললনাগণ এ বিষয়ে হয়তো সচেতন ছিলেন না। কিন্তু শিশুর মানসিক গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান চিনিয়া লইতে তাঁহাদের অন্তর্নিহিত স্নেহের আলো যে নির্ভুল পথ প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহার পরিচয় আছে—

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে
গেল চিলে।

অথবা—

আয় রে আয় টিয়ে নাবে চড়া দিয়ে,
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে,
তা দেখে দেখে তোঁদর নাচে।

বাঙালী শিশুর মাছের সঙ্গে পরিচয় প্রায় জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে। সুতরাং মাছ ধরিতে যাওয়াটা আনন্দজনক কাজ হওয়ারই কথা। কিন্তু যেকোন সোনার মাছ ধরাতে বিশেষত্ব থাকা চাই। যে সে নদীর মাছ যে সে লোক ধরিতে পারে, খোকার জন্য চাই পরম লোভনীয় অদ্ভুত-

ধারার প্রবাহ। পায়ে পায়ে যে বিস্তৃত জীবটি বিকট গাম্ভীর্যের গ্যাং শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, যে চিল আকাশের সুদূর প্রান্তে নয়া ছোঁয়ার বাহিরে থাকিয়া সুতীক্ষ্ণস্বরে নিস্তব্ধ দুপুরের বুক চিরিয়া শিশুমনকে কল্পনারাজ্যে উধাও করিয়া লইয়া যায়, সেই জীবদুইটির প্রতি শিশুদের কৌতূহলের সীমা নাই। সুতরাং খোকন সোনার মাছধরার পর্ব উদ্‌যাপন করিতে তাহাদেরই আমদানী করা হইয়াছে।

পাখীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা শিশু-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য। সদাচঞ্চল ক্ষুদ্র পাখীটির অঙ্গের লঘুতা, কূজনের মনোগ্রাহিতার মধ্যে শিশু যেন আপনারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পায়। সুতরাং তাহাকে আশ্রয় করিয়া শিশু-মনোবৃত্তি বিকাশের সুগম পথ পায়। ছড়ায় পাখীর প্রাদুর্ভাবের প্রাচুর্য শিকার দিক দিয়া এগুলিকে বিশেষত্ব দান করিয়াছে।

আয় রে পাখী ল্যাজঝোলা,
খেতে দেব দুধ কলা—

অথবা—

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে,

কিংবা—

খোকা বলে পাখীটি কোন দিকে চরে,
খোকা বলে তাক দিলে উড়ে এসে পড়ে।

পাখীর সঙ্গে শিশুর দেখা শোনা হয় অত্যন্ত কাছাকাছি হইতে, জানাশোনা হয় একান্ত নিবিড়। কিন্তু শুদ্ধ-শোণিত মেনি বিড়ালের সঙ্গে খোকাদুদুর পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা সব কিছুকে হার মানাইলেও তার গাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলন, দেহাবয়বের প্রায় সমকক্ষতা মনে একটু সম্ভ্রম না জাগাইয়া পারে না। সুতরাং

পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে?
বাড়ীতে আছে বুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে।

অর্থাৎ সে-ই যোগ্য প্রহরী।

ছড়ায় সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু হইতেছে ইহার শব্দ-ঝঙ্কার। শিশুচিত্তে ছন্দ ও সুরের প্রভাব যে কত বেশি, তাহার চিত্তের রুদ্ধ অর্গল খুলিয়া দিতে ইহার কার্যকারিতা কিরূপ শক্তিশালী, আজিকার দিনে তাহা আর নূতন তথ্য নয়। সেকালের বয়স্কজননীরা তাঁহাদের স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা বলে শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য ছড়া বাঁধিবার কালে এবিষয়ে যে কুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার ফলে শিশু-শিক্ষার ক্ষেত্রে ইহার মূল্য সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কাকটি ম'ল ধড়ফড়িয়ে
বিষ্টি এল চড়বড়িয়ে।

কাকের মৃত্যুর সঙ্গে বৃষ্টির সম্পর্ক হয় তো আছে, কিন্তু তার চেয়ে 'ধড়ফড়িয়ের' সঙ্গে 'চড়বড়িয়ের' ধ্বনিগত সম্পর্ক অনেক বেশি।

আঁটুল বাঁটুল শ্যামলা সাঁটুল
শ্যামলা গেছে হাটে—

অথবা—

তালগাছ কাটম্ বোসের বাটম্
গৌরী হেন কি,
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করবো কি।

শ্যামলার হাটে যাওয়া এবং গৌরীর দুর্ভাগ্য বাস্তব ঘটনা হইতে পারে, কিন্তু অপর শব্দগুলির সমাবেশ নিতান্তই তানপুরার তান তুলিয়াছে। উপলখণ্ডে পদে পদে বাহত হইলে ঝরণার কীণধারা সময় সময় বাঁকিয়া চুরিয়া দৃষ্টি-সীমার অন্তরালে চলিয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার ফলে তাহার কল্লোল আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ঝরণা ধারার মত ছেলে-ভুলান ছড়াগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য শব্দঝঙ্কার। শিশু অর্থের কাঙাল নয়। নিমুকের অর্থে এবং বাক্যবিন্যাস-গত অর্থে তাহার সমান উদাসীনতা। পাখীর কিচিমিচি, নদীর কলতান, ভ্রমরের গুঞ্জনের মত অর্থহীন শব্দ-ঝঙ্কারও তাহার মনের অঙ্গনে মধুর নিক্কনে আসর মাতাইয়া তোলে। জননীরা তাঁহাদের সহজাত সংস্কারের বলে শিশুর এ

বিশেষত্বের নিশানা পাইয়াছিলেন, তারই পরিচয় নিম্নলিখিত ছড়াগুলিতে পাওয়া যায়—

কাজি ফুল কুড়ুতে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা,
হাত ঝুমঝুম্ পা ঝুমঝুম্ সীতারামের খেলা।

কাজি ফুল কুড়াইতে গিয়া মালা পাওয়ার মধ্যে কোন পূর্ব ইতিহাসের ইঙ্গিত আছে কি না, তাহা গবেষণার বিষয়, কিন্তু পূর্ব পংক্তির সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন সীতারামের খেলাটি যে কোন্ জাতীয় —সে চিন্তাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার অবসর মাত্র না দিয়া ঝুমঝুম্ শব্দের নৃত্যতালই এখানে প্রধান হইয়া উঠে।

আগা ডোম বাগা ডোম ঘোড়া ডোম সাজে
ভান মিরগেল ঘাঘর বাজে।

ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চামের কৌটা মজুমদার,

কিংবা

হাড় মর মর কেলে জিরে
রসুন কুসুম পানের খিলে।

উল্লিখিত ছড়াগুলিতে শব্দের ঝঙ্কারই প্রধান এবং একমাত্র বিশেষত্ব। ধ্বনিবৈচিত্র্যের সঙ্গে শিশুর অপরিণত শ্রবণ-শক্তির পরিচয় সাধন করিয়া তাহার অনুকরণস্পৃহার সহায়তায় শব্দ-উচ্চারণ-শিক্ষার উপায়ান হিসাবে এগুলির মূল্য অস্বীকার করা চলে না।

পদের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া ঝঙ্কৃত হইয়াছে, ছড়ায় এমন শব্দসম্ভারেরও অপ্রতুলতা ঘটে নাই—

টকা ভেঙ্গে পকা দিলাম
কানে মদন কড়ি

অথবা

উড়কি ধানের মুড়কি দেব
শাশুড়ী ভুলাতে।

কিংবা

অশথ পাতা ধনে, সোণা বেটি কনে,
নকা বেটা বর,
চ্যাম্ কুড়্ কুড়্ বাদ্যি বাজে
চড়ক ডাঙার ঘর।

আবার

কলা পড়ে টুপ টাপ, বুড়ি খায় গুপ গাপ।

ছেলে ভুলান ছড়াগুলি রচনার মূল উদ্দেশ্য বা প্রেরণা যাহাই থাক, যাহাদের জন্য এগুলি রচিত, তাহাদের সহজাত প্রকৃতির উন্মেষের কাজে এগুলি যে সোনার কাঠির স্পর্শের কাজ করে, এ কথা বলিলে আশা করি অতিরঞ্জনের দোষ ঘটিবে না। অন্তত পক্ষে এ কথা স্বীকার করিতে বাধা নাই যে, নিরক্ষর পল্লীজননীগণের অন্তর হইতে উৎসারিত এই ছড়াগুলিকে অপসারিত করিয়া ইহাদের স্থান যোগ্যতর রূপে না হোক, সমভাবে পূর্ণ করিতে পারে এমন আয়োজনের বাংলা সাহিত্যে আজও অভাব আছে। মনে হয়, রামায়ণ মহাভারত জাতীয় মহাকাব্য রচনা যেমন এ যুগে অসম্ভব, এই জাতীয় ছড়া রচনাও তেমনই এ যুগে সম্ভব নহে।

কবিতা পাঠনায় অলঙ্কার ও প্রতিরূপ।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়]

ভালো ও মন্দের, সুন্দর ও অসুন্দরের যত রকম ব্যাখ্যাই থাকুক, দৈনন্দিন জীবনে ভালো আর সুন্দরকে আর সকল থেকে বাছাই করে নেওয়া আমাদের মনের ধর্ম আর কাজের গতি। আর্থিক জগৎ থেকে শিক্ষিত ব্যক্তির বনবাস অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মনটার মধ্যে রামনাথ শান্ত সৌম্য মূর্তি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। যুগের পরিবর্তন এক-রোখা, জ্যামিতিক নিয়মে, মানুষের মনের পরিবর্তন পৃথিবীর নিয়মে, ছুটো গতিতে। কালের প্রবাহ থাকতে পারে, কিন্তু মনের আছে রচনা। ইন্দুল

শিক্ষার্থীদের সুন্দর করে না তুলতে পারলেও, সে তাদের ভালোর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়, আর ভালোকে কেন বরণ করতে হয় তার যুক্তি যুগিয়ে দেয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার বীজগণিতে মনোবিদেরা ভিন্ন কথা বললেও, জীবনের পথে কল্যাণ আর সুন্দরকে গ্রহণ করবার মতো মনের শিক্ষা দেওয়ার কথা তাঁরা জোর দিয়েই ব'লে থাকেন।

কাব্য আর সাহিত্য বিশেষ করে এই শিক্ষার সহায়তা করে। কাব্য আর সাহিত্যই; যেহেতু আমাদের দেশের লেখা-পড়া করার ইস্কুলে সঙ্গীত আর চিত্রাঙ্কন সত্যিকারের ঠাঁই পায় না।

কিন্তু যে-কোন রকমের কবিতা পড়তে গেলেই আমরা অলঙ্কারের সম্মুখীন হয়ে পড়ি। তারপর আছে প্রতিরূপ (imagery)। অলঙ্কার ছাড়া না জন্মালে কবিতার বক্তব্য বোঝা যায় না, প্রতিরূপ পাঠকের চিত্তে সাড়া না জাগালে কাব্য-নির্দেশ ব্যর্থ। ব্রহ্মকে যখন উপলব্ধি করতে পারি নি, তখন 'রস' নিয়েও আমরা বিতর্ক তুলবনা। রসের উপর যত আলোই ফেলি না কেন, ও-টি জিজ্ঞাসা হয়েই থাকবে। কিন্তু অলঙ্কার আর প্রতিরূপ ছেলেদের বুঝিয়ে দিতেই হয়।

অলঙ্কার-বোধ জন্মাতে হলে, শিক্ষকের পক্ষে যেমন কয়েকটি বিষয় জানবার, তেমনি শিক্ষার্থীদের জানাবার। শিক্ষকের জানবার, (ক) কবি অলঙ্কার ব্যবহার করেন কেন, (খ) অলঙ্কারের মাধ্যমে কবির বক্তব্য কি, (গ) কোন্ অলঙ্কারের কি কাজ, (ঘ) কোন্ অলঙ্কার কোন্ বয়সের ছেলেদের বোধগম্য। শিক্ষার্থীদের জানাবার, (১) অলঙ্কারের মধ্যেকার অর্থ, (২) অলঙ্কারের সঙ্গে তাদের মনের যোগ কেমন, (৩) এক অলঙ্কারকে অন্য অলঙ্কারে পরিবর্তিত করা, (৪) নিজস্ব লেখায় অলঙ্কারের ব্যবহার।

কিন্তু এ সব ছাড়িয়ে, শিক্ষককে কবিতার সম্বন্ধে সামগ্রিক বোধ অক্ষুণ্ণ জাগিয়ে রাখতে হবে। কাব্যের আবেদনের সুর শিক্ষক নিজে যেন ব্যাহত না করেন। এইখানেই কাব্যপাঠে শিক্ষকের দায়িত্ব। এই দায়িত্ব কঠিন বলেই অনেকে বলেন, কবিতা পাঠে ঐসব ব্যাকরণ-উপমা-রূপক ইত্যাদির কচকচি পরিত্যাজ্য। তাঁরা বলেন, রূপক-উপমা, ওগুলো কবিতার সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। করলে, কবিতার প্রাণ থাকে না, ছেলেরা কাব্যে উদ্বুদ্ধ হয় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইস্কুলের চার-দেওয়ালের ভিতরে কবিতা-পাঠ হচ্ছে, সত্যিকারের কবিতারসিকের হাতে-গড়ি হচ্ছে। এখানে বেদপাঠ চলে না, হয়ও না। এইজন্যেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞেরা বলেন, বেশির ভাগ ছেলেদের জন্যে এরূপ বিশ্লেষণী শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাংশে। সামগ্রিক সুর থাকবে শিক্ষকের মনে আর আচরণে, আর তাই প্রতিরূপ সম্বন্ধে সম্যক্ বোধ শিক্ষকের থাকা উচিত।

কবিকে অলঙ্কার ব্যবহার করতে হয়, ভাষার নিয়মে, রুচির নিয়মে, মনের নিয়মে। ভাষা প্রতীক। মনের সরল কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অপ্রকাশ্য আর অনির্বচনীয় মনের আবেগ আমরা প্রত্যক্ষ করিবে ব্যবহার করি— অঙ্গভঙ্গী দিয়ে, কারুধ্বনি প্রয়োগে। কিন্তু শ্রোতা যখন অনুপস্থিত, তখন সব কিছু ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করতে হয়। তখনও ইচ্ছা হয়, মনটাকে প্রত্যক্ষ করাই। প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ জগৎ থেকে তখনই ব্যাখ্যার উপাদান সংগ্রহ করতে হয়; উপাদান রূপ নেয় অলঙ্কারে, সুন্দর হয় বক্তব্য, বক্তব্যের বিশেষ দিকে বিশেষ নজর পড়ে পাঠকের। লেখকের প্রথম চেষ্টা হয়, বক্তার মনের অবস্থার সঙ্গে শ্রোতার মনের সমীকরণ; তারপর, ভাবপ্রকাশ করার নানা কৌশল। এই দুই সময়ে অলঙ্কার দুরকমের কাজ করে। প্রথমবারে আসে, ধ্বনি-ভাবের মারফৎ প্রক্ষোভ (emotion) জাগানোর ক্রিয়া, দ্বিতীয় বারে আসে, বলবার আগ্রহ থেকে

বক্তব্যের ব্যাপ্তি। একটি যেন প্রয়োজন, অন্যটি শিল্প। একটি ব্যক্তিক, অন্যটি নৈর্ব্যক্তিক। কাজেই, শিক্ষকের দায়িত্ব যেমন নৈর্ব্যক্তিক শিল্পবোধ জন্মানোর কৌশল শেখানো, তেমনি আছে ব্যক্তিক প্রকোভ-ক্রিয়া সার্থক হয়ে উঠবার জন্যে ছাত্রদের সঙ্গে প্রতীক্ষা। নৈর্ব্যক্তিক বস্তু শেখানো যায়, কিন্তু ব্যক্তিক দিকের জন্যে অপেক্ষা করতে হয়।

শিল্প যখন আছে, তখন রুচি আছে। রুচি আনে নির্বাচনী শক্তির ব্যবহার। এক এক জন কবির এক এক রকমের বাছাই নিয়ম। দেশকালেও পার্থক্য ঘটে। যে-রেখা, যে-কথা পুরানো হয়ে যায়, তাকে ব্যবহার করে কিছুদিন পর আর পাঠকের চিত্তে সাড়া জাগান যায় না। অতি পরিচয় অতি অমনোযোগ আনে। তখনই কবি নতুন পথ কেটে চলেন। এমনি করে পরিবর্তন হয় অলঙ্কারের, প্রতিরূপের হয় রকমফের, প্রকাশে আসে প্রভীবতা।

স্বচ্ছন্দগতিতে মন সজাগ থাকে না; পরাণকে বুঝতে হলে যেমন তার সঙ্গে মরণ-খেলার ঝুলন খেলতে হয়। পথের বাধা পথ সম্বন্ধে মনকে সজাগ আর সতর্ক করে। কবিও তাই কাব্যের অলঙ্কারের মোড় ফেরান; নতুনত্ব আনেন উপমায়, নতুন সাজ যেন রূপকল্পে, প্রতিরূপে। সমাজের বোধের সঙ্গে এই নতুনত্ব মিশে থাকে। শিক্ষককেও তাই সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচয় রাখতে হয়।

পাঠকের ইন্দ্রিয়গুলির দিকে কবি তাই আগে নজর দেন। নজর যেন, চোখ-কান ঠোঁট-নাসারন্ধ্রে। এদের দুটো রূপ আছে; অন্তরঙ্গ আর বহিরঙ্গ। সঙ্গীতে যেমন উদ্‌গ্রাহ, কবিতার বেলাতেও এদের বহিরঙ্গ দিকে নজর দেওয়াই প্রাথমিক কর্তব্য। তারপর অন্তরঙ্গের দিকে নজর। স্নায়ু ক্রিয়ার মতো, এই বহিরঙ্গের প্রভাব অন্তর্মুখী করে দেয় পাঠককে। কবি তাই প্রথমে চোখের সামনে কবিতার সাজ-অক্ষর-বিন্যাস-ছন্দ প্রভৃতি তুলে ধরেন; কানে আনেন ধ্বনি আর শব্দতরঙ্গ; ঠোঁটে আর স্নায়ুতে আনেন উচ্চারণ করবার 'প্রত্যাশা' (expectancy), বহিরঙ্গের এই দিক যে সুরসৃষ্টি করল, তাই বয়ে চলে অন্তরঙ্গের দিকে। এই সময় অন্তরঙ্গ দিকে ফুটে ওঠে নানা রূপচ্ছবি, পাঠকের চিত্তে আনে স্বাপ্নিকতা; আগে শ্রবণ-দর্শন-স্পর্শনের প্রতিরূপ। এইখানে পাঠকের চিত্তে আবির্ভাব হয় অভিভূতির, আগে প্রকোভ। তারপরই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে চিন্তাবোধ জন্মে।

কবির পক্ষে, কাব্যে রস-সৃষ্টি করতে দরকার, প্রথমে অলঙ্কার, পরে প্রতিরূপ।

শিক্ষককেও কবির পাশাপাশি যেতে হয়। উচ্চারণের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মনে জাগাতে হবে শ্রবণের প্রতিরূপ; কানু বা স্বরের আরোহণ-অবরোহণের মধ্য দিয়ে আনতে হবে দর্শনের প্রতিরূপ। পড়বার ভঙ্গীতেই ছেলেদের তন্ত্রীতে, স্নায়ুপরাপনে, সংপ্রত্যক্ষে, আঘাত হানতে হবে। পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির পথে ছেলেদের আহ্বান করতে হবে। একাজ সম্ভব, যদি তারা নিজেরা পড়তে আরম্ভ করে। নিজেরা পড়তে না শিখলে, ছেলেদের কবিতা-বোধ কিছুতেই জন্মাবে না।

কবির প্রক্রিয়াটি যদি মোটামুটি বুঝতে পেরে থাকি তাহলেই অলঙ্কারের নামকরণ আর তাদের উপযোগিতা সহজে বুঝতে পারব। তিন রকমের অলঙ্কার, শব্দালঙ্কার, চিত্রালঙ্কার, অর্থালঙ্কার। চিত্রালঙ্কারের স্বরূপ যাই হোক, আজকাল এর আর ব্যবহার নেই। ইস্কুল কলেজের পাঠনায় আমরা শব্দালঙ্কার আর অর্থালঙ্কারেরই সম্মুখীন হই।

শব্দের বৈচিত্র নিয়ে কবিতায় যে ভণ, তাকেই শব্দালঙ্কার বলি। অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক, বক্রোক্তি, কাকু, প্রহেলিকা প্রভৃতি এই ভাগে পড়ে। অনুপ্রাসের কার্যকরতা খুব বেশি নয়। বড় সহজভাবে কানকে সে প্রলুব্ধ করে। যখন মনের গতি মন্থর তখনই অনুপ্রাসে চমক লাগে। বাংলা

ভাষার গোড়ার দিকের কবিরা (১৭৬০ পর্যন্ত) অনুপ্রাসের দিকে জোর দিতেন। কবিতার এ শিশু অবস্থা। কিন্তু তাই বলে শিশুদেরই মনের উপযোগী এই অনুপ্রাস—একথা জোর করে বলা যায় না। শব্দসম্পদে বেশ সবল না থাকলে বয়স্ক কবির অনুপ্রাসের কৌশলে ভোলা যায় না; অলঙ্কারে অড়িয়ে পড়তে হয়। যেমন ধরা যাক,

চুত-মুকুল-কুল-সকল-দলিকুল
গুণ গুণ রঞ্জন গানে।
মদকল-কোকিল-কলরব-সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাসন তানে॥

এর অনুপ্রাসের প্রভাব কাটিয়ে কবিতা বুঝতে হলে বাংলা শব্দ সম্পদে অধিকার থাকা চাই। মধুসূদনের কবিতাও অনেকাংশে এমনি। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বুদ্ধদেব বসু এই প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাস-প্রবাহ আর শব্দতরঙ্গে পাঠককে আবিষ্ট করে ফেলেন। উপরের কবিতাংশে দেখা যাবে, কানে যেমন এর লহরী এসে পৌঁছায়, তেমনি ওষ্ঠ ও স্বরযন্ত্রে উচ্চারণের এক 'প্রত্যাশা'-ও অনুভব করা যায়। এটি বহিরঙ্গের দিক। অনুপ্রাসের প্রাবল্যে আর আকর্ষণে কবিতার কথার ভেতরে প্রবেশ করবার অবসর আমাদের জোটে না। সঙ্গীত আছে, ধ্যান নেই। এদিক দিয়ে বিদ্যাপতি ছিলেন সিদ্ধকাম। তাঁর হাতে সঙ্গীত আর অনুভাবনা যুগপৎ। বিস্তারিত না বলেও, একথা বলা চলতে পারে, অনুপ্রাসে শব্দের চেয়েও বর্ণের খেলা বেশি।

এরপর শ্লেষ। একমাত্র শব্দ একের অধিক অর্থে। এ-ও একরকমের প্রহেলিকা। অনেক কারণে, এই প্রহেলিকা সৃষ্টি করবার প্রবণতা বাংলা সমাজ ও সাহিত্যে এক সময় বেশ প্রচলিত ছিল। আজকাল কাব্যে তো দূরের কথা, জামাই ঠকানোর কাজেও কেউ ব্যবহার করে না। নাটকে অবশ্য এর প্রচলন আছে। অন্নদার আত্ম-পরিচয়ে আমরা এই শ্লেষের ব্যবহার দেখেছি। শ্লেষে কবির মধ্যে নাট্যকার লুকিয়ে থাকে। কাব্যের অংশ থেকে দর্শকদের বা পাঠকদের বিচ্ছিন্ন ক'রে কবি এখানে লক্ষ্য করেন। শ্লেষে আর যমকে চেহারার পার্থক্য থাকলেও, চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য নেই। যমকে একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে বোঝান হয়, যেমন, 'ভারত ভারত-খ্যাত আপনার গুণে।'

শ্লেষ আর যমক-ও অভিধানের আট-চালার বাসিন্দা। পড়াশুনা না এগোলে শ্লেষ-যমক বোঝা কঠিন। প্রথম শিক্ষার্থীর বেলাতে এ অলঙ্কারের কবিতা পড়ান যায় না। কিন্তু মানসিক শক্তির বিশেষ বৃদ্ধি না হলে যে, এ অলঙ্কারের বোধ জন্মায় না—তা কিন্তু সত্য নয়। অর্থ বলে দিলেই অলঙ্কারের সাপের খোলস খুলে গেল। শ্লেষ-যমকে ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মালেও, কেবল ওষ্ঠ আর স্বরযন্ত্রের প্রত্যাশা ছাড়া আর কিছু নেই। কানও খুব সন্তুষ্ট হয় না। বক্রোক্তি আর কানু কেবল স্বরভঙ্গীকে অবলম্বন করে। প্রহেলিকা হেঁয়ালিমাত্র, সত্যিকারের অলঙ্কার নয়। যাই হোক, ইস্কুলে আমরা অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক—এই তিনটি শব্দালঙ্কারই বেশি পেয়ে থাকি।

অর্থের বৈচিত্র্য নিয়ে কাব্যের গুণ প্রকাশ চলে অর্থালঙ্কার অনুভূতি প্রধান, তবে প্রতিরূপের মতো অতটা নয়। কিন্তু ভাষা-প্রয়োগের আর কথাবার্তার সুরের সঙ্গে, রীতির সঙ্গে স্বভাবোক্তি, অতিশয়োক্তি, নিদর্শনা, ব্যাজস্তুতি, সমাসোক্তি, প্রতীপ, দৃষ্টান্ত, দীপক, সার প্রভৃতি অর্থালঙ্কার, ইস্কুলের প্রয়োজনে প্রধান। সাহিত্যের শিক্ষক মাত্রেরই এইসব অলঙ্কার সম্বন্ধে ধারণা আছে বলে ধরে নিচ্ছি। উৎসুক পাঠকের পক্ষে, বাংলা ভাষায় লেখা, লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়' পুস্তকখানি আবশ্যক বলতে পারি। অনুভূতি-প্রধান যদিও, তবু বলব, যুক্তি-বুদ্ধি বিশেষ না বাড়লেও, অর্থবোধ হ'লেই, এসব অলঙ্কার বোঝা যায়। বাইরের চেহারা দেখে যে-সব অলঙ্কার বোঝা যায়, সেইগুলিই প্রথম থেকে তৃতীয় মানে চলতে পারে। উপমা-রূপক প্রভৃতি অষ্টম থেকে দশম মানের উপযোগী বলে মনে করি। কারণ, তুলনীয় বস্তুর গুণাগুণ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য এ সবেরও প্রকারভেদ আছে।

বানান ভুল

[মৃত্যুঞ্জয় বক্সী]

শ্রীসুকুমাররঞ্জন গুপ্তের লেখাটি পড়ে এ সম্বন্ধে "শিক্ষা"য় একটু আলোচনা করতে ইচ্ছা হল। আজকাল বানান ভুলকে কেউ কতকটা ক্ষমার চক্ষে দেখেন—কেউ আবার সেই অনুপাতে কঠোর হন। কিন্তু শিক্ষার্থীর সুবিধা অসুবিধা বিচার করে দেখাই বোধ হয় ঠিক বিচার হবে। আগেকার যুগে শিক্ষা বলতে ভাষা শিক্ষাই ছিল প্রধান। আজকের দিনে শিক্ষার্থীকে জানতে হয় অনেক কিছু। এজন্য ভাষা সম্বন্ধে একটু শৈথিল্য স্বভাবতই ঘটবে। বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভাষা চর্চা যাঁরা করবেন তাঁরা বাদে অন্যদের ক্ষেত্রে বানান ভুল ও ব্যাকরণ ভুলকে ক্ষমার চক্ষে দেখাই বোধ হয় সঙ্গত হবে।

বাংলা ভাষার শব্দ গুলির মধ্যে বানানের বাঁধাবাঁধি বেশির ভাগ আছে সংস্কৃত হতে পাওয়া শব্দের বেলায়। কিন্তু অনেকেই মনে করেন সংস্কৃত ভাষার খুঁটিতে বাংলা ভাষাকে বেঁধে রাখা ঠিক নয়। আর শব্দগুলির উৎস সংস্কৃত ভাষা হলেও ব্যবহারগত অর্থের পরিবর্তন ঘটে গেছে অনেক। জওহরলালের লেখা "কুশলতা" (ডিগ্রি শব্দ) বাংলায় হচ্ছে "কুশল"। বাংলা ভাষায় দুটি শব্দের কত না পার্থক্য! কিন্তু দুটিই সংস্কৃত শব্দ। স্বর্গীয় সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের "দার্শনিকী" পুস্তকে যে শব্দগুলি দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে আমাদের প্রচলিত বাংলার অর্থের সঙ্গে তার কতই না পার্থক্য। এর কারণ বাংলা ভাষার শব্দগুলি ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহারের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে চায় না। জীবন্ত ভাষার ধর্মই বোধ হয় তাই। এজন্য শিক্ষার্থী বানানের কড়াকড়ির উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না—তাই বানান মুখস্থ করা তার কাছে অর্থহীন বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়ত বাংলা ভাষা আজ জনতার মাঝে মুক্তি পিয়াসী। বইয়ের পণ্ডিতী ভাষায় আবদ্ধ থাকতে সে চাইছে না। উচ্চারণ অনুযায়ী শব্দ নূতন রূপ নিতে চাইছে তাই তার বানান বিচিত্র রূপ নিচ্ছে। পণ্ডিতরা একে ঠেকাতে পারবেন মনে হয় না। উচ্ছলিত জনতরঙ্গকে ঠেকানোর পণ্ডশ্রম না করে তাকে গঠনাত্মক খাতে প্রবাহিত করাই তো বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

তাই ভাবি, বানানের ক্ষেত্রে নূতন মতবাদ মেনে নিলে কেমন হয়। ছুটো ই কার ছুটো উ কার ছুটো ন ছুটো ণ তিনটে শ ছুটো ষ এই গুলিই বাংলা বানানের প্রধান সমস্যা। এগুলো বজায় রাখার ছুটো কারণ আছে। প্রথম ব্যুৎপত্তিগত অর্থের জন্য; কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে শব্দগুলি ঐরূপ অর্থের ঘোঁটায় থাকছে না আজ। দ্বিতীয়, একই শব্দের বিভিন্ন অর্থ ঘটে ঐগুলির ব্যবহার দ্বারা—যেমন বর বড়, চড় চর, শান্ত সান্ত, ইত্যাদি। কিন্তু শব্দের উচ্চারণ যখন মুক্তি পেয়েছে তখন মাত্র অর্থের তারতম্য বোঝাবার জন্য ঐ ভাবে শব্দকে কয়েকটি বর্ণের পার্থক্য দিয়ে চিহ্নিত করে রাখার পরিবর্তে অন্য পন্থা যায় করাই বোধহয় ভাল। না হয় বড় কে "বরো" করে দিয়ে "বর" এর সঙ্গে তার তফাৎটা বজায় রাখা যাবে। বিভিন্ন জেলার উচ্চারণে "ড়" ও "র"-এর পক্ষপাতিত্ব সবাই জানেন। শিক্ষার্থীগণ সে দোষমুক্ত নন, এমন কি শিক্ষক পর্যন্ত। স তিনটির পার্থক্যও তথৈবচ। "কর" অনেক অর্থেই ব্যবহৃত হয়—তবু বুঝতে অসুবিধা হয় না উদ্দিষ্ট অর্থটি।

পার্থক্যগুলো তুলে দিলে হয়তো প্রথমটা খুবই অদ্ভুত লাগবে। পরিবর্তনের নিয়মই তো তাই। কিন্তু সব জিনিসই পরিবর্তিত হয় এবং হচ্ছে। একশ বছর আগের দলিলের ভাষা পড়ে আজ কে না কৌতুক অনুভব করেন? বৈষ্ণব কবিতার ভাষা ছেড়েই দিলাম। পরিবর্তনকে ঠেকাবার ক্ষমতা কারও নাই, তাকে সুবিধাজনক খাতে প্রবাহিত করাই তো বুদ্ধিমানের পরিকল্পনা। ইংরাজিকে সহজ করে দেবার জন্য বার্নার্ড শ তাঁর জীবনের অর্জিত সমস্ত সম্পত্তি দান করে গেছেন। আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে সহজ করার কথা ভাববো না কেন? বুদ্ধদেব তাঁর লোকপ্রিয়তার বলে সংস্কৃত ছেড়ে পালিকে বরণ করেছিলেন। আজ শতকরা দশজন শিক্ষিতের কথা না ভেবে শতকরা একশতের জন্য ভাবলে বাংলা ভাষাকেও তেমনি সহজ করে নিতেই হবে। অঙ্কের হিসাবে দশগুণ সহজ, আর তা হতে পারে বানানের খামখেয়ালিপনার অবসান ঘটিয়ে। প্রস্তাবটা হয়তো বড়ই অর্বাচীনের মত হল। তবু একদিন এটা যে ঘটবে তাতে ভুল নাই, মনে করি।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | ফাল্গুন ১৩৫৯ | ৪র্থ সংখ্যা

আলোচনা

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাঁহাদের তদন্ত শেষ করিয়াছেন। এখন দক্ষিণ ভারতের উটকামন্দ সহরে বসিয়া তাঁহারা এই তদন্তের রিপোর্ট লিখিতেছেন। আমরা এই রিপোর্টের দিকে চাহিয়া আছি। অবশ্য শুধু মাধ্যমিক শিক্ষা সমস্যার সমাধান হইলেই চলিবে না। সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার ও নব ভারতের উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা, এই দুইটিই আজ সমভাবে প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকারের বাজেটে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ

বর্তমান বাজেটে শিক্ষার খাতে ব্যয় বরাদ্দ এবং শিক্ষার ব্যবস্থা ও অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইতে একটি জিনিস স্পষ্টই চোখে পড়ে, শিক্ষার জন্য এ পর্যন্ত যাহা করা হইয়াছে তাহা মোটেই যথেষ্ট নয়। এভাবে চলিলে প্ল্যানিং কমিশনের পরিকল্পিত দশ বৎসর কেন, পঞ্চাশ বৎসরেও নিরক্ষরতা দূর হইবে না। অনেকেই আশা করিয়াছিল, স্বাধীনতা লাভের পর দেশের অন্য সব ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনই দেশে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইবে। পাঁচ বৎসরে যুগান্তকারী কোন পরিবর্তন দূরের কথা, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না দেখিয়া লোকের মনে একটা নিরাশার ভাব জাগিয়াছে।

বর্তমান বাজেটের আলোচনার সময় কর্তৃপক্ষ দেখাইয়াছেন, আশানুযায়ী না হইলেও কোন কোন বিভাগে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের হার সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, উদ্বাস্তুদের জন্য জায়গায় জায়গায় স্কুল কলেজ খোলা হইয়াছে। অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার হইয়াছে এবং বয়স্কশিক্ষার জন্য প্রচেষ্টার হার বাড়িয়াছে। তবে ইহা সমুদ্রে বিন্দু পরিমাণ। আজ সমগ্র দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, প্রাপ্ত বয়স্কের হাতে ভোট দিবার ক্ষমতা আসিয়াছে, আজ এত অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া অসম্ভব। দেশের জনসাধারণের মধ্যে শুধু নিরক্ষরতা দূর করিলে চলিবে না, তাহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষিত করিয়া তুলিতে না পারিলে রিপাব্লিক ভারতের কল্যাণ কোথায়?

যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় শিক্ষাব্রতী

সম্প্রতি বিভিন্ন রাজ্যের কয়েকজন শিক্ষক ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিয়া আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। ভারতের পক্ষ হইতে গিয়াছেন বোম্বাইয়ের মডার্ণ স্কুলের প্রেসিডেন্ট মিঃ ডকিল, ইনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে পাশে সমাজসেবামূলক কার্যে যোগ দিয়াছিলেন। জনশিক্ষার প্রচেষ্টায় আমেরিকার অভিজ্ঞতার ফললাভ করা এবং সেখানকার পারিবারিক জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করা, এই দুটি উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

মিঃ ডকিল ক্যালিফোর্নিয়ার যে পরিবারে বাস করিতেন, তাহাদের সৌজন্য, আতিথেয়তা এবং অমায়িক ব্যবহারে পরম প্রীত হইয়াছেন। তিনি বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গিয়া আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি বলেন, এই পরিবারটির সহিত এই কয়মাস বসবাস করিয়া আমেরিকার জীবনযাত্রা ও শিক্ষারীতি সম্বন্ধে তিনি অনেক বেশি উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাদের শিক্ষা নিয়তই ইহাদিগকে জীবন সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া গড়িতেছে।

পাঠ্যবস্তু ও বন্ধু নির্বাচনে মার্কিন ছেলেমেয়েরা যে স্বাধীনতা পায়, তাহা প্রশংসনীয়। বিদেশী শিক্ষকগণ ১০০টি সভায় ১০ সহস্রাধিক শ্রোতার নিকট বক্তৃতা দেন—নিজের নিজের দেশের ও বর্তমান অভিজ্ঞতার কথা।

বর্তমান যুগে এ ধরণের আন্তর্জাতিক মেলা মেলার একান্ত প্রয়োজন—পরস্পরের ভালো মন্দ দুটি দিকই চোখে পড়িলে, আর নীর বাদ দিয়া ক্ষীরটুকু গ্রহণ করিতে পারিলে, সার্বজনীন মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন প্রচেষ্টা

ছাত্রেরা যাহাতে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগুলিতে ভাল ফল করিতে পারে তাহার জন্য গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ ক্লাস খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইসব প্রতিযোগিতার ফলাফলের তালিকায় বাঙালী ছেলেদের নাম কম দেখিয়া আমাদেরও মনে হইয়াছে, ক্রমেই যেন বাঙালী ছেলেরা পিছনে পড়িতেছে। যদি বলা যায়, ছাত্রেরা সরকারি চাকুরির মোহ বর্জন করিয়া অন্য ভাল ভাল কাজে চলিয়া যাইতেছে এবং তাহা একদিকে সুলক্ষণ, তবু বলিব, রাষ্ট্র পরিচালনার কাজেই বা আমাদের মনীষার নিয়োগ কেন করা হইবে না? আমাদের যেসব ভাল ছেলে ঐ পরীক্ষা দিতেছে, তাহারাই বা কেন উচ্চ স্থান পায় না? বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণভাবে এদিকে দৃষ্টি দেওয়া যে আবশ্যক সে বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়াছে, বিশেষ ক্লাস খুলিয়া বিশেষ চেষ্টা করাও দরকার নয় কি?

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় আর একটি কাজ করিয়াছেন, উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য একটি ইংরাজি শিক্ষার ক্লাস খুলিয়াছেন—এই ক্লাস কি রকম হইবে, কাহারা পড়াইবেন, তাহা সঠিক এখনও জানা যায় নাই। আমাদের মনে হয়, শুধু ইংরাজি কেন, অন্য বিষয়ের জন্যও শিক্ষকদের মাঝে মাঝে 'রিফ্রেসার কোর্স' থাকিলে শিক্ষক ছাত্র উভয়েরই কল্যাণ হইতে পারে।

শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্য

কলিকাতায় ইন্‌স্টিটিউট অফ্ ফিজিকাল কালচারের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯২৮ সনে অল্প কয়েকজন উৎসাহী শরীরতত্ত্ববিদ্ ও ব্যায়াম শিক্ষকের উৎসাহে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহারা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে যে স্মারক-পত্রিকা বাহির করিয়াছেন, তাহা আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু ও শ্রীযুক্ত জে কে সেন অন্যতম, ইহাদের উৎসাহ আজ পর্যন্ত অম্লান রহিয়াছে। আয়োজন, অনুষ্ঠান ও স্মারকপত্রে সর্বত্র তাহার পরিচয়।

এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতার তথা বাঙলা দেশের এক মহা উপকার সাধন করিয়া আসিতেছে। শিক্ষার্থীর শরীর চর্চা ও স্বাস্থ্যশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের ছাত্রগণের ও শিক্ষকগণের যদি উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চা শিক্ষার কোন ডিপ্লোমা পরীক্ষা থাকে, তবে আগ্রহের জ্ঞানে দেশের তরুণ তরুণীরা স্বাস্থ্যের দিকে মন দিবে। মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদ এ বিষয়ে চেষ্টিত জানিয়া আশান্বিত বোধ করিতেছি।

বিদ্যালয়ে জল-খাবারের ব্যবস্থা

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের জলখাবারের পরিকল্পনা শীঘ্রই কার্যে পরিণত হইবে এরূপ শোনা যাইতেছে। এ বিষয়ে আমরা আগেও 'শিক্ষা'য় লিখিয়াছিলাম। অনেক স্কুলের কর্তৃপক্ষের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়াছে যে এ ব্যবস্থা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। মাথাপিছু অতি অল্প কিছু নিয়াও তাঁহারা বেশ ভাল টিফিন দিতে পারিয়াছেন।

শিক্ষক সম্মেলন ও প্রদর্শনী

গত ৭ই মার্চ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিউট হলে কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষকদের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সঙ্গে কর্পোরেশনের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলির হাতের কাজের একটি প্রদর্শনীও ছিল। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইসচ্যান্সেলার ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন। তাঁহার চিন্তাপূর্ণ অভিভাষণটির কিছুটা আমরা শিক্ষার পাঠকদের জন্য উদ্ধৃত করিলাম।

কলিকাতা কর্পোরেশনের চেষ্টায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত হওয়ায় কলিকাতার অনেক ছেলেমেয়ের প্রাথমিক পর্যন্ত শিক্ষালাভ সম্ভব হইতেছে। কিন্তু এই শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্য কি কোন চেষ্টা হইতেছে? ইস্কুলে যাওয়া আবশ্যিক হইলে বস্তীর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলির শারীরিক ও নৈতিক অবস্থার একটু পরিবর্তন হইত।

কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন

আগামী জুলাই মাসে কেম্ব্রিজে যে কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে তাহাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি থাকিবেন অধ্যাপক পি এন. ব্যানার্জি, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ এস. কে. মিত্র এবং এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিবেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভগিনী নিবেদিতা ও বুনিয়াদি শিক্ষা

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

রাম না হইতেই রামায়ণ—ইহা এদেশের রীতি; সুতরাং বুনিয়াদি শিক্ষার সূত্রপাত হওয়ার বহু পূর্বে যদি তাহার আদর্শের কথা বলি, তবে তাহা নিতান্তই উদ্ভট কল্পনা বলিয়া মনে হইবে না আশা করি।

বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে মহাত্মা গান্ধী অন্য কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে হাতের কাজের মাধ্যমের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। হাতের কাজকে মাধ্যমরূপে গ্রহণ করা, পুস্তকের স্থানে হাতের কাজকে চালানো কঠিন কথা, সন্দেহ নাই; তাই অত্যন্ত পক্ষে জনাব জাকির হোসেন বলিয়াছিলেন, হাতের মাধ্যম যদি না-ও সম্ভব হয়, তবে অন্তত

হাতের কাজ ও শিক্ষা, এই ভাবে গোড়া পত্তন করিতে হইবে। হাতের কাজ অভ্যাস হইলে তবে তাহা বাধ্যতামূলক গ্রহণ করা যাইতে পারে, নতুবা এখনকার মত শিক্ষার পুস্তকের প্রাধান্য থাকিয়াই যাইবে। "দাও মা সরস্বতী বিদ্যার ভার"—বিদ্যার ভারেরা এখন পুস্তক আসিয়া অধিকার করিয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী ছেলেরা কেন চরকা কাটিবে, তাহারা কি সূতা কাটিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবে? তাহারা কি তাঁতি হইবে, কামার হইবে, ছুতার হইবে? সমস্ত ঐরূপ অনর্থক নষ্ট না করিয়া তাহারা কেন বরং পড়াটাই তৈরি করুক না—এইভাবে আমরা এপর্যন্ত বুনিয়াদি শিক্ষাকেও কোনঠাসা করিয়া রাখিয়াছি!

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে ভগিনী নিবেদিতা এ দেশের শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হইবে তাহা আলোচনা ও অনুসন্ধান করিবার জন্য আমেরিকায় যান এবং একটি পুস্তিকায় তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি লিপিবদ্ধ করেন। শিক্ষায় হাতের কাজকে তিনি খুবই উচ্চ স্থান দিতেন এবং সাধারণ সাহিত্য শিক্ষার সঙ্গে হস্ত পরিচালনার শিক্ষাকে যুক্ত করিবার সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, It is not to be understood that these courses are added to the ordinary curriculum of arts with a view to fitting school-boys for manufacturing or business careers. Undoubtedly, if a boy on leaving school wishes to devote himself to commercial work of any kind, his initiation into it is made easy, by the fact that he is already accustomed to bringing his mind to bear on kindred problems, and calling up all his intellectual resources to aid in their solution. Undoubtedly this is the case. But the argument for the necessity of manual training does not rest on such observation as this. It rests entirely on the nature of the human nervous system, and on known facts regarding the correlation of brain-centres with the development of physical impression and expression. It is entirely from this point of view that we have a right to plead for its inclusion in the school-course. If it were only calculated to supply the factory and the ware-house with competent organisers and directors, the community might well insist on leaving to the mercantile classes, the responsibility of creating opportunities for a limited amount of such training. But those whose experience gives them a right to speak, will in every case maintain that, other things being equal, a boy who has had manual training is in all ways the intellectual superior of him who has not. He has freshness and vigour of thought, due to the fact that he knows how to observe, and is accustomed to think for himself. He has daring and originality of purpose. And above all, his character is based on the fundamental habit of adding deed to dream, act to thought, proof to inference.

ইস্কুলের ছেলেদের কলকারখানার কাজ করিবার বা ব্যবসা বাণিজ্যের পরিচালনায় উপযুক্ত করিবার জন্য সাহিত্যের সাধারণ পাঠক্রমের সঙ্গে এই সব পাঠবিধি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, একথা যেন কেহ এক মুহূর্তের জন্যও মনে না করেন। অবশ্য যদি কেহ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া কোনও প্রকার ব্যবসা বাণিজ্যে নিজেকে নিয়োজিত করিতে চায় তাহা হইলে তাহার পক্ষে উহাতে প্রবেশ করা সহজ হইবে, কারণ সে অনুরূপ সমস্যার ইতিপূর্বে নিজেকে

নিয়োজিত করিতে এবং তাহার সমস্তায় নিজের বুদ্ধি সামর্থ্য পুরাপুরি নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে অভ্যস্ত। নিঃসন্দেহ এইরূপই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু হাতের কাজ শিক্ষার আবশ্যকতার যুক্তি এইরূপ মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিষ্ঠিত নয়। মানুষের স্নায়বিক প্রণালীর প্রকৃতির উপর ইহা সর্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে এবং দৈহিক ভাবগ্রহণ ও তাহার প্রকাশের সঙ্গে মস্তিষ্ক-কেন্দ্রগুলির অন্যান্য প্রশ্ন বিষয়ে পরিজ্ঞাত তথ্যের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই আমরা স্থাপত্য বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে ইহা অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছি। শুধু কারখানা ও গুদাম ঘরের জন্য উপযুক্ত কর্তা ও পরিদর্শক সরবরাহ করার কথা হইলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উপর সমাজ এই দায়িত্ব ছাড়িয়া দিতে পারিত—এরূপ শিক্ষার জন্য খানিকটা সুযোগ ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করার দায়িত্ব। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে যাহাদের কথা বলিবার অধিকার আছে, তাহারা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই একথা বলিতে থাকিবে যে অন্য সকল বিষয় সমান থাকিলে দুইটি ছেলের মধ্যে যাহার হাতের কাজ শেখা আছে বুদ্ধির দিক দিয়া সেই শ্রেষ্ঠ। তাহার চিন্তার সজীবতা ও তেজ আছে। কারণ সে পর্যবেক্ষণ করিতে জানে এবং সে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অভ্যস্ত। তাহার সাহস আছে, স্বতন্ত্র উদ্যম আছে। সব চেয়ে বড় কথা, তাহার চরিত্রের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে এক মূলগত অভ্যাস দিয়া—সে অভ্যাস হইল কাজের সঙ্গে স্বপ্ন যোগ করার, কর্মের সঙ্গে চিন্তার, প্রয়াসের সঙ্গে অনুধ্যানের যোগ করার।

বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্যে আর একটি লাভের কথা হইতেছে এই যে, তাহাতে নাগরিকতা শিক্ষা দেয়। হাতের কাজ শিখিলে যে নাগরিকতার দিক দিয়াও লাভ হয়, সে কথার উপর ভগিনী নিবেদিতা জোর দিয়াছেন এবং সেই সম্পর্কে তিনি হার্ভার্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক উইলিয়ম জেমসের লেখা হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করেন। অধ্যাপক জেমসের কথা হইল এই—

The most colossal improvement which recent years have seen in secondary education lies in the introduction of the manual training schools; not because they will give us a people more handy and practical for domestic life and better skilled in trades, but because they will give us citizens with an entirely different intellectual fibre. Laboratory work and shop work engender a habit of observation, a knowledge of the difference between accuracy and vagueness, and an insight into nature's complexity and into the inadequacy of all verbal accounts of real phenomena, which once wrought into the mind, remain there as lifelong possessions. They confer precision... ...They give honesty.....They beget a habit of self-reliance.....They occupy the pupil in a way most congruous with the spontaneous interests of his age. They absorb him, and leave impressions durable and profound. Compared with the youth taught by these methods, one brought up exclusively on books carries through life a certain remoteness from reality; he stands, as it were, out of the pale, and feels that he stands so; and often suffers a kind of melancholy from which he might have been rescued by a more real education.

শিক্ষায় হাতের কাজের স্থান সম্পর্কে আর একটি কথা ভাবিবার আছে। বিদ্যালয়ের বাহিরে যে যান্ত্রিক ও শিল্পপ্রাণ সভ্যতা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত, বিদ্যালয়ের মধ্যে থাকিয়া তাহার মূলসূত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ইহা উপায়। হাতের কাজ হইতে

যান্ত্রিক সভ্যতা এক দিনে অগ্রসর হয় নাই। আমরা যান্ত্রিক সভ্যতাকে যদি হাতের কাজ হইতে বিযুক্ত করি তাহা হইলে মানবের মনের ও শিক্ষার মনোবিজ্ঞানের কোনও ওজন পাইব না। যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তির হাতের শিক্ষা পাওয়া চাই। আধুনিক জগতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছে, যন্ত্রবিজ্ঞানের গোড়ার কথা, যন্ত্রকে কাজে লাগানোর, এবং যন্ত্র ব্যবহারের বিষয়ও তাহার জানা চাই। জগৎ অগ্রসর হইয়াছে ও হইতেছে, বাষ্প ও বিদ্যুতের শক্তিকে কাজে লাগাইতে শিখিয়াছে; আমেরিকা ও অন্যান্য অগ্রসর দেশে যখন বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে এই যন্ত্র-বিদ্যাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে তখন তুলনায় ভারতবর্ষের বিদ্যালয়ের বাহিরে কল-কারখানা অনেক কম বলিয়া তো বিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষার কোঠায় তাহাদের স্থান করিয়া দেওয়া আরও দরকার। ছাত্রেরা যন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষালাভ করিলে তবেই না বর্তমান জগতে ভারতের জন্য একটা স্থান লাভ করিতে পারিবে।

কিন্তু তাহার পূর্বে যে বিদ্যা অধিগত করিতে হইবে তাহা হইল হাতের কাজের বিদ্যা। ইতিহাসের গৌরবপথ ধরিয়া শিক্ষাকে অগ্রসর হইতে হইবে; মধ্যযুগের বিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে বর্তমান যুগ অ-মূলক হইয়া থাকিবে। কিন্তু সেই মধ্য-যুগের নিদর্শন নাই বলিয়া আমেরিকার শিক্ষাকে নিবেদিতা দুর্বল আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যিনি শিক্ষাবিজ্ঞান ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন, যাহার বুদ্ধির চর্চা উদারক্ষেত্রে ব্যাপৃত, তিনি শিক্ষার দিক হইতে ইটের ভাঁটি, কুমোরের চাক, চরখা ও গ্রামের হাতের তাঁত, পশম তৈরির চরখা, রংয়ের সরঞ্জাম, গাছগাছড়া থেকে রং তৈরি করিবার পুরানো নিয়ম, বেত, বুড়ি বুনাইবার জন্য শুকনা তালপাতা প্রভৃতিকে ভারতবর্ষে কাজে লাগাইতে পারিবেন; আমেরিকার তাহা সম্ভব হইবে না। চারুকলা, সৌন্দর্যবোধ শিক্ষা দিতে হইবে? ছাঁনে মাটির ইতিহাস যাঁহারা জানেন, অথবা দিল্লী লাহোরে ইরানের গোড়াই মাটির সুন্দর রং ও নক্সা যাঁহারা স্মরণ করিবেন, তাঁহারা বিদ্যালয়ের কক্ষে চুল্লী কাদা ও চরখা রাখিয়া উহা শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করিতে অগ্রসর হইবেন।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষকের পক্ষে হাতের কাজ জানা—একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করি। নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, প্রথমে কোনও হস্তশিল্পী, যেমন ছুতার, আনিয়া ক্লাসের মধ্যে বসাইতে হইবে, হয়তো সর্বদাই এরূপ একজন লোককে ক্লাসের মধ্যে আনিয়া তাহার কাজ করাইতে হইবে। সে তাহার নিজের কাজ করিতে থাকিবে, সুনিপুণ শিক্ষক তাহাকে প্রশ্ন করিয়া, পরি-চালনা করিয়া তাহার কাজের সম্বন্ধে মন্তব্য ও ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদের সে কাজের তাৎপর্য বুঝাইবেন। সামান্য শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে—হয়তো সেই শিক্ষার্থীদের মধ্য হইতে জাতির নেতৃত্ব লইতে বহু লোক অগ্রসর হইবেন—এই দিক দিয়া ঐক্য ও যোগ সংস্থাপন করিলে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। ছুতার তাঁতি কুমোর এরা একদিক দিয়া শিক্ষাগুরু, অন্যদিক দিয়া সমাজের সেবা করিতেছে—তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়া ছাত্রেরা যে সমাজের সন্ধান পাইবে, যত্ন না করিলে সেই সমাজ ধরিয়া যাইবে, তাহার কোনও খোঁজখবরও কেহ পাইবে না।

শুধু শিল্প শেখা নয়, শুধু পরিশ্রমের কাজ করা নয়—মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের পক্ষেও এরূপ হাতের কাজের মূল্য যে কত বেশি তাহা নিবেদিতার ভাষায় বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না —The object of the training in India must lie in the intellectualising of the existing faculty; in the power given to estimate rightly and to direct wisely the ability we already have; in the opportunity which can only come through concrete labour and experience

to understand and contrast duly, the old civilisation and the new. If a boy could go through a whole course of this training, graduated, as has been suggested from the first moment of education, in his fifth or sixth year, to the very end, in an Engineering University, elaborately fitted up, I do not hesitate to say that he would understand the past and the future of India, and be in a position to become a statesman, and a leader of society, different in maturity and balance of knowledge, from any that we have yet seen.

মহাত্মা গান্ধী ভগিনী নিবেদিতার এই আদর্শকে রূপ দিয়াছেন, তাহাকে সংগঠিত করিয়াছেন, তাহাকে বিকশিত করিয়াছেন। হাতের কাজ যে শিক্ষার মাধ্যম হইতে পারে, ইহা এই আদর্শ বিকাশেরই ফল। এখন হইতে পনের বৎসর পরে ভারত এখন যেমন উচ্চ স্কুল ও কলেজে হাতের কাজ শিখাইবার জন্য উপায় খুঁজিতে পশ্চিমের দ্বারস্থ হইয়াছে, তেমনি শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে হাতের কাজ শিখাইবার উপায় খুঁজিবার জন্য পশ্চিমকে ভারতের দ্বারস্থ হইতে হইবে—Fifteen years hence the west would be seeking from India the means of giving manual training in the secondary stage of education, as India is now seeking from the west, the knowledge of how to give it in high school and college.—নিবেদিতার এই অকুণ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী কি মহাত্মাজীর ভারতে আগমন ও পরবর্তী কালে বুনিয়াদি শিক্ষার পরিকল্পনা সূচিত করিয়াছিল?

শিক্ষার সমস্যা

[ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন]

সম্প্রতি দেশনায়কদের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষক শ্রেণী। যে দেশে গাড়ী ঘোড়া চড়ার প্রলোভন দেখাইয়া লেখাপড়ায় উৎসাহ দেওয়া হয়, সে দেশে তিনটা পরীক্ষা পাশ করিয়াও যদি পোড়াপেটে দু'বেলা দু'মুঠা ভাত দেওয়ার সংস্থান না হয়, তবে শিক্ষা-পদ্ধতির ও শিক্ষক শ্রেণীর উপর বিতৃষ্ণা হওয়া তো স্বাভাবিক। কিন্তু যাহা স্বাভাবিক তাহাই যে সঙ্গত এমন কথা বোধ হয় কেহ জোর করিয়া বলিবেন না। জটিল প্রশ্নের সরল উত্তর সকল সময় নির্ভুল হয় না। কিন্তু সাধারণ লোকের বেশী ভাবিবার সময় নাই, ইচ্ছাও নাই। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের কথা তাঁহারা বিনা বিচারে মানিয়া লইতে অভ্যস্ত। সুতরাং দেশের দুর্গতির জন্য তাঁহারা শিক্ষকশ্রেণীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

সুশিক্ষার ফলে অর্থ লাভ হইতে পারে কিন্তু অর্থ লাভ যে সকল সময় হয় না, তাহার বহু দৃষ্টান্ত মহাভারতের যুগ হইতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাল পর্যন্ত পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার জন্য সেকালের শিক্ষকশ্রেণীকে কেহ দোষী করে নাই। তখন শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল চিত্তের উৎকর্ষসাধন, এখন বিত্ত উপার্জন; সুতরাং উপার্জনের অক্ষমতা যদি শিক্ষার অপরাধের ও শিক্ষকের অযোগ্যতার প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়, তবে বিস্ময়ের হেতু নাই। কেহ কেহ এমনি কথাও বলিয়াছেন যে, শিক্ষার প্রসারই

আমাদিগকে ভিক্ষার পথে আগাইয়া দিয়াছে। শিক্ষিতের সংখ্যা কমাইয়া দিলে কিন্তু অন্ন সমস্যার সমাধান হইবে না, তাহাতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা কমিতে পারে কিন্তু মোট বেকারের সংখ্যায় এতটুকু তারতম্য হইবে না। কেহ কেহ পরামর্শ দিতেছেন, কেতাবী শিক্ষাই সকল অনর্থের মূল, ইহার ফলে ছাত্রেরা স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা হারাইয়াছে, স্বাবলম্বনের প্রবৃত্তি হারাইয়াছে—অতএব কেতাবী শিক্ষা কমাইয়া শিল্প-বাণিজ্যের শিক্ষা দাও, সকল দুঃখ ঘুচিবে। কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের নিয়ম ও প্রণালী হাতে-কলমে শিখিয়াও যদি চাকুরি খুঁজিতে হয় তবে বেকারের ভিড়ে সে পথও অচিরে দুর্গম হইবে। শিল্পের ও বাণিজ্যের প্রসার না হইলে B. Sc. Tech. ও B. Com.-দিগের যে গতি হয় তাহা তো আমরা চক্ষের উপরই দেখিতেছি। এখন দেশের লোক চাহিতেছে অর্থকরী বিদ্যা। নিম্ন দেশে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতিতে কি বিশুদ্ধ বিদ্যানুশীলনের ব্যবস্থা আছে?

কর্তৃপক্ষের মনেও এই প্রশ্ন জাগিয়াছে। এই কয় বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। সেই কমিশন অসাধারণ তৎপরতার সহিত তাঁহাদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় নাই। তারপর বসিয়াছে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন। তাঁহাদের সিদ্ধান্তও অল্পদিনের মধ্যেই প্রকাশিত হইবে। হয়তো ইহার পর প্রাথমিক শিক্ষা কমিশনও নিযুক্ত হইবে। তবে কি বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা একেবারেই পৃথক? খণ্ড খণ্ড বিচার করিলে কি ইহার সমাধান হইবে? সমগ্র ভাবে কি এই সমস্যার বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই? সুবৃহৎ বটবৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখা-প্রশাখা যদি শুকাইতে আরম্ভ করে তবে তাহার মূলেই জল-সিঞ্চন করিতে হয়, আগায় জল ঢালিলে কোন ফল হয় না। শিক্ষার সমস্যা এক এবং অবিভাজ্য। ইংরাজ আমলে বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষার স্বার্থ পরস্পর বিরোধী বলিয়া প্রচার করা হইত; উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের প্রয়োজন হইলেই কর্তারা বলিতেন, দেশের বেশির ভাগ লোকই উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত, অতএব সাধারণের প্রদত্ত কর কোন বিশেষ শ্রেণীর অল্প কয়েক জন লোকের হিতের জন্য ব্যয় করা যায় না। পাঠশালার জন্য বেশি টাকা দিতে হইবে। অথচ উচ্চ শিক্ষার প্রসার না হইলে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য যোগ্য শিক্ষক পাওয়া সম্ভব নহে, এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে গলদ থাকিলে তাহার কুফল বিশ্ববিদ্যালয়েও ব্যাপ্ত হইবেই। একই সময়ে সমগ্র শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের ব্যবস্থা না হইলে উচ্চশিক্ষা অথবা নিম্নশিক্ষা, কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি করা সম্ভব হইবে না।

কিন্তু শিক্ষার সংস্কার ব্যয়সাপেক্ষ। সরকারি তহবিলে টাকার অভাব। দেশের সম্পদ বৃদ্ধি না হইলে শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে না। সম্পদ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন শিল্প বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার। এই বিজ্ঞানের যুগে বিজ্ঞান-কুশলী বিশেষজ্ঞ ব্যতীত শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি সম্ভব নহে। অতএব ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই পুরাতন জায়গায়ই ফিরিয়া আসিতেছি। সুদক্ষ বৈজ্ঞানিক, নিপুণ শিল্পী, ভাল কৃষক সেই দেশেই পাওয়া যায়, যেখানে সুশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দৈন্যের অজুহাতে শিক্ষার জন্য ব্যয়ে কার্পণ্য করিলে কখনও দৈন্য ঘুচিবে না। সুতরাং সর্বস্তরের শিক্ষার সুব্যবস্থার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেই হইবে। বাঁচিবার অন্য পথ নাই।

কিন্তু কেবল টাকা খরচ করিলেই কি ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়? টাকা থাকিলে বড় বড় বিদ্যালয় গৃহ, বড় বড় লাইব্রেরি ও লেবরেটরি

নির্মাণ করা যাইতে পারে। সর্বাপেক্ষা আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানী করা যাইতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক না পাইলে সেই সব সরঞ্জামের যোগ্য ব্যবহার হইবে না। সুবর্ণহেউলে প্রাণহীন বহুল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইবে মাত্র। তাহা হইতে জাতীয় জীবনে কোন প্রেরণা আসিবে না।

এদেশে এখন সুশিক্ষকের প্রাচুর্য নাই। কারণ বিদ্বান-বুদ্ধিমান লোকের অভাব নহে, অবস্থার বৈগুণ্য। এমন এক সময় ছিল যখন শিক্ষকেরা ঋষির সম্মান পাইতেন। তাঁহাদের দেশ রক্ষের ভার লইতেন দেশের রাজা, অথবা সম্পন্ন শ্রেণীর অভিজাতেরা। কিন্তু ক্ষমতার দম্ভে বা সম্পদের অহঙ্কারে তাঁহারা শিক্ষায়তনের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার দুঃসাহস করিতেন না। স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষার ক্ষেত্রে অনধিকার চর্চার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা হয়। শিক্ষকের মর্যাদার হানি হইলে, স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইলে, শিক্ষায়তনের সম্ভ্রম নষ্ট হইলে দেশের কল্যাণ হইবে না।

বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর অনেক দোষ, অনেক অনেক ত্রুটি আছে। পরীক্ষার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ এবং পাঠ্য পুস্তকের উপর একান্ত নির্ভরতা আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিকে অত্যন্ত পঙ্গু করিয়াছে। পরীক্ষার খাতিরে আমরা শরীর ও বুদ্ধি অপেক্ষা স্মৃতির অনুশীলন বেশি করিতেছি। পাঠ্য পুস্তকের উপর অযথা নির্ভর করিবার ফলে আমাদের চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় চেতনা হারাইয়াছে। আমাদের স্কুলে ও পাঠশালায় অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে Nature Study বা প্রকৃতির পাঠ অন্যতম। এই বিষয় প্রবর্তনের উদ্দেশ্যই ছিল যে ছোট ছোট ছেলেরা আপনাপন পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন হইবে। নিজের চক্ষে দেখিয়া নিজের কানে শুনিয়া তাহারা প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের সহিত সম্যক পরিচিত হইবে। কিন্তু আমাদের এমনই মন্দভাগ্য যে, প্রকৃতি পাঠের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট হইল। শিশুর পর্যবেক্ষণ-শক্তির চর্চা হইল না, কেবল পুথির ভার ও মুখস্থের দায় বাড়িয়া গেল। বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণের গাছপালা, ফুলফলের দিকে চাহিয়া দেখিবার সুযোগ সে পাইল না, পল্লীর পশুপাখীর সহিত তাহার পরিচয় হইল না। মন যখন তাহার জিজ্ঞাসায় একান্ত উন্মুখ, তখনই তাহার কৌতূহল চরিতার্থ হইবার অবকাশ পাইল না। সে বিদেশের গাছপালা পশুপাখীর অজ্ঞাত বিবরণ মুখস্থ করিতে শিখিল। এদেশে যথেষ্ট উপযুক্ত শিক্ষক থাকিলে এমনটা হইতে পারিত না। তাঁহারা ছাত্রকে লইয়া যাইতেন বিদ্যালয়গৃহের বাহিরে নীল আকাশের তলে, প্রকৃতির সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিতেন, শিশুর কৌতূহল চিরজাগ্রত রহিত, বয়সের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পাইত— পরীক্ষা পাশ করিবার পর তাহার মনে হইত না, আর কিছু দেখিবার নাই, আর কিছু শিখিবার নাই।

দেশে ভাল উকিল আছে, ডাক্তার আছে, ভাল শিক্ষকের এত অভাব কেন? কারণ অত্যন্ত সরল—সুশিক্ষিতের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের উদাসীন্য। শিক্ষক যে সামাজিক জীব, তাহারও যে অশন-বসনের প্রয়োজন আছে, পিতৃ-মাতৃ-কর্তব্যের আছে, তাহার ঘরেও যে ব্যাধি হইলে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার দরকার হয়, তাহা আমরা জানিয়াও জানি না। তাই বৃত্তি হিসাবে আজ শিক্ষকতার কোন আকর্ষণ নাই। ভাল ছাত্রদের দৃষ্টি সর্ব ভারতীয় চাকরিগুলির দিকে, যাহারা আর একটু উচ্চাভিলাষী তাহারা আইন ও চিকিৎসা ব্যবসায়ের পক্ষপাতী। অন্নের চিন্তা যাহাদের নাই তাহারা সোজাসুজি রাজনীতির পথে সর্বোচ্চ সম্মানের সন্ধানে বাহির হয়। যে মন্দভাগ্য সরকারি বা দপ্তরদারি অফিসেও স্থান পাইল না, সে-ই অগত্যা শিক্ষকতা গ্রহণ করে। সকল নিয়মেরই ব্যত্যয় আছে, তাই এখনও দরিদ্র শিক্ষক-

শ্রেণীর মধ্যে কিছু কিছু আদর্শবাদী পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পাই। ইঁহাদেরই নিষ্ঠা ও সেবার ফলে দেশ ও সমাজ এখনও খানিকটা টিকিয়া আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অবস্থা আমার মতে সকলের চেয়েও খারাপ। সাততলা বাড়ীর পরিকল্পনার ও নির্মাণের ভার ভাল স্থপতির উপরই দেওয়া হয়, যেমন তেমন মিস্ত্রীর হাতে সে দায়িত্ব কেহই দিতে ভরসা করেন না। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের ধারণা যে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্বান অধ্যাপকের প্রয়োজন থাকিলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ যেমন তেমন লোক দিয়াই চলে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বেতনের হারও এই ধারণা অনুসারে নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহারা নিম্ন শিক্ষক। এই জাতিভেদের দেশে তাহারা একেবারেই অপাংক্তেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে কলেজের তো কথাই নাই, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা লাভের আশাও একেবারে সুদূরপরাহত। তাই শিক্ষকদিগের মধ্যে যাহারা উচ্চাভিলাষী তাহারা কখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করিবার কথা ভাবিতেও পারে না। অথচ ছোট ছোট ছেলেদের শিক্ষার জন্যই এমন লোকের দরকার, যিনি শাসনের ভয় না দেখাইয়া, পুথির সাহায্য না লইয়া, গল্পচ্ছলে ইতিহাস ভূগোল প্রাণিতত্ত্বের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সহিত তাহাদের পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন, পৃথিবীর সুসাহিত্যের রস শিশুদিগের প্রাণে পরিবেশন করিতে পারেন। অন্য দেশে এইরূপ সুধী ব্যক্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা গ্রহণ করিতে ইতস্তত করেন না, কিন্তু এদেশে কোন উচ্চাভিলাষী পণ্ডিত এরূপ দুঃসাহস করিবেন না। নিম্নশিক্ষার সংস্রবে একবার আসিলে তাঁহাকে চিরদিনের মত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিতে হইবে। যতদিন এই অবস্থার পরিবর্তন না হইবে ততদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সর্বোচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক পাওয়া কঠিন হইবে। শিক্ষককে যতদিন সমাজ সর্ববিষয়ে তাহার উপযুক্ত প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করিবে ততদিন কেবল উচ্চ আদর্শের কথা বলিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখা চলিবে না। এই সঙ্গে এ কথা বলাও প্রয়োজন মনে করি যে, কেবল বেতন বাড়াইয়া দিলেই শিক্ষকের গৌরব বাড়িবে না। শিক্ষককেও তাঁহার কর্তব্যের গুরুত্ব স্মরণ রাখিতে হইবে এবং জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দেশে যে সকল ব্যবস্থা আছে তাহার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের সুবিধার নিমিত্ত বিভিন্ন বিষয়ের অধ্যাপনার ব্যবস্থা প্রয়োজন। বড় বড় পাঠাগার হইতে তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় পুস্তক পড়িবার সুবিধা দেওয়া উচিত। বিজ্ঞানের শিক্ষকদিগকে অবসর সময়ে ভাল লেবরেটরিতে কাজ করিতে দিতে হইবে। ভাল শিক্ষক যদি স্বাধীনভাবে কাজ করিবার অধিকার পান, তবে লিখিত পরীক্ষার হাঙ্গামা আপনি আপনিই মিটিয়া যাইবে।

পরীক্ষা প্রথার দোষত্রুটি অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের পরিশ্রমের ফলাফল যদি পাঁচ দিনের উত্তর দিয়া বিচার হয় তবে অধীতব্য বিষয় বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া পরীক্ষার জন্য সম্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিবার ও করাইবার প্রবৃত্তিই বৃদ্ধি পাইবে। এই কার্যে প্রকৃত শিক্ষক কখনও উৎসাহ পাইবেন না। তিনি ছাত্রের বিদ্যা বুদ্ধির যতটা জানেন অন্য কাহারও পক্ষে কোন উপায়েই ততটা জানা সম্ভব নহে। সুতরাং নির্দিষ্ট সময়ে লিখিত পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি শিক্ষককে ছাত্রের সম্বৎসরের কাজ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে বলা হয়, তাহা হইলে ছাত্রেরা তো আর এখনকার মত না বুঝিয়া পুথির কথা আওড়াইতে চাহিবে না। কিন্তু শিক্ষকদিগের প্রতি আমাদের আস্থা নাই, তাই বর্তমান পরীক্ষা প্রথার কোন সংস্কারই সম্ভব হয় না। অথচ আমরা একবারও ভাবিয়া দেখি না

যে আত্মার অযোগ্য লোকের দ্বারা শিক্ষকের কঠিন কর্তব্য কেন, কোন কর্তব্যই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে।

শিক্ষকের কার্য নানা কারণে ক্রমশই কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে। ছাত্রকে প্রকৃত মানুষ করাই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তবে প্রতিবেশ ও প্রভাব সম্বন্ধে উদাসীন হইলে চলিবে না। অনেকেই অভিযোগ করিয়া থাকেন যে আমাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও বসনভূষণের ব্যয় বাড়িয়াই চলিতেছে, নানাবিধ বিলাসিতার সম্ভার যোগাইতে দরিদ্র পিতার প্রাণ কণ্ঠাগত হইতেছে। শিক্ষার উপকরণের খরচও নিতান্ত কম নহে। দরিদ্র শিক্ষার্থীর বিদ্যার্জনের পথ ক্রমশই অধিকতর সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ধনীদের ঘরেই বুদ্ধিমানের জন্ম হয় না। দরিদ্রের সংখ্যা বেশি, সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে দরিদ্রের ঘরেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। ইহাদিগের ব্যক্তিগত উন্নতির উপর দেশের ও সমাজের সমষ্টিগত উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। সুতরাং ইহাদের বিদ্যালাভের ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য। দুর্গত দেশের উন্নতি করিতে হইলে দরিদ্রের মানসিক সম্পদের অপচয় ঘটিতে দেওয়া যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অনায়াসে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যোগ্য বিদ্যার্থী নির্বাচন করিয়া দিতে পারেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত শিক্ষার ব্যয়ের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইবেন না। কিন্তু যাঁহারা দরিদ্র তাঁহাদের ব্যয় রাষ্ট্রকে বহন করিতে হইবে—দয়ার দান হিসাবে নহে, যোগ্যতার পুরস্কার হিসাবে, ভবিষ্যৎ সেবার প্রয়োজনে। এইভাবে যদি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শক্তি ও রুচি অনুসারে যোগ্য ছাত্রের নির্বাচন হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অযোগ্য ছাত্রের ভিড় আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে দেশের সর্বত্র বিনা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নীতি হিসাবে রাষ্ট্র এই দায়িত্ব স্বীকার করিলেও কার্যত অচিরে ভবিষ্যতে যে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। অনেক তথাকথিত অনগ্রসর দেশেও সকল স্তরের সকল প্রকারের শিক্ষার সর্ববিধ ব্যয় রাষ্ট্র বহন করে। ভারতবর্ষে কবে এই ব্যবস্থা হইবে জানি না। যত দিন না হইবে ততদিন দরিদ্রের গৃহে বহু প্রতিভা সুযোগের অভাবে নষ্ট হইবে।

এই প্রসঙ্গে আর একটা প্রশ্ন মনে হইতেছে। সর্ববিধ সুযোগ সত্ত্বেও অনেক সময় দরিদ্র গৃহের সন্তানকে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই জীবিকার্জনের জন্য বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হয়; ইউরোপের বহু দেশে ইহাদের ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হয় না। কারণ অক্ষর পরিচয় থাকিলে সেখানে নিজের চেষ্টায় বিদ্যার্জন করা অসম্ভব নহে। ডিকেন্স কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন নাই; স্যার হিউবার্ট পেট্রি-ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ না করিয়াই বহু বিদ্যার পারদর্শী হইয়াছিলেন। ম্যাক্সিম গর্কী কেবল রুশ ভাষার সাহায্যে ইংরাজি, ফরাসী ও জার্মান সাহিত্যের রসাস্বাদন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বাংলা ভাষার সাহায্যে কি তাহা সম্ভব? বাঙ্গালা ভাষার সে সম্পদ কোথায়? সেই সম্পদ সৃষ্টির দায়িত্ব অবশ্য একা শিক্ষকের নহে, তবে এ দিকেও যে তাঁহার দায়িত্ব আছে সে কথা একেবারে ভুলিলে চলিবে না। অনেক বাঙ্গালী শিক্ষক মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহারা এই দিকে দৃষ্টি দিলে সাহিত্যের সম্পদ, এবং অশিক্ষিত তরুণদিগের জ্ঞানোপার্জনের সুবিধা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষা সম্বন্ধে গুটিকয়েক সমস্যার আলোচনা করিলাম। আমার জীবনের দীর্ঘকাল শিক্ষাকার্যেই অতিবাহিত হইয়াছে। স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্র দেখিয়াছি যাহারা শিক্ষাব্রতী তাহাদের

অভিমত অপেক্ষা সাধারণত অব্যবসায়ী ব্যক্তিদের অভিমতের মূল্য বেশি হইয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রম না আছে এমন নহে, কিন্তু ইহাই সাধারণ নিয়ম। কবে ইহার পরিবর্তন হইবে জানিনা। তবে এই জীবনসন্ধ্যায় মনে হইতেছে যে স্বাধীন হইবার পরও শিক্ষাব্রতীর পথ নিষ্কণ্টক তো হয়ই নাই, বরং নূতন নূতন বাধার সৃষ্টি হইতেছে। আশা করি অনভিজ্ঞতা প্রসূত এই সকল বাধা অচিরে দূর হইবে। শিক্ষকের স্বাধীনতায় অথবা হস্তক্ষেপ করিলে দেশের উপকার হইবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি যদি বিদ্যার্থী আস্থা হারায়, তাহাতেও দেশের অকল্যাণ। এই অকল্যাণ যাহাতে না ঘটে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী সকলেরই কর্তব্য।

(কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষক-সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ)

কবিতা পাঠনায় অলঙ্কার ও প্রতিরূপ।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়]

মধুসূদনের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কবিতার দেহগঠনের যুগ গিয়েছে। মধুসূদন থেকেই কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হল। বাংলা কাব্যে তখনও কালিদাস মূর্ছিত। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, ও রবীন্দ্রোত্তর কবিরা বাংলা কবিতার প্রাণকে বিকাশের পথে নিয়ে চললেন; কাব্যে দৃষ্টি খুলল, কবি যোগী হলেন, ধ্যানী। শব্দালঙ্কার আর অর্থালঙ্কার নিজীব হয়ে চলল। মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ উভয়েই নিজ-নিজ যুগ সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রোত্তর কবিরাও। যতীন্দ্র বাগচী, যতীন সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথ বিশী, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্ত প্রভৃতি মিলে বিশেষ যুগ। কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, দেবেন্দ্র সেন, স্বভাব কবি গোবিন্দদাস, জসিমুদ্দীন, অনেকটা পুরোনো রীতিতে পদক্ষেপ করলেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এনেছেন। সত্যেন্দ্র দত্ত প্রধান হলেও, মোহিতলাল-নজরুল আর একটি পথ দেখালেন। এত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কারণ, বাংলা কবিতা এখন স্বাতন্ত্র্যবাদক। সুর আছে, ব্যক্তিসত্তা আছে। মধুসূদন থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী কালের কবিতা পড়তে আমাদের অলঙ্কারের দিকে সাবধান হতে হয়; কারণ প্রতিরূপ-প্রধান হয়ে পড়েছে এই সব কবিতা। কাব্যসত্তার সঙ্গে কবির ব্যক্তিসত্তা এ যুগে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রচনা করেছে। শিক্ষকেরও তাই কবি-মনোবৃত্তি অনুসারী হতে হয়। এইজন্যই লেখকের লেখার কালের মানসিক অবস্থা অনুধাবন করতে হয়।

লেখকদের লেখার সময়কার মনের অবস্থা লেখায় ছাপ রাখে, একথা আমরা জানি। ডিকেন্স এক সময় বলেছিলেন, লিখবার সময়, তাঁর সৃষ্ট-চরিত্রের কথা স্পষ্টভাবে শুনতে পেতেন। জার্মান কবি হাইনে বলতেন, শব্দের আকৃতিই তাঁকে শব্দ-ব্যবহারের প্রেরণা দিত। অথচ তাঁর কবিতার মূলধর্ম ছিল শব্দের শ্রবণ-বৈচিত্র্য। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, আসলে কবিতায় শ্রবণের আর দর্শনের প্রতিরূপ কোনটা সাপে-নেউলে নয়। মোহিতলালের ভাষায়, 'কানে জাগে রূপ, সুর বাজে চোখে।' কবি যখন লেখেন, তখন তাঁর মনের সমগ্র অনুভূতির একক রূপ নিয়েই তিনি প্রকাশ পান। কবির সেই রূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেই, অলঙ্কারের অন্তরঙ্গ রূপটি আমরা ছেলেদের মনে ঠিকমত পৌঁছে দিতে সক্ষম হব। প্রতিরূপের নানা বিভাগের মধ্যে কণ্ঠ্য-প্রতিরূপ (vocimotor

imagery) এই অলঙ্কার ক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকর। কবির প্রতীকতা উদ্দীপকের কাজ করবে, কাজ করবে পাঠকের অন্তর থেকে। অনেকে এই ধরণের স্মৃতি জাগানিয়াকে অলঙ্কারের কায়িক দিক বলেছেন। কিন্তু এই প্রতিরূপ কখনও অন্তরে জমা থাকে না যে, আহ্বানমাত্র সে সেলাম করে হাজির হবে। অবস্থার সৃষ্টি হলে আপনা থেকে মন তাতে সাড়া দেবে। আবার, প্রক্ষোভ জাগাতে পারলেই তো প্রতিরূপ হয় না। এ বিষয়ে মনোবিদ্‌দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে পরিচয় রাখা ভালো। তবে এ কথা বলা দরকার যে, ছাত্রদের নিতান্ত গ্রহীতা মনে করা উচিত নয়; কোন্ প্রতিরূপ কোন অলঙ্কারের মারফৎ তাদের মনে জাগবে তা তারা নিজেরা মনের নির্বাচনী-ক্ষমতার উপর নির্ভর করে ঘটায়। কোনও পদ্ধতি ধরা বাঁধা করে বলে দেওয়া যায় না; শিক্ষার্থীর নিজের মনের উপরই শিক্ষা-গ্রহণ অনেকখানি নির্ভর করে। এইখানে আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্ এবং শিক্ষকের অনেকখানি কাজ করবার আছে। কবিতা-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের অন্তর্দর্শনের (introspection) যদি আমরা একটা পরিবেশ করি, এবং বহুদিন ধরে করি, তবে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকার মনের একটা হিসাব মিলবে। বিলাতের শিক্ষকেরা এসব কাজ করলেও তাঁদের নির্দেশ আমাদের দেশে চলে না। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষায় 'ধ্যানের অবসর' যেমন আমাদের দেশের শিক্ষার্থীর পক্ষে আবশ্যিক, তেমনি আমাদের দেশের স্বভাবত অন্তর্মুখী লোকের অন্তর্দর্শনের হিসাব অন্য দেশের থেকে পৃথক হতে বাধ্য।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকলেও, সাধারণ ছেলেদের ব্যক্তিক মানসিক দিক, কবিতার মধ্য দিয়ে জাগানোই ইস্কুলের কাজ। ভর হেনরী হ্যাভাও বলেন, শিল্প হচ্ছে প্রকৃতিরই রূপ—কিন্তু এ রূপ এক মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে দেখতে হয়; এই মানসিক অবস্থাই নিয়ন্ত্রণ করে শিল্পের উৎকর্ষ-অপকর্ষ গুণ-ভেদ। লেখকের সেই মানসিক অবস্থাকে প্রত্যক্ষ করানোই শিক্ষকের কাজ। কবির সহমর্মী করে তুলতে হবে ছাত্রদের চিত্ত। মনের সঙ্গে বস্তুর এক নবসম্বন্ধ স্থাপনাই সৌন্দর্যানুভূতি, সেই বিশেষ সম্বন্ধই তো গড়ে তুলতে হবে। কবিতা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ধ্বনির সহায়তায়। কিন্তু ধ্বনিবিন্যাসই তো কবিতা নয়; ধ্বনির অর্থবোধও নয়। ধ্বনিতরঙ্গ আর অর্থবোধের পরস্পর ক্রিয়ায় যে নবরূপ হয় তাই কবিতার প্রাণ। এই প্রাণ-পরিচয় ঘটাতে হলে ধ্বনিতরঙ্গ আর অর্থবোধ প্রাথমিক দরকার; প্রয়োজন সাধন হবে, যদি আমরা অলঙ্কার আর প্রতিরূপ সম্বন্ধে সতর্ক থাকি। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কিছুটা,

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে
হৃদয় নাচে রে।
শত বরণের ভাব উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ
আকুল পরাণে আকাশে চাহিয়া
উল্লাসে কারে যাচে রে।

এর মধ্যেকার রূপক-উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার ভেঙে দিলেও, ময়ূরের নৃত্যের ছবি না-জাগা পর্যন্ত কবিতার মর্ম উপলব্ধি করা যাবে না। ময়ূরের নৃত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ যোগ থাকা চাই-ই। অভিজ্ঞতা বা স্মৃত্যুপস্থাপন এক্ষেত্রে বড়। নৃত্যশীল ময়ূর আর কলাপ দর্শনের প্রতিরূপ জাগাল বটে, কিন্তু 'উল্লাস' কথাটার মধ্য দিয়ে কবি আনন্দের যে গভীরতা আর মুক্ততা বুঝিয়েছেন—তাকে বোঝানো যাবে কি করে? 'উল্লাস' কথায় বর্ণা-প্রতিরূপ আছে, প্রত্যাশা আছে, কিন্তু আরও আছে শব্দটির প্রতীকতা। উপরন্তু এর মধ্যে অনুপ্রাসের এক পল্লব-লীলা রয়ে গেছে—যাকে ঠিক প্রত্যক্ষ করা যায় না। অলঙ্কারকে এখানে বিশ্লেষণ করে

খেলে কবিতার মর্মগ্রহণে ব্যাঘাত ঘটে, আবেদন নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পড়াতে হলে বিশ্লেষণী পদ্ধতি ছাড়া উপায়ও নাই। এইজন্যেই, এই বয়সের কবিতা ইস্কুলের ছেলেদের মনের সীমায় পড়া উচিত নয়, অন্তত পাঠ্যতালিকায়। এক সময়ে, 'করণা তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারা' কবিতাটি নিয়ে হৈ-চৈ উঠেছিল—তার প্রধান কারণ কবিতাটি 'শেষের কবিতা' থেকে উদ্ধৃত ছিল। কিন্তু সে প্রতিবাদের কারণ ছিল অযথা। 'কারণ' নির্দেশ করা উচিত ছিল এই দিক দিয়ে।

শব্দালঙ্কার শুধু শব্দ নিয়ে খেলা আর কানের উপর প্রভাব খাটানো, একথা আমরা আগে বলেছি। ছেলেদের এই শব্দব্যবহারপদ্ধতির উপর বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে। অনুশীলন সাহায্যে তারা নিজেরাও এ বিষয়ে নূতন আলোক সম্পাত করতে পারে। শিক্ষকের গবেষণার মনোবৃত্তিও থাকা চাই। অভিচারনের (suggestion) সাহায্যে তাদের শব্দ-প্রতিরূপ গড়তে সাহায্য করা যায়। ছোটবেলা থেকেই তারা ছড়ার মধ্য দিয়ে, বুকুক-বাঁ-না-বুকুক, এই শব্দ-প্রতিরূপ গড়ে নেয়। মনের এবং কানের এই সম্পদের উপরই ভর করে শিক্ষক অগ্রসর হবেন। শব্দালঙ্কারে, সাধারণত কাব্যের উৎকর্ষ খুব বেশি খোলে না, কাজেই ও-বিষয়ে আমাদের দুর্ভাবনার অবসর নেই। বিশ্লেষণী পদ্ধতি এখানে কার্যকরী। কিন্তু পরবর্তী কালে, বড় কবির লেখায়,এই শব্দ-প্রতিরূপ যাতে স্বতই এসে যায়, তার জন্যে প্রথম থেকে চেষ্টা করা উচিত :

দুরন্ত নির্দয়ঘাতে ঝঞ্ঝা ঝরিয়া পড়ুক
প্রবল প্রচুর,
কিংবা, দক্ষিণের দ্বার গুরুতরে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি
বালকের চকল অঞ্চল ;

—প্রভৃতি কবিতায় পৃথক করে শব্দালঙ্কারে দৃষ্টি দেওয়ার অবসর থাকে না; শ্রবণ-প্রতিরূপ মন থেকে স্বতস্ফূর্ত ভাবে না জাগলে সমগ্র কবিতার সৌন্দর্য-উপলব্ধি হয় না।

অর্থালঙ্কারের বেলায়ও এমনি করেই অগ্রসর হতে হয়। অর্থালঙ্কারে দেখা যায়, তুলনামূলক অলঙ্কারই বেশি। উপমা, রূপক। উপমা-রূপকের বড় কাজ : এক বস্তুর গুণ অন্য বস্তুতে আরোপ, যেমন—মিষ্টি কথা, তিক্ত অভিজ্ঞতা; কোন সময় দুটো বস্তু একেবারে মিশ খায় না, যেমন জনারণ্য। সমাসোক্তিতে অচেতন পদার্থে মানুষের ধর্ম আরোপ। এগুলি অবশ্য মনের প্রতিভাসের (attitude) উপর অনেকখানি নির্ভর করে। কাজেই প্রথম থেকেই, আমাদের সেই প্রতিভাসের গঠনের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। প্রতিভাস অনুযায়ী পাঠক ও কবির চিত্তের প্রকার ভেদ আছে। এ বিষয়ে মনোবিদ্‌দের বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করা যাক বর্তমানে। উৎসাহী পাঠক তাঁদের কাছ থেকেই এ সব বিষয় জেনে নিন।

দ্বিতীয় কর্তব্য, শিক্ষার্থীদের মনকে এমনভাবে গড়তে হবে যাতে বস্তু-বিশ্বজগতের সঙ্গে তাদের মানসিক দূরত্ব (psychical distance) কমিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা জন্মে। মনোবিদেরা বলেন, ক্রীড়াধর্মী পাঠনায় (play way) এই কাজটি সফল হয়। মানসিক দূরত্বের জন্যেই আমাদের চিত্ত গ্রহণশীল হয়ে উঠতে পারে না। পদ্মার ভীষণতা দেখে যদি দূরেই থাকলাম, তবে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করা হয় না। সৌন্দর্যানুভূতি তখনই আসবে যখন বিষয়বস্তুটি সম্বন্ধে সম্যক পরিচয় জন্মাবে এবং প্রতি-নিয়ত পরিচয় ঘটবে। পরবর্তীকালের বিকাশমান এই চিত্তবৃত্তিটি সম্বন্ধে আমাদের মন সাগ্রহ রেখে অলঙ্কার প্রতিরূপ পাঠদান কার্যে অগ্রসর হতে হয়। বিশেষ করে কবিতা-পাঠনায়। অর্থালঙ্কার আর প্রতিরূপসমষ্টি কেবল অভিজ্ঞতা বা পূর্বলব্ধ স্মৃতির

উপর নির্ভর করেই শিক্ষা দেওয়া যায় না; এদের বড় গুণ সৃষ্টিধর্মী মনকে তৈরী করা। কবিতাপাঠনায় কাব্যবস্তু পড়ানই বড় কথা নয়, বিশেষ মানসিক ক্ষমতাকে সৃষ্টি করতে হয়, কবিতা-পাঠনা জ্ঞান-দান নয়।

ডক্টর রায় ৭+-১৪ বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের মানসিক প্রতিরূপ গঠন-প্রবণতা সম্বন্ধে গবেষণা করে দেখেছেন, এদের প্রতিরূপ-গঠন প্রবণতা এত স্পষ্ট যে, সময় সময় বিস্মিত হতে হয়। সময় সময় কবির প্রতিরূপের সঙ্গে তারা নিজেদের চিত্তের অভিক্ষেপ ঘটায়। এই অভিক্ষেপ আসে স্বতই। এই স্বতোৎসারিত অভিক্ষেপ সৃষ্টিশীল মনের পরিচয় দেয়। একটি ছেলের কথা জানি, পরীক্ষায় বসে সে শিক্ষকের বহু আগেকার ক্লাসের পড়ানো হুবহু শুনতে পেত। আর একজন বলেছিল, খুব বেশি মন দিলে সে চোখের সামনে অদৃশ্য বইয়ের সমস্ত লেখা ভাসতে দেখে, স্পষ্ট। মনের এই ধর্ম ছোটবেলা থেকেই লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষককে ছেলেদের এই ব্যক্তিগত মানসিক ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবেই।

শব্দ ব্যবহার—ঠিক ঠিক শব্দটির 'প্রাণ' সম্বন্ধে বোধ—এই দুটি দিকে অলঙ্কার পাঠনায় জোর পড়ে। ক্লাসের মধ্যেই, উপমাকে রূপক, রূপক-কে উপমা বা অন্য অলঙ্কারে পরিবর্তন করে অনুশীলনী-পাঠ অভ্যাস করানো উচিত। ছেলেদের-নিজেদের দিয়ে এই অলঙ্কার ব্যবহার ক্ষমতা অর্জন করানো উচিত। এতে ভালো করে লিখতে যেমন শিখবে, তেমনই বলতেও। আবার, নিজেরা ব্যবহার করতে পারলে অন্যের ব্যবহার দ্রুত অনুধাবনও করা যায়।

উপসংহারে বলব, ছেলেমেয়েদের বয়ঃক্রম অনুযায়ী, মানসিক ক্ষমতা লক্ষ্য করে, কবিতা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা দরকার। শব্দালঙ্কার আর অর্থালঙ্কারের প্রত্যক্ষ সহজ মূর্তিটি প্রথম দিকে পরিচয়ের পরিধিতে আনা প্রয়োজন; পরে, প্রতিরূপের সঙ্গে এই অলঙ্কার যখন মিশে যাবে, তখন অলঙ্কারকে আশ্রয় করে প্রতিরূপে অগ্রসর হতে হয়। ছড়া পড়াতে অলঙ্কার-বোধ জন্মানোর কোন প্রয়োজন দেখি না। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, তারা নিজেরা আবৃত্তি মারফৎ কণ্ঠ্য-প্রতিরূপ গড়ল কি না। সক্ষম না হলে, শিক্ষক ছড়ার গানের মধ্যে এই সব প্রবণের প্রতিরূপ গড়ে যাবেন। খেলা এবং সঙ্গীত এই দিক দিয়ে খুব প্রয়োজনীয়। পঞ্চম শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত—প্রথমে শব্দালঙ্কারের সহজ দিক, পরে অর্থালঙ্কারের স্বভাবোক্তি এবং উপমার উপস্থাপন ঘটান যেতে পারে; এই মানে কাব্যের বিষয়বস্তু সহজ হবে, বর্ণনাত্মক হবে; তা ছাড়া, শিক্ষকের কর্তব্য হবে, শব্দ সম্পদের দিকে লক্ষ্য রাখা, কবিতাকে গদ্যে রূপান্তরণ। নবম থেকে দশম মান পর্যন্ত ভাবময়ী এবং সহজ-চেতনার প্রতিরূপ-সমৃদ্ধ কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটান যায়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বেকার কবিদের রচনায় এমন কবিতাংশ বহু পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের সর্বশ্রেণীর কবিতাই অবশ্য আছে, তবে কবি নিজে সবসময় শিক্ষার দিক থেকে তো নির্বাচন করেন নি; এখানে মনোবিদ্‌দের সাহায্য নেওয়া ভালো। কালিদাস রায়, সুমুর মল্লিক, জসিমুদ্দীন, স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস, সুনির্মল বসু প্রভৃতি লেখকের বহু কবিতাই ইস্কুলের নীচের দিকে ব্যবহার করা যায়। বলা বাহুল্য, 'আধুনিক কবিদের' কবিতা ইস্কুলে পড়ানো বিপজ্জনক; যদিও এ যুগে সাহিত্যে শিশু-কিশোর প্রকৃতি নানাধরণের মধুচাও রচিত হচ্ছে, এ যুগের কবিদের ভালো কবিতা সাধারণত প্রতিরূপ-প্রধান, বাগবিস্তারে সুতীক্ষ্ণ।

এই সঙ্গে বলা আবশ্যক যে, কবিতা নির্বাচনের একটি দিক, অলঙ্কারের দিক, সম্বন্ধেই বলেছি। কবিতা-নির্বাচনে শিক্ষাবিজ্ঞানের আরও অনেক কথাই মান্য করতে হবে, সে বিষয় সুনিশ্চিত।

বরিদা খাদি গুরুকুল

[শ্রীবীরেন্দ্র মজুমদার]

মেদিনীপুর জেলার বরিদা গ্রামে আজ দু বছর ধরে খাদি গুরুকুল চলে আসছে। গত দুবছর আমি বাংলার জনগণকে এই বলে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে এই দুনিয়ায় আমাদের বাঁচার মত বেঁচে থাকতে হলে শোষণমুক্ত উৎপাদক শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বাস্তব পক্ষে আমাদের বিষমতাপূর্ণ ভারতীয় সমাজে বাবু এবং মজুর উভয় শ্রেণীই ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছে। মজুর শ্রেণী বাবুদের চাপে নিত্য নিষ্পিষ্ট হচ্ছে এবং বাবুশ্রেণী নিজেদের পঙ্গুতার জন্য শুকিয়ে মরছে।

এই ভীষণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মহাত্মা গান্ধী বর্তমান শোষণ ও শ্রেণী বৈষম্য-মূলক সর্বনাশা শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে এমন শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যাতে ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাল্যকাল থেকে উৎপাদক শ্রমে অভ্যস্ত হয়ে সম্মান এবং সততার সহিত জীবিকা অর্জনে সক্ষম হতে পারে।

বাংলা দেশে তাঁর এই শুভ পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্যই চরখা সংঘ বরিদা গ্রামে এই খাদি গুরুকুলের স্থাপনা করে এবং দুবছর চালায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দেখি বাংলার জনগণ গতানুগতিক রীতি অনুযায়ী তাঁদের সন্তানদের বিনাশ্রমে জীবিকা অর্জনের পুরানো শোষণ-কৌশল শিক্ষানীতির খপ্পরে দিতে আগ্রহশীল। আমাদের খাদি গুরুকুলে ছাত্র দেওয়া তাঁরা তেমন পছন্দ করেন না। সেই জন্য খাদি গুরুকুল বন্ধ করে দেওয়ার কথা ভাবছিলাম। কিন্তু এই দুবছরের মধ্যে ভারত এবং পৃথিবীর সর্বত্র যেন একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। ফলে আমাদের দেশের, বিশেষ করে মধ্যম শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক এবং অভিভাবকদের মধ্যে ভয়ের হতাশার ভাব দেখা যাচ্ছে। তারা নিরাশার সহিত দেখছে যে এখন শিক্ষাপ্রাপ্তির পর আর বিনা শ্রমে জীবিকা অর্জনের আশা কার্যকরী হয়ে উঠবে না। এদিকে শ্রম-অভ্যাস-বিহীন ভুল শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে হাতের শ্রমশক্তির বিকাশ হতে পারে না, সেদিকে শ্রমিক শ্রেণী ক্রমে এত সচেতন হয়ে উঠেছে যে আজ তাদের কাঁধে বসে বিনা শ্রমে জীবিকা অর্জনের আর সম্ভাবনাও থাকবে না। জনগণ ক্রমে শ্রম-বাদী সমাজ অর্থাৎ সর্বোদয় সমাজের আদর্শের দিকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হচ্ছে।

পরিস্থিতিতে এই প্রকার পরিবর্তন আসায় বাংলা দেশের বন্ধুগণ খাদি গুরুকুল চালিয়ে রাখার জন্য আগ্রহ দেখাচ্ছেন। সেই অনুসারে আমিও স্থির করেছি যে খাদি গুরুকুল পূর্ববৎ চালু থাকুক, এবং এবছর অন্তত ১৫ জন ছাত্র লওয়া হউক। শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভুল ধারণা থাকায় লোকে এ পর্যন্ত চরখা সংঘের এই প্রচেষ্টা থেকে বিশেষ লাভ করতে পারেনি। এখন এই পরিবর্তনীয় পরিস্থিতিতে আশা করি বাংলার জনগণ নিজেদের সন্তানসন্ততিদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে খাদি গুরুকুলের শিক্ষা থেকে লাভবান হতে বিরত থাকবেন না।

পাঠ্যক্রম ও নিয়মাবলী আদির জন্য বরিদা, পোঃ গড় হরিপুর, জেলা মেদিনীপুরে অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

শিক্ষা

ম ছি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | চৈত্র ১৩৫৯ | ৫ম সংখ্যা

আলোচনা

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন

বিগত ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এই সম্মেলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার নানা দিক লইয়া আলোচনা করেন। শিক্ষার মান উন্নত করা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য সুযোগ সুবিধার আলোচনা করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল।

মৌলানা আজাদ বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে আজকাল সর্বত্রই আলোচনা হয় ও সেই সব আলোচনার সুযুক্তিরও অভাব নাই। অনেকেই বলেন, ছাত্র সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু শিক্ষার উৎকর্ষ নষ্ট হইতেছে। উদ্দেশ্যহীনতার জন্য ও শৃঙ্খলাজ্ঞানের অভাবে আজ ছাত্রেরা দেশের বড় বড় সমস্যার সম্মুখে অসহায় ও অযোগ্য প্রতিপন্ন হইতেছে। এই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন নয় এবং ইহাদের সংশোধনের জন্য ১৯৪৮ সনে রাধাকৃষ্ণন কমিশন নিয়োগ করা হয়। ঐ কমিশন ভালভাবে সব দিক পরীক্ষা করিয়া দেশের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়া সুব্যবস্থার জন্য কয়েকটি উপায় সুপারিশ করেন। দেশের বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ সাধন এবং শিক্ষার মানের দিকে দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, এই তাঁহারা রায় দেন।

কমিশনের মতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির জন্যই স্নাতকরা রাষ্ট্রের কাজের উপযুক্ত হইতেছে না। প্রধানত "স্নাতক ডিগ্রি" সঙ্গে যোগশূন্য পাঠ্যক্রম এই অযোগ্যতার জন্য দায়ী। মৌলানা আজাদ বলেন যে, পুরাতন নিয়ম আর চলিবে না, নূতন বিধি রচনা করিতে হইবে, এবং সমাজের লক্ষ লক্ষ নরনারীর সুখ ও সমৃদ্ধি কায়েম করিবার জন্যই এই ভাঙাগড়ার দরকার। কাজেই জোর করিয়া বিক্ষোভমূলক কোন উপায় সমাজের বা শিক্ষাপদ্ধতির উপর চাপাইলে চলিবে না। আইন-সঙ্গতভাবে ও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের চলিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এ বিষয়ে অনেক কিছু করিবার আছে। দেশের কাছে নূতন

আদর্শ তুলিয়া ধরিতে ও দেশের তরুণ সম্প্রদায়কে সেই উচ্চ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে যে বিপুল শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনই হইবে যখন তাহার নিজের ভিতরে সংস্কার ও নব শক্তির সঞ্চার হইবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকিলে তবেই কল্যাণ, এই জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সমাজ ও রাষ্ট্র এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অনেকখানি প্রত্যাশা রাখে, কিন্তু সেই আশা যদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তবে সমাজ ও রাষ্ট্র অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র কোন প্রতিষ্ঠান নয়, সমাজেরই এক অঙ্গ, কাজেই ইহার ভালমন্দও সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত।

শিক্ষার একটি সন্তোষজনক মান স্থির করা এবং জ্ঞান ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে নিজের মর্যাদা সংরক্ষণ করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। স্বায়ত্ত-শাসনের নামে এই উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিরোধ করা ভারত সরকারের লক্ষ্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের দাবী রক্ষা করিতেছে কিনা, সরকারের তাহাই দেখা কর্তব্য।

শিক্ষামন্ত্রী আর একটি কথা বলিয়াছেন ; সর্বত্র সরকারি কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি চাওয়ার যে রেওয়াজ, তাহাতে অনেক মেধাবী ছাত্রের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোন বিশেষ বিষয়ের জন্য অবশ্য বিশেষজ্ঞ নিতেই হইবে, কিন্তু অন্যত্র যাহাতে ডিগ্রীর উপর অত্যধিক নজর না দেওয়া হয় এবং ঐ কাজের যোগ্যতাই বিচারের মাপকাঠি হয় সেজন্য নাকি সরকার এবার চেষ্টা করিবেন। ইহা আশার কথা। কাজের জন্য কিছু সাধারণ জ্ঞান অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু ব্যবহারিক জ্ঞান আরও বেশি প্রয়োজন। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কোনও মূল্যই নাই। বর্তমান ডিগ্রি পরীক্ষায় ব্যবহারিক শিক্ষা কতটুকুই বা হয়? অথচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাপের অভাবে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচিত হয় না। কাজের দিক হইতেও ক্ষতি। ছাত্র-ছাত্রীদেরও ব্যর্থতা বহন করিয়া বেড়াইতে হয়।

কায়িক শ্রমের প্রতি অবজ্ঞা দূর করিবার জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এমন একটি কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ দেশের সেবা করিতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় যদি কোন নির্দিষ্ট এলাকায় শিক্ষার সঙ্গে অন্যান্য দিকে উন্নয়ন সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তবে অচিরেই সুফল দেখা যাইতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একতরফা নিন্দা ও সমালোচনা সমর্থনযোগ্য নয়। একথা ভুলিলে চলিবে না যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে নূতন রাজনৈতিক চেতনা জাগাইয়া ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব ত্রুটির কথা বলা হয় তাহার অনেকখানির জন্য বর্তমান শাসন প্রণালী ও অর্থব্যবস্থাও দায়ী, সে কথাও ভুলিলে চলিবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বুনিয়াদী বিদ্যালয়

আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ মিঃ আর্থার ই. মর্গান ভারত সরকারের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিটির একজন সদস্য ছিলেন। আমেরিকায় ফিরিয়া গিয়া ইনি বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন। সম্প্রতি ইহার এক পুত্র ও পুত্রবধূ আমেরিকায় একটি ছোট বুনিয়াদী বিদ্যালয় খুলিয়াছেন।

সেবাগ্রাম হিন্দুস্থানী তালিমি সংঘের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুতী আশা আর্যনায়কমকে তিনি লিখিয়াছেন যে, অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ বিদ্যালয়ে একদল ছেলেমেয়ে ভর্তি হইয়াছে, তাঁহাদের নিজ সন্তান দুইটিও ঐ বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছে। আমেরিকার নানা জায়গা হইতে লোকে বুনিয়াদী

শিক্ষা সম্বন্ধে জানিতে চাহিয়া তাঁহাদের কাছে চিঠিপত্র লিখিতেছে।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির এখনও পরীক্ষাকাল চলিতেছে। দেশে বিদেশে এ বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা যত হইবে, পদ্ধতির উপযোগিতা ততই স্পষ্ট ধরা পড়িবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

হিন্দী অভিধান

কেন্দ্রীয় লোকসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারপ্রাপ্ত সহকারী শিক্ষাসচিব শ্রীমালবা জানান যে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের হিন্দী পরিভাষার একটি হিন্দী অভিধান এখন যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। তিনি আরও বলেন, উদ্ভিদ্ বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান ও গণিতের হাই স্কুল কাইন্যালের উপযোগী পরিভাষা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজ্যসরকারগুলিতে অনুমোদনের জন্য পাঠান হইয়াছে। ভারত রাষ্ট্রের সর্বত্র পরিভাষার একটি ঐক্যসাধনের জন্য এই প্রয়াস বাঞ্ছনীয়। ১৯৫০ সনে গভর্নমেণ্ট বিজ্ঞানের পরিভাষা-কমিটি ও কয়েকটি সাবকমিটি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারগুলিকে অনুরোধ করিয়াছেন তাঁহারা যেন ঐ পরিভাষা কমিটির সহযোগিতা করেন। যে সকল রাজ্যসরকার নিজস্ব পরিভাষা-কমিটি গঠন করিয়াছেন তাঁহারা যদি ফলাফল ও তাঁহাদের অনুমোদিত নির্দেশ কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠাইয়া দেন তবে সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যথাসম্ভব এক পরিভাষা গঠিত হইতে পারে।

ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা বিস্তার

ত্রিপুরার রাজ্যসরকার দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সম্প্রতি বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে তাঁহারা শিক্ষার পরিকল্পনা রচনা করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, বর্তমানে সরকারি বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সহ-অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীজানেন্দ্র দাসগুপ্তকে তিন বৎসরের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ডাঃ দাসগুপ্ত ইতিমধ্যেই আগরতলায় গিয়া কাজের ভার নিয়াছেন। আমরা আশা করি সুযোগ্য লোকের হাতে ত্রিপুরার শিক্ষাব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি সূচিত হইবে।

শিক্ষকদের সত্যাগ্রহ

চুঁচুড়া শিক্ষক সম্মেলনে দেখিলাম শিক্ষকমণ্ডলী তাঁহাদের আশা আকাঙ্ক্ষা অভাব অভিযোগ, নানারূপ সুবিধা অসুবিধার আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। অনেকগুলি বিষয়ে সরকারি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই অভিযোগগুলির সংশোধন না হইলে শিক্ষকগণ ধর্মঘট করিবেন।

উত্তর প্রদেশে দেখিতেছি, শিক্ষকগণ ধর্মঘট ইতিমধ্যেই সুরু করিয়াছেন। সেখানে বিক্ষোভ আন্দোলন বহু দূর পর্যন্ত গড়াইয়াছে। ইহাতে ছাত্রসমাজের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। আমরা পূর্বেও বলিয়াছি যে, শিক্ষকগণ সমাজেরই এক অঙ্গ, রাষ্ট্রের অন্য সকলের মত তাঁহাদেরও বাঁচিবার, খাটিবার অধিকার আছে; সুখ সমৃদ্ধি ভোগের আকাঙ্ক্ষা আর সকলেরই মত তাঁহাদেরও আছে। রাষ্ট্র যদি সেদিকে উদাসীন হন, সমাজ যদি সেদিকে নির্লিপ্ত হন, তবে শুধুই কি শিক্ষক সম্প্রদায়ের ক্ষতি, সমগ্র সমাজের কি ক্ষতি হইবে না? জাতির ভবিষ্যৎ মানব যাঁহাদের হাতে শিক্ষা লাভ করিতেছে, তাঁহারা বুভুক্ষু ও মর্যাদার অভাবে পীড়িত হইতে থাকিলে আমাদের শিক্ষা যে পঙ্গু হইয়া থাকিবে।

কিন্তু এই মর্যাদা শুধু বাহিরের জিনিস নয়, সমাজ যাহাকে মর্যাদা দিবে তাহাকে নিজেও সেই মর্যাদা অর্জন করিতে হইবে। শিক্ষকগণ সম্মিলিত ভাবে, অতি দৃঢ় যুক্তিতে ন্যায্য দাবী রাষ্ট্রের কাছে, সমাজের কাছে উপস্থিত করুন। তাহাতেই ফল ফলিবে। সত্যাগ্রহের মত অতি সূক্ষ্ম প্রহরণ সহজে প্রয়োগ না করাই ভাল। তাঁহাদের এই কাজে ছাত্র মহলে কিরূপ প্রভাব পড়িবে তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখা দরকার।

ভাষা ও অনুবাদ

(২)

শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য

শীতের প্রভাতে আপাদমস্তক আলোয়ান মুড়ি দিয়া আরাম কেদারায় বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতে করিতে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত পরীক্ষার উত্তর-পত্র সমূহ দেখিবার জন্য মনকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় স্রোতস্বিনী এক পাত্র চা হাতে করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, তোমার ভাষা ও অনুবাদঘটিত আলোচনা পড়িয়া মনে হইল, তুমি যেন কি একটা কথা বাদ দিয়া গিয়াছ।

আমি বলিলাম, আমিও ঠিক ওই কথা ভাবিতে ছিলাম, কি যেন একটা কথা বলা হয় নাই।

স্রোতস্বিনী কহিলেন, দেখ, সরল ভাষায় যাহাকে বলে 'এলেম' তা যে ব্যক্তির নেই, অথচ প্রাণে প্রচুর পরিমাণে রস আছে, সে ব্যক্তি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গুণী ওস্তাদ রাখিয়া, বহু মূল্যবান বাদ্যযন্ত্র কিনিয়া সঙ্গীত শিখিবার প্রচেষ্টা করিতে পারে বটে, কিন্তু শিখিতে পারে না। আবার দেখ, বিনা চেষ্টাতেই কেহ কেহ অপূর্ব সঙ্গীত গাহিতে পারে, সুর তাল লয় মাত্রা সব যেন অনায়াসেই তাহার কণ্ঠে ধরা দেয়। কেন বলিতে পার কি? প্রথম ব্যক্তিটির সঙ্গীতের কান নাই, দ্বিতীয় ব্যক্তিটির আছে। ভাষার উপর যখন কতকটা তাই নয় কি?

আমি বলিলাম, ঠিক বটে—এই কথাটাই বলা হয় নাই। ভাষার ধ্বনি বাছিবার মত কান না থাকিলে ভাল রচনা কাহারও হাত দিয়া বাহির হইতে পারে না। শব্দ চয়ন যেন ইট সংগ্রহ, ব্যাকরণ ও অলঙ্কার যেন মাল-মসলা। মাল-মসলা দিয়া ইট গাঁথিয়া যাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে দেওয়াল গড়িয়া তোলাই সার হইবে—হয়ত বা সাদাসিধা একটা কোঠাও বানাইতে পারি, কিন্তু নয়নাভিরাম হর্ম্য তাহাতে গড়িয়া তুলিতে পারিব না যদি না তাহার কলা কৌশল আমার জানা থাকে। ভাষার ধ্বনির কানই এই কলা-কৌশল।

রীতি বলিলেন, অর্থাৎ সহজাত প্রতিভা না থাকিলে তুমি বলিতে চাও কেহ সাহিত্য রচনা করিতে পারে না। কারণ তোমাদের বর্ণিত ধ্বনির কান তো কেহ নিজে সৃষ্টি করিতে পারে না, উহা ভগবানেরই দান।

সমীর বলিলেন—আর যদি তাহাই হয়, তবে ভাষা পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্রদের প্রতি উষ্মা প্রকাশের কোন অধিকারই তোমাদের নাই, কারণ সকল ছাত্রই কিছু সহজাত প্রতিভা বা তোমাদের ভাষায় "ভাষার কান" লইয়া জন্মে নাই।

আমি বলিলাম, তোমাদের কথা খানিকটা ঠিক, ভাষার ধ্বনি চিনিবার ও বুঝিবার জন্য সহজাত প্রতিভা চাই বই কি। কিন্তু সকলেই কিছু সঙ্গীতে অঘোর চক্রবর্তী বা বৈজু বাওরা হয় না আর সাহিত্যে কালিদাস, সেক্সপীয়র, বঙ্কিমচন্দ্র, বা রবীন্দ্রনাথ হয় না। তাঁহারা ভগবানের আশীর্বাদ লইয়া জন্মিয়াছিলেন। কিন্তু সকল লোকই চেষ্টা করিলে কিছু না কিছু সঙ্গীত শিখিতে পারে। কিছু না কিছু ভাল ধরের সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে। ভাষার ধ্বনি শুনিবার কান না লইয়া জন্মাইলেও আমরা কতক পরিমাণে কানকে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারি। আজকালকার শিক্ষায় সেই ভাষার ধ্বনি শুনিবার কানকে তৈয়ারী

করিয়া দেওয়া হইতেছে না বলিয়াই তাহার এত অধোগতি।

ব্যোম তাঁহার বিচিত্র গলাবন্ধের বোতাম আরও এক পেঁচ কসাইয়া বলিলেন, ঠিক বলিয়াছ। শব্দই ব্রহ্ম—শব্দের ভিতর দিয়া আমরা চরম অনুভূতিতে পৌঁছিতে পারি। আর আমরা সেই শব্দময়ী ভাষাকেই উপেক্ষা করিতেছি। ইহা কি কম আক্ষেপের কথা?

ক্ষিতি খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, তুমি শিক্ষার্থীদের এত চট্‌পট্‌ ব্রহ্মত্বে পৌঁছাইয়া দিতে চাও, ইহাই বা কি কম আক্ষেপের কথা? তোমার তত্ত্বকথা আপাতত রাখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, শিক্ষার্থী-দের এই ভাষার জ্ঞান কি করিয়া তৈয়ারী করা যাইতে পারে?

আমি কহিলাম—তাহাদের উত্তম উত্তম সাহিত্যের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া। আজ কালকার সাহিত্যচয়নের ধরাবাঁধা কয়েকটি গদ্যাংশ ও কবিতা বেত্রদণ্ড-অনুপান-যোগে পড়াইয়া যেমন তাহাদের সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা যায় না, তেমনি বাজার প্রচলিত অর্থপুস্তক, 'কুঞ্জিকা' (Key) পুস্তক, 'বাদামের খোলায় পাঠবস্তু (in a nutshell)' প্রভৃতি গলাধঃকরণ করিয়া যে বস্তু তাহারা উদ্গীরণ করে, তাহা হইতে তাহাদের কাছে মৌলিক কোন কিছু প্রত্যাশা করা যায় না। সাহিত্যের সহিত তাহাদের এমন ভাবে পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে যেন তাহার রস তাহারা আপনা হইতেই অনুভব করিতে সমর্থ হয়। আর রস অনুভব করিতে গেলে প্রথমে চাই তাহার ছন্দের প্রতি কাণ জন্মানো। "জল পড়ে পাতা নড়ে" শুনিয়া মনে আসিয়া ওঠে, কৃষ্ণচূড়ার গাছ হইতে বৃষ্টির ধারা লাল পাপড়ির সহিত মিশিয়া পড়িতেছে, গাছের তলায় ভাঙলার উপর লাল ফুলের ও লালের উকিঝুঁকি আভাযুক্ত কুঁড়ির এলোমেলো ভিড়ে স্তূপ, নারিকেল গাছগুলির মাথা ঝোলো হাওয়ায় দুলিতেছে, অশ্বত্থের পাতায় শুঁড় বহিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতেছে আর তালপাতার আড়ালে একটা ভিজে কাক থাকিয়া থাকিয়া কেঁ কেঁ করিয়া ডাকিতেছে। পশ্চিমের খোলা জানালাটা দিয়া অকারণ খানিকটা জলের ঝাপটা আসিয়া মেজেটা ভিজাইয়া দিল। এই যে ছবিটি মনের মধ্যে জাগিয়া ওঠে, তাহার অর্ধেক মূলে এই পংক্তিদুটির ছন্দ নয় কি? আমাদের বাল্যে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস অবশ্যপাঠ্য ছিল, অর্থ বুঝি না বুঝি, সরল ছন্দ ও শব্দের ঝঙ্কার কানে বড় মিঠা বাজিত, আধ-বোঝা আধ-না-বোঝা ছবিগুলি সেই ছন্দের ঝঙ্কারে সৃষ্ট হইয়া মনের মধ্যে স্বপ্নের রেশ জাগাইয়া তুলিত। ভাষার ধ্বনির জ্ঞান আমাদের এই ভাবে তৈয়ারী হইতে সুরু হইয়াছিল। সৌভাগ্যই হউক আর দুর্ভাগ্যই হউক, আমাদের সময়ে পরীক্ষা জটিলী উত্তীর্ণ হইবার এত প্রকার ভেলা প্রস্তুত হয় নাই, আর আধুনিকতার ছাপ দিয়া দুর্বোধ্য অবোধ্য বাতুলের প্রলাপ সাহিত্যে চালাইবার প্রচেষ্টাও হয় নাই। কাজেই অর্থ ভাল করিয়া না বুঝিলেও মূল সাহিত্যের সহিত আমাদের পরিচয় ঘটিয়াছিল আর তাহাতে একটা বড় লাভ এই হইয়াছিল যে, আমরা ভাষার ছন্দের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

ক্ষিতি কহিলেন, কিন্তু শিক্ষার্থীর তো সাহিত্য শুধু পড়িলেই হয়না, উহা কানে লাগিবার মত করিতে হইবে, মনে মনে পড়িলে তাহার কি ফল হইবে?

আমি কহিলাম, ঠিক কথা। সাহিত্য এমন ভাবে পড়িতে হইবে যেন তাহা কাণে বাজিতে থাকে, বেসুরো বেতালা হইলেই কান তাহা সহজে যেন ধরিয়া ফেলে, নহিলে তাহা পড়িয়া লাভ কি? আবৃত্তি ও অভিনয়ের মূল্য এইখানে। আরও এক কথা, শিক্ষক মহাশয়দের এই পাঠে এমন ভাবে

সাহায্য করিতে হইবে যেন সত্যই তাহারা সাহিত্যের রস উপলব্ধি করিতে পারে, ভাষার রহস্য তাহাদের কানে বাজিতে পারে। শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করিবে ইহা সত্য কথা, কিন্তু গ্রহণ করিবার যন্ত্রটিকে চালু করিবার ভার শিক্ষক মহাশয়ের। শিক্ষক মহাশয়ের সাহিত্যে যদি দরদ ও অনুরাগ থাকে, তবেই ইহা সম্ভব হইবে, নচেৎ নয়।

সমীর কহিল—আমার দুইটি কথার জবাব দাও দেখি! তোমার কথা শুনি যাহারা সাহিত্যকে শিক্ষার মূল বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যাহাদের তোমরা বলা কলাবিভাগের ছাত্র, তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু যাহারা বিজ্ঞানের সাধনা করিবে তাহাদের এত কাণ্ডে কি প্রয়োজন?

আমি কহিলাম—বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীরও তো মনের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, যে অবদান তাহার দিবার আছে, তাহার তাহা দিতে হইবে। কি করিয়া সে তাহা করিবে যদি ভাষায় দখল না থাকে? যদি সে নিজেকে অপরের নিকট বোধগম্যই করিতে না পারিল, তবে কৃপণের ধনের মত তাহার সঞ্চিত বিদ্যার কি সার্থকতা? বরং কৃপণের ধন-সঞ্চয় প্রবৃত্তির তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তবু বিদ্যাকে বাঙ্ময়ী করার কোন মানে হয় না, তাতে ক্ষতিই হয়। বিদ্যার বুদ্ধি আদান প্রদানে, সিন্দুকজাত করিয়া রাখিলে দেখিবে কোন দিন কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে। আর আদান প্রদান করিতে গেলে ভাষার প্রয়োজন সর্বাগ্রে। তাই বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরও ভাষায় দখল থাকা দরকার; ভাষায় দখল রাখিতে গেলে আবার ভাষার প্রতি অনুরাগ থাকা দরকার, কেননা, গায়ের জোরে কোন কিছু তুমি দখলে রাখিতে পার না, একমাত্র অনুরাগই তাহা পারে। ভাষার প্রতি অনুরাগ থাকিলে ভাষার ধ্বনি বুঝিবার মত কাণ আপনিই হইবে, একটু শুধু সাধনার দরকার।

সমীর কহিল—বুঝিলাম। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, সেদিনকার আলোচনা লইয়া। আমার যতদূর মনে আছে, সেদিন তোমরা শুধু ভাষাতত্ত্বের শ্রাদ্ধ কর নাই, অনুবাদ লইয়াও কিছু তর্ক করিয়াছিলে। এক ভাষায় উত্তম জ্ঞান থাকিলেই যে, সেই ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিতে অসাধারণ দক্ষতা জন্মিবে তাহার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

আমি কহিলাম, না নাই। তবে কথাটা কি জান—তোমার যদি নিজের ভাষায় সঙ্গীতে দক্ষতা থাকে, অন্য ভাষার সঙ্গীতের সুরের ব্যাকরণজ্ঞান না থাকিলেও তাহার মিষ্টত্ব ধরিতে তোমার কষ্ট হইবে না—আপনা হইতেই তাহা তোমার নিকট ধরা দিবে। ভাষাও তেমনি। এক ভাষার ধ্বনি কানে বাজিলে অন্য ভাষার ধ্বনি কানে বাজিতে দেরী হয় না। সেদিনও বোধ হয় বলিয়াছি এক ভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে অন্য ভাষা আয়ত্ত করা সমধিক সহজ হয়। কাজেই ভাষার কাণ তৈয়ারী হইলে অনুবাদও ভাল করা যায়। তাল কাটিয়া গেলে মন আপনিই পীড়া পাইবে যে। আরও এক কথা। ভাষার ধ্বনি বুঝিবার ক্ষমতা থাকিলে পদচয়নের ক্ষমতা বাড়ে, সমার্থ-বোধক অনেকগুলি শব্দ হইতে সুরের ব্যঞ্জনা যাহার বেশি তাহাকে চিনিবার শক্তি জন্মে। এটা বড় কম লাভ নয়।

ক্ষিতি খবরের কাগজ মুড়িয়া টেবিলের উপর রাখিয়া কহিলেন, তোমরা ভাষাতত্ত্ব লইয়া যেরূপ বচকচি আরম্ভ করিয়াছ, তাহাতে মনে হইতেছে তোমার দার্শনিক বন্ধু ঠিকই বলিয়াছিলেন, ভাষার সৃষ্টি হওয়াতেই যত কিছু ঝামেলা বাড়িয়াছে। তোমাদের কলরবে এমন সুন্দর প্রভাতটি মৃত্তিকার পরিণত হইতে পারে এমন আশঙ্কা হইতেছে। ওই দেখ, বড় সুন্দর রৌদ্র উঠিয়াছে, আইস, আপাততঃ আমরা মাঠে গিয়া মুক্ত বায়ু ও তাজা রৌদ্র উভয়ই সেবন করি। যোগ, তোমার গলাবন্ধটি খুলিয়া রাখিতে পার ঠাণ্ডা লাগিবার আর ভয় নাই।

বর্ণপরিচয় ও বিদ্যাসাগর মহাশয়

শ্রীজ্ঞানদাকান্ত মিশ্র

বর্তমান কালে যে সমস্ত শিশুপাঠ্য রচিত হইতেছে তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে কেবল ছড়া ও ছবি। একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে এই ছবি ও ছড়াগুলি শিশুমনের উপযুক্ত খোরাক, কিন্তু তাহা হইতে শিশু বিশেষ কোন উপদেশ পায় না। অবশ্য একথা কেহ কেহ বলিতে পারেন যে যাহাদের উপদেশ গ্রহণের বয়স হয় নাই তাহাদিগকে উপদেশ-জালে আক্রান্ত করিয়া ফেলিলে তাহাদের প্রতি অবিচার করা হয়। আমি তাঁহাদের সহিত একমত। কিন্তু পাঠ্যগুলির মধ্যে কিছু কিছু উপদেশ থাকিলে শিশু যদি তৎকালে না বুঝিয়াও মুখস্থ করিয়া রাখে সেইগুলি হইবে তাহার পরবর্তী কালের পাথেয়। ভবিষ্যতে যখন সেই কথাগুলি তাহার মনে পড়িবে সেইগুলি হইবে তাহার পথ-প্রদর্শক।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এই বিষয়ে আদর্শ পুস্তক। তিনি বানানগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া সেই শব্দগুলির এক একটি প্রয়োগে যে বাক্যগুলি সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেকটি অমূল্য উপদেশ এবং ভবিষ্যতের পাথেয়। রোগীর পক্ষে ঔষধ অরুচিকর হইলেও যেমন হিতকর, শিশুর দুর্বল মনের পক্ষে এই উপদেশ-গুলি একটু গুরুভার হইলেও পরিণামে সুখাবহ সন্দেহ নাই, "অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য পরিণামঃ সুখাবহঃ।"

বর্তমানে বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ সম্বন্ধে দুই চার কথা বলা যাক। আগামী বারে দ্বিতীয় ভাগ সম্বন্ধে বলা যাইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথম ভাগে শিশু বাক্যগঠন আয়ত্ত করিয়াই যখন পাঠে প্রথম বাক্য পড়িল "কখনও মিথ্যা কথা কহিও না। কাহারও সহিত ঝগড়া করিও না, কাহাকেও গালি দিও না। ঘরে গিয়া উৎপাত করিও না, রোদের সময় দৌড়াদৌড়ি করিও না।" শিশু এখানে অত্যন্ত সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে কতকগুলি বাক্য শিখিল, যাহাদের উপদেশ অমূল্য। মিছা কথা বলিতে, গালি দিতে, উৎপাত করিতে, রোদে দৌড়াদৌড়ি করিতে শিশুকে নিষেধ করা হইল। এইগুলির মধ্যে বুঝিতে না পারার কিছুই নাই। এই উপদেশগুলির ফল শিশু এখন বুঝিতে না পারিলেও পরে বুঝিবে, "মিছা কথা" মানুষকে অসৎ করিয়া তোলে, ঝগড়া করিলে মনের শান্তি নষ্ট হয় এবং শত্রুতার সৃষ্টি হয়, গালি দিলে গালি শুনিতে হয় এবং শ্লীলতার হানি হয়। উৎপাত করিলে অপরের কার্যে বাধা হয় এবং রৌদ্রে দৌড়াদৌড়ি করিলে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে।

অবশ্য কোন কোন শিক্ষাবিদ্ একথা বলিতে পারেন যে মিছা কথা বলা, গালি দেওয়া প্রভৃতি অপরাধের সহিত শিশুর পরিচয় করাইয়া দিয়া এই সকল অপরাধের প্রতি শিশুর মন আকৃষ্ট করা হইল। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে এই সকল বিষয় যে-কোন সমাজের শিশুর পক্ষে অতি স্বাভাবিক পরিবেশ। কোন সমাজবিশেষের শিশু এই সকল অপরাধের সংস্পর্শে বিলম্বে আসে বা মোটেই আসে না, এই কথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

ত্রয়োদশ পাঠে দেখিতে পাই "আর রাত্রি নাই, ভোর হইয়াছে, আর আমি শুইয়া থাকিব না। উঠিয়া মুখ ধুই, মুখ ধুইয়া কাপড় পরি, কাপড় পরিয়া পড়িতে বসি।" ভোর হইয়া গেলে যে আর শুইয়া থাকিতে নাই, শয্যা ত্যাগ করিয়া যে

মুখ ধুইতে হইবে—যাহা স্বাস্থ্যরক্ষার অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম এবং তাহার পরেই যে শিশুর পক্ষে কাপড় পরিয়া পড়িতে বসা একান্ত কর্তব্য, আজ হইতে শিশুকে এ বিষয়ে সচেতন করা হইল।

তাহার পরে রহিয়াছে, "ভাল করিয়া না পড়িলে পড়া বলিতে পারিব না, পড়া বলিতে না পারিলে গুরু মহাশয় রাগ করিবেন, নূতন পড়া দিবেন না।"

ভালো ভাবে পড়াশোনা করার দিকে শিশুর মন আকৃষ্ট করা হইতেছে। ভালো করিয়া না পড়িলে তাহার পরিণাম কি তাহা শিশুর চিন্তা-শক্তির নাগালের বাহিরে। সে শুধু জানে গুরু মহাশয় রাগ করিবেন, নূতন পড়া দিবেন না। গুরু মহাশয়ের রাগ সে যে দেখিতে পায়ে না। ভালো ভাবে না বলিলে গুরু মহাশয় অসন্তুষ্ট হইবেন, গুরুজনের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করিলে সে যে নিজে অসন্তোষ লাভ করিবে। "নূতন পড়া দিবেন না।" এই কথাটির মধ্য দিয়া শিশু যে কতখানি ব্যথা প্রকাশ করিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিশু বুঝিয়াছে নূতন পড়া না পাইলে তাহার আত্মসম্মান বাঁচিবে না। অন্য শিশুর সমক্ষে সে নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হইবে এবং তাহার প্রতি গুরু-মহাশয়ের বিরক্তি প্রমাণিত হইবে। এইরূপে শিশুমনে গভীর আত্মমর্যাদা বোধ এবং গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগাইয়া তোলা হইল। আবার এই কথাগুলি কেবল উপদেশের বুলি না হইয়া শিশুমুখ দিয়া বলানো হওয়ায় পাঠার্থীর সম্মুখে একটি কচি শিশুর মুখ ভাসিয়া উঠিল। এই শিশুর কথা হইল তাহার নিজেরই কথা এবং পাঠটির উপজীব্য ভাব কয়টি হইয়া গেল তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব।

চতুর্দশ পাঠে লেখক একটি ছোট গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। শিশু এ যাবৎ যে বানান-গুলি শিখিয়াছে, যে ধরণের শব্দগুলির সহিত সে পরিচিত, অনুরূপ শব্দসমূহ লইয়া এই গল্প রচিত। যে বয়সের শিশু সাধারণত এই পাঠ পড়িবে গল্পের নায়ক হইয়াছে সেই বয়সের একটি শিশু।

"তাহাদের দুইজনের (কানাই ও বলাই) এত ভাব যে কেহ কাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারে না।" শিশুমনে ভ্রাতৃপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিবার পক্ষে কথাটি যথেষ্ট নয় কি ?

আবার স্বার্থপরতা শিশুর একটি সহজাত বৃত্তি, সে যাহা দেখে তাহা লইতে চায়—বিশেষ করিয়া খাদ্যদ্রব্য। আট বৎসরের বালক কানাই পিতার নিকট একটি পেয়ারা পাইয়া বলাইকে দিবার জন্য তাহাকে "খুঁজিয়া বেড়াইল, অনেকবার চেঁচাইয়া ডাকিল.....ফলটি আপন জামার পকেটে রাখিয়া দিল, তখন সে খাইল না, বৈকাল বেলা তাইকে দেখিয়া তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া কহিল...দেখ, বাবা আমাকে কেমন একটি বড় পেয়ারা দিয়াছেন, ...এই ধর, তুমি আধখানি খাও।"

বলাই মামার বাড়ী গিয়াছিল, সে পেয়ারা দেখে নাই, তাহাকে না দিয়া কানাই অবাধে খাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু কানাইয়ের হৃদয়ে যে ভ্রাতৃপ্রেম প্রবল, ইহা সে রায় লক্ষণের দেশ, লেখক সেই দেশেরই মাটির মানুষ। আজ শিশু-হৃদয়ে ভ্রাতৃপ্রেমের বীজ অঙ্কুরিত করিলে তবে তো পরে তাহারাই হইবে রাম লক্ষ্মণ। আবার লেখক সঙ্গে সঙ্গেই কানাইকে ভ্রাতৃপ্রেমের পুরস্কার দিয়া বুঝাইয়া দিলেন সে একটি সৎকার্য করিয়াছে। এই কার্যের দ্বারা সে তাহার পিতাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, ফলে লাভ করিল পিতার স্নেহ চুম্বন। শিশু শিখিল ভাই ভাইকে ভালবাসিলে বিনিময়ে লাভ করে মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের স্নেহ ও আশীর্বাদ।

পঞ্চদশ পাঠে ছন্দের সহিত শিশুর প্রথম পরিচয়। সাবলীল ধ্বনি ছন্দের মাধ্যমে শিশু শিখিল তাহার অন্যতম কার্য পাঠে মনোযোগ দেওয়া। প্রাতঃকাল হইলেই শয্যাত্যাগ করিয়া তাহাকে

পড়াশোনায় মন দিতে হইবে। সমস্ত দেহ মন দিয়া গুরুজনের সেবা করিতে হইবে, কখনও কাহারও সহিত কলহ করা উচিত হইবে না। শিশু যে কথাগুলি বিক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে শিখিয়াছিল তাহার পুনরাবৃত্তি হইল ছন্দের মধ্য দিয়া। ছন্দোবদ্ধ কথা ও ভাবগুলি স্মরণ রাখিতে সাহায্য করার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

বর্ণপরিচয়ের সহিত ভবিষ্যতের পাথেয়রূপ অমূল্য উপদেশাবলী আজিকার বর্ণপরিচয়ে কোথায় পাওয়া যাইবে?

রাষ্ট্র ও শিক্ষা

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার

রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থা অপরিহার্য। প্রত্যেক সভ্য দেশেই শিক্ষার ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহাতে ইউনিয়নের সরকারও দেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যার গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং বিশেষ আন্তরিকতার সহিত তাহার সমাধানে সচেষ্ট আছেন। তথাপি শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা আমরা সর্বদাই পত্রে পত্রিকাতে দেখিতে পাই। কিন্তু এ বিষয়ে সকল লেখকের মতামত একরূপ নয়, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ভিন্ন। ২৬ বৎসর বিহারে শিক্ষকতা কালে আমি যে সকল সমস্যা অনুভব করিয়াছি তাহা এবং তৎসমাধানের উপায় সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যদিও আমার অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র বিহার, তথাপি আমার বিশ্বাস যে বঙ্গদেশের সমস্যাও ইহার অনুরূপ।

শিক্ষার উদ্দেশ্য ভাল নাগরিক হওয়া এবং নানা ক্ষেত্রে সমাজের সেবা করিবার যোগ্যতা লাভ করা। প্রাকৃতিক ও খনিজ পদার্থাদির ন্যায় দেশের জনগণও রাষ্ট্রের সম্পত্তিরূপে গণ্য হওয়া উচিত। দেশের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তি, কার্যকুশলতা, চরিত্র—এগুলি রাষ্ট্রের প্রধান সম্পত্তি। এই কাঁচা মালগুলি তৈয়ার করাইয়া রাষ্ট্রের উপযোগী করিয়া তোলা রাষ্ট্রীয় সরকারেরই দায়িত্ব। কোন্ কাঁচামাল কোন্ জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হওয়া উচিত, তাহা রাষ্ট্রই নির্ণয় করিবে, পিতামাতা নহে। কিন্তু আসলে দেখিতে পাই যে পিতামাতার বা অভিভাবকের আগ্রহই সমস্ত শিক্ষার মূল ভিত্তি হইয়া আছে। আজ যদি এই আগ্রহ লুপ্ত হয় তো কালই বিদ্যালয়গুলি ভূমিসাৎ হইবে। অভিভাবকদের ইচ্ছা ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, রাষ্ট্রের বৃহত্তর স্বার্থ তাহা হইতে অনেক সময় ভিন্ন। পিতামাতা যদি চাহিতেন যে সন্তানেরা যথার্থ পণ্ডিত, বীর, কষ্টসহিষ্ণু ও সচ্চরিত্র হয় অথবা তাহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ বা ধনবৃদ্ধি হয়, তবে কোন কথা ছিল না। কিন্তু কোন রকমে পরীক্ষায় পাস করানোই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণ উদ্দেশ্য—ছেলের সম্বন্ধে, চাকুরী বা ভদ্রবৃত্তি, যাহাতে 'বেশ দু পয়সা' আসে, এবং মেয়ের সম্বন্ধে উত্তম ঘরে ও বরে বিবাহ। পিতার 'ভদ্রবৃত্তি' অর্থাৎ কোন দেখার কাজ ছিল বলিয়া ছেলে শ্রমজীবী হইতে পারিবে না এমন নিষেধ থাকা উচিত নয়। অনেক শ্রমিকের পুত্র নিজগুণে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণীতে

প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং যদি ইহার বিপরীত ধারা রাখা না যায় তো শীঘ্রই শিক্ষা বিস্তারের ফলে সকলেই শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িবে। রাষ্ট্রের পক্ষে দৈহিক পরিশ্রমে অভ্যস্ত লোকের যত প্রয়োজন বুদ্ধিজীবী লোকের তত নহে, যদিও সকলের পক্ষে উভয় শিক্ষাই কিছু পরিমাণে লাভ করা উচিত। সুতরাং কোন্ বালক কোন্ বৃত্তির অধিকারী, তাহার নির্ণয় বালক বা তাহার পিতামাতার উপর ছাড়িয়া না দিয়া রাষ্ট্রের স্বয়ং গ্রহণ করা উচিত।

প্রত্যেক ছাত্রের শিক্ষাব্যবস্থা অভিভাবক-নিরপেক্ষ করিতে হইলে সমস্ত শিক্ষা-সংস্থান অবৈতনিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করা প্রয়োজন। বিহারে এখন প্রাইমারী অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণী (বঙ্গদেশের চতুর্থ শ্রেণী) পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাতে ছেলেমেয়েরা যাহাতে পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত কিছু শারীরিক শ্রমও শিখে সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি গিয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য ছাত্রদিগকে শ্রমের মর্যাদা শিখানো এবং প্রাইমারী স্কুলগুলিকে অংশত স্বাবলম্বী করা। আমরা এরূপ বলি না যে কৃষকের ছেলে পিতার নিকট যেরূপ চাষ বাস শিখিতে পারিত তাহার বেশি বা ততটুকুও স্কুলে শিখিতে পারিবে। বর্তমান অবস্থায় তাহা অসম্ভব। তাহা করিতে হইলে প্রত্যেক ছাত্রের স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাসে ২৪ ঘণ্টা থাকা এবং প্রত্যেক স্কুলের একজন কৃষিবিশেষজ্ঞ রাখা একান্ত প্রয়োজন। তথাপি লেখাপড়া শিখিতে আসিয়া ছেলেরা শ্রম করা একেবারে ভুলিয়া না যায় তাহার কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকা উচিত। বড় হইয়া কে বুদ্ধিজীবী হইবে, কাহাকে শ্রমিকই থাকিতে হইবে, তাহার যখন নিশ্চয়তা নাই, তখন সকলকেই উভয়ের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। প্রাচীনকালে গুরুকুলে ত এই ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু এখন পিতামাতারা ছেলেদের 'বাবু' (মাষ্টার বাবু, কেরাণী বাবু, ইত্যাদি) বানাইবার জন্যই স্কুলে পাঠান, উত্তম শ্রমিক বানাইতে নহে। স্কুলে ছেলেরা মাটি কোপাইতে শিখে ইহা তাঁহাদের পছন্দ নয়।

বিহারের অধিকাংশ ছাত্র মাইনার স্কুলে সপ্তম শ্রেণী (বঙ্গদেশের ষষ্ঠ শ্রেণী) পর্যন্ত পড়িয়া হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হইতে আসে। পূর্বের ন্যায় এখন আর বোর্ডের মাইনার পরীক্ষা হয় না। সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা লইয়া প্রধান শিক্ষকই এখন ছেলেদের পাসের সার্টিফিকেট দেন। ফলে পাসের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। বহু হাই স্কুলও ছত্রাকের ন্যায় যত্র-তত্র গজাইয়া উঠিতেছে। সকলেই ছাত্রদের টানিয়া লইতে ব্যস্ত। তাহাদের যোগ্যতা বিচার করার কাহারও অবসর হয় না। ফলে কি অবস্থা দাঁড়ায় ক্রমশ বলিতেছি।

অনেকে ভুল ক্রমে স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধিকে বিদ্যার প্রসার বলিয়া মনে করেন, কেহ ইহাও বলেন যে দেশে জ্ঞানপিপাসা বাড়িতেছে। ইহার চেয়ে শোচনীয় ভুল আর কিছুই হইতে পারে না। আমাদের এ বিষয়ে ভিন্ন অভিজ্ঞতা আছে। একটু অনুসন্ধান করিলেই জানা যাইবে স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধির আসল কারণ কি। প্রথমত প্রত্যেক গ্রামেই এরূপ দুই-একজন ধনী লোক আছেন যাঁহারা শুধু নাম কিনিবার জন্য স্কুল খোলেন। হাতী, ঘোড়া, মটরকার কিনিয়া আর নাম হয় না। একখানা ঘর ও কিছু জায়গা স্কুলের জন্য দিলে বেশ নাম হয়। দ্বিতীয়ত প্রত্যেক গ্রামেই কিছু বেকার গ্র্যাজুয়েট বা আই. এ. পাশ আছে যাহারা অন্য কোন গ্রাম্য পেশার উপযুক্ত নয় এবং মাষ্টারী কাজ চায়। তৃতীয়ত এরূপ অভিভাবকের সংখ্যাও বাড়িতেছে যাহারা নিজে যাহাই হউক ছেলেকে ভদ্রবৃত্তি-আশ্রিত দেখিতে চায় অথচ তাহাকে পড়ার জন্য দূরে পাঠাইতে চায় না। তাহাদের চাপেই প্রধানত স্কুল জন্মে। অনেক স্কুলের

শিছনেই বড় বড় মুরুব্বি আছেন যাঁহারা সরকারি কোন না কোন হোমরা-চোমরার সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং দুই এক বৎসরের মধ্যেই তাহারা শিক্ষা-বিভাগ হইতে স্বীকৃতি পাইয়া যায়। যে সব স্কুল সম্পূর্ণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে উদিত হয়, যাহাদের পক্ষে টিকিয়া থাকা একরূপ অসম্ভব মনে হয়, সেগুলিও শেষ পর্যন্ত বেশ টিকিয়া যায়। ফলে পুরাতন স্কুলগুলি যাহা পূর্বে ইচ্ছামত ছাত্র নির্বাচন করিয়া লইতে পারিত, শীঘ্রই তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া পড়ে। ছাত্রবেতন ছাড়া বেসরকারি স্কুলগুলির আয়ের কোন উপায় নাই; তাহারা শুধু নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতেই যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হয়। ছাত্রদিগকে সর্ব-প্রকার সুখ সুবিধা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি, নিজের মহত্ত্ব প্রচার, অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা, loud লাগানো ইত্যাদি তো আছেই; সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর উপায় হইল অযোগ্য ছাত্রদের প্রমোশন ও ভর্তির সংখ্যা বাড়ানো। প্রবেশার্থী ছাত্রের সংখ্যা যতই বাড়িতেছে, প্রকৃত 'বিদ্যার্থীর' সংখ্যা সেই অনুপাতেই কমিতেছে। সব স্কুলই জানে যে আজকাল কোন ছেলেই ফেল করিয়া নীচের ক্লাসে থাকিতে রাজী নয়। যদি আমার স্কুল তাহাকে প্রমোশন না দেয় তো সে কালই অন্য স্কুলে গিয়া উপরের ক্লাসে ভর্তি হইবে। আমার সার্টিফিকেটে তাহার কোন দরকার নাই, কারণ সেখানে ছাত্র ও অভিভাবক অম্লানবদনে বিবৃতি দিবে যে ছেলে এ পর্যন্ত কোন স্কুলেই পড়ে নাই, ঘরে গৃহশিক্ষকের কাছে পড়িয়াছে! সেখানে সকলেই অদাবু সেখানে এক স্কুল সাধু হইলে বিপদের কথা, তাই নামমাত্র পরীক্ষা লইয়া তাহাকে ভর্তি করা হয়। প্রত্যেক বাৎসরিক পরীক্ষায় শুধু দেখাইবার জন্যই দুই একটি মাত্র ছেলেকে আটকানো হয়। কিন্তু ঐ পর্যায়ের ছেলেও অন্য স্কুল হইতে আসিলে অনেক স্কুল তাহাকে উপরের ক্লাসে ভর্তি করিয়া থাকে। এক এক পর্যবেক্ষকের অধীনে আজকাল এত অধিক স্কুল থাকে যে এ সকলের খোঁজ রাখা তাঁহাদের প্রায় অসাধ্য।

শিক্ষাবিভাগের নিয়মানুসারে যে ছেলে তিন বিষয়ে ফেল হয়, তাহার প্রমোশন নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিয়ম কখনও কার্যকরী হয় না। যে দুই একটি ছেলেকে আমরা রাখিয়া দিই, তাহারা এক এক বিষয়ে ৮।১০ এর বেশী নম্বর পায় নাই, হয়ত মোট ৭০০-র মধ্যে ৭০ পাইয়াছে। এরূপ ছেলেও অন্য স্কুলে গেলে সাদরে গৃহীত হয়। "আমি তো মোটে পাঁচ বিষয়ে ফেল, আমার কেন প্রমোশন হইবে না" ইহা তো ছাত্রদের একটা দাবী। প্রত্যেক স্কুলেই দুইটি করিয়া নম্বরের রেজিষ্টার থাকে—একটিতে প্রকৃত নম্বর ও দ্বিতীয়টা শুধু ইন্সপেক্টর মহাশয়কে দেখাইতে। "Rough Mark Register" নামক মুদ্রিত বহি বাজারেও বিক্রীত হয়। আমরা জানি যে মাধ্যমিকের পাঠ্যক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাস, সমগ্র পৃথিবীর ভূগোল, প্রায় ম্যাট্রিকের সমান পাটিগণিত, এক অধ্যায় জ্যামিতি প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু এই সমস্ত পত্রী পার হইয়া যে সকল ছেলে অষ্টম শ্রেণীতে ভিড় জমায় তাহাদিগকে অতি সাধারণ প্রশ্ন করিলেও এমন মনে হয় না যে তাহারা কোন কালে এ সকল বিষয়ে কিছু পড়িয়াছে। পরীক্ষায় দশ-বিশ নম্বর আনা তাহাদের ঐ বিষয়ে অতটুকু যোগ্যতারও পরি-চায়ক নয়। সে সব রহস্য পরে বলিতেছি। কিন্তু এরূপ ছেলেরও প্রমোশন হয় এবং একাদশ (বঙ্গদেশের দশম) শ্রেণী পর্যন্ত নির্বিবাদে চলিয়া আসে। ইহারা সর্বদাই শিছনের বেঞ্চে বসিবার চেষ্টা করে। ক্লাসে কি হয় না হয় কখনও বুঝিবার চেষ্টা করে না। চেষ্টা করিয়াও কোন লাভ নাই। কোন রকমে পাঁচ ঘণ্টা সাথীদের সঙ্গে গল্প

অনুভব করিয়া বাড়ী ফিরিয়া যায়। "অলসের মস্তিষ্ক সয়তানের কারখানা।" সুতরাং তাহারা এত সময় কি কি অনিষ্টকর চিন্তা দ্বারা তাহাদের মানসিক ও শারীরিক কি কি অনিষ্ট সাধন করে মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞেরা তাহার উত্তর দিবেন। তাহাদের হাতে দামী দামী বইগুলি দেখিলে তো রীতিমত দুঃখই হয়।

প্রশ্ন হইবে, তবে মাষ্টারেরা কি করেন? তাঁহারা তাঁহাদের অন্ন আয়ের উপরে দু'পয়সা রোজগারের জন্য সকাল-সন্ধ্যা টিউশনি লইয়া এরূপ ব্যস্ত থাকেন যে, ক্লাসে পড়ানোর দিকে মনোযোগ দেওয়ার শক্তি তাঁহাদের কমই অবশিষ্ট থাকে। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, ক্লাসের প্রত্যেকটি ছেলেকে ক্লাসের সঙ্গে সমান করিয়া লইয়া যাইতে হইলে পাঠ্য বিষয়ে প্রোগ্রেস বা অগ্রগতি কিছুই হইবে না। সকলকে হোমটাস্কের জন্য চাপ দেওয়া মানে নিজেরই হোমটাস্ক বাড়ান। আর যে সব লেখা সবই কাটিয়া 'ছেলে সাজা'র প্রয়োজন, তাহা দেখিয়াই বা কি লাভ? পঁচিশ বৎসর পূর্বে প্রত্যেক ক্লাসে প্রায় অর্ধেক পাসযোগ্য ছেলে পাইতাম কিন্তু এখন প্রত্যেক ক্লাস যে প্রায় পঁয়ত্রিশ চল্লিশ জন ছাত্রে পরিপূর্ণ থাকে, তন্মধ্যে ৭,৮ টি ছেলে ও কষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় যাহারা রোজকার পাঠ প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করে ও ক্লাসের সঙ্গে সমান তালে চলিতে চাহে অর্থাৎ এক কথায় যাহাদিগকে আমরা পাসযোগ্য বলিয়া আশা করি। নূতন নিয়ম অনুসারে শতকরা ১৫ জন ছাত্রকে ফ্রি দিতে হয়; কিন্তু এরূপ ছেলে শতকরা ১০জনও খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন, যাহারা গরীব হইয়াও লেখাপড়ায় ভাল। অনেকেই ইহা অতিরিক্ত অন্ধকার চিত্র বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু দীর্ঘকাল শহর ও গ্রামাঞ্চলে এবং বঙ্গদেশও অল্পকাল শিক্ষকতায় আমি এই অবস্থাই সর্বত্র দেখিয়াছি। কোন্ ছেলে কোন্ ক্লাসে পড়ে তাহা শুনিয়া বাহিরের লোক মনে করিতে পারে যে সে কমপক্ষে এই এই জিনিষ জানে; কিন্তু আমরা স্কুলের ভিতরে থাকিয়া জানি যে, সে ছেলে দশম শ্রেণীতে পড়ে, হয়ত তাহার পঞ্চম শ্রেণীর জ্ঞানও নাই।

এরূপ কেন হয়? প্রথমত ছাত্রদের একটা ক্রমবর্ধিষ্ণু নিরক্ষুশ ভাব। তাহারা মনে করে প্রমোশনের জন্য পড়া এখন কিছু প্রয়োজনীয় নয়। যাহারা পড়িয়া পাশ করে হয়ত তাহারাই বিদ্রূপের সামগ্রী হয়। বৎসরে একবার কান্নাকাটা ও ধরপাকড় (তাহাও হয়ত নিজেকে করিতে হইবে না, অভিভাবকই ঐটুকু করিয়া যাইবেন) করিলেই একেবারে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত অবাধ গতি। অশিক্ষিত অভিভাবকদের তো কথাই নাই, 'শিক্ষিত' অভিভাবকরা পর্যন্ত এমন অবুঝ যে, কোন ক্রমে 'হাতে পায়ে ধরিয়া' ছেলেকে উপর ক্লাসে ঠেলিয়া দিলেই যেন তাহার জন্ম সার্থক হইল। কোন অভিভাবকের উদ্দেশ্য ছেলের বিবাহ পর্যন্ত, কারণ মেয়ের বাবা দেখিতে চাহিবে ছেলে কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছে। বিদেশী হেডমাষ্টার, যিনি ছুটি আর ছুটাইবার জন্যই পড়িয়া আছেন, তাঁহার পক্ষে প্রায়ই স্থানীয় লোকের প্রবল পীড়াপীড়ির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হয়। কড়া হইলে প্রতিবেশী স্কুলগুলি ছেলে টানিয়া লইবে এই ভয়ও আছে। নীচে হইতেই যে সকল অযোগ্যের প্রমোশন চলে, তাহারা উপর ক্লাসের কঠিন বিষয়গুলি আর চেষ্টা করিলেও বুঝিতে পারে না এবং সেজন্য ক্রমশ চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়। যে সকল ছেলেকে এক আধ বৎসর প্রমোশন না দিলে তাহারা বাস্তবিক তাহাদের কর্মটুকু পুরা করিতে পারিত, তাহাদের প্রমোশন আমরা কখনও বন্ধ করি না, ফলে তাহাদের ভিত্তিই দুর্বল থাকিয়া যায়। শুধু দুই একটি ছেলে যাহাদের কোন অঙ্কে কিছু হইবার

নহে, তাহাদের প্রমোশন বন্ধ করিয়া আমরা তাদের ক্ষমা উড়াই এবং অভিভাবকদের মিথ্যা আশ্বাস দেই যে, এই একটা বছর থাকিলেই 'তৈয়ারি' হইয়া যাইবে। আসলে তাহাদের তৈয়ারি তবেই সম্ভব হইত যদি দুই তিন ক্লাস নীচে পুনরায় ভর্তি করান যাইত। যে ধীর পদে অগ্রসর হয়, সে দেরিতে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে ইহাই সর্ববাদিসম্মত; কিন্তু যে মোটেই অগ্রসর হয় না (বরং কখনও বিপরীত দিকে চলে) সে কি কখনও পৌঁছিবে? আর যে পৌঁছিতে পারিত, তাহাকে যদি প্রমোশন দিয়া খোঁড়া করিয়া দেওয়া হয়, তবে সেজন্য অপরাধী কে?

অনেকে বলিবেন যে ইহাই যদি প্রকৃত অবস্থা হয় তো এত ছেলে পাস করে কিরূপে? প্রায় স্কুল হইতেই প্রতি বৎসর শতকরা ৪০।৫০।৬০ জন ছেলে ম্যাট্রিক পাস করে। কিন্তু শতকরা ষাট জন নির্বাচিত হয়, তন্মধ্যে হয়ত শতকরা চল্লিশ পাস করে। প্রমোশনের তুলনায় এই নির্বাচনীতে অবশ্যই একটু দড়ি কসিয়া ধরিতে হয়। তবে হিসাব করুন, আসলে শতকরা কত পাস করিল ও কত waste অর্থাৎ নষ্ট হইল। তাহারা বাস্তবিক নষ্টই হইল যেহেতু তাহারা কোন কাজের উপযুক্ত রহিল না। শিক্ষার মোহে পড়িয়া তাহারা পিতার অর্থ ও তদ্ভোধিক মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিয়াছে। আমি অনেক সময় ভাবি যে, স্কুল খুলিয়া আমরা সমাজের কতটুকু কল্যাণ করিতেছি। পঁচিশ জনকে সংসারের জন্য তৈয়ারি করিয়া যদি তৎসঙ্গে পঁচাত্তর জনকে নষ্ট করা হয় তো সমাজের পক্ষে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশী হইল, কারণ ঐ ৭৫ জনকে স্কুলে ডাকিয়া না লইলে তাহারা নিশ্চয়ই ঘরে পৈতৃক বৃত্তিটা শিখিতে পারিত। এখন অকর্মণ্যতা ও শিক্ষাভিমান তাহাকে তাহা করিতে দিবে না, সুতরাং ঐরূপ অকর্মণ্যদের সংসর্গে তাস-পাশা খেলিয়া সময় কাটান ছাড়া তাহার আর কিছু হইবে না। পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে দুই একটি ছেলে অবশেষে পরীক্ষায় কৃতকার্য হয় দেখিয়াছি। ইহাতেও প্রমাণিত হয় না যে, তাহারা দুই তিন বৎসরে বাস্তবিকই কিছু উন্নতি করিয়াছে। দৈবক্রমে ও অনেক সময় ৫।৭ নম্বরের এদিক্ ওদিক্ হইয়া যায়। আর, বার বার পরীক্ষা দেওয়ার 'অধ্যবসায়' কে আমি মোটেই প্রশংসা করিতে পারি না। তাহাদের পূর্বেই বুঝা উচিত ছিল যে, উচ্চশিক্ষা তাহাদের জন্য নয়। স্কুলের সমস্ত পঠন-পাঠন শুধু বৎসরের শেষে ভাবী পরীক্ষাতেই কেন্দ্রীভূত হওয়া এবং তজ্জন্য একঘেয়ে পাঠ্যক্রম থাকাও অত্যন্ত অহিতকর। কোন বিষয় বুঝাইবার সময় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া ছেলেরা প্রায়ই বলে "এরূপ লিখিলে নম্বর দিবে কিনা" অথবা এরূপ প্রশ্নও কি পরীক্ষায় আসে? বস্তুত পরীক্ষার জন্য পঠন-পাঠন নয়, পঠন-পাঠনের পরিচয়ের জন্যই পরীক্ষা। আর কিরূপে এত পাস করে তাহার রহস্যও বুঝাইতেছি। প্রথমত পাসমার্ক মোটে শতকরা ৩০, অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশও নয়। কোনও বিষয়ে "কোনরূপ পাস" মানে ইহা নয় যে ছেলে সেই বিষয়ে বাস্তবিকই কিছু জানে। দ্বিতীয়ত প্রশ্নের ও নম্বর দেওয়ার মানও অতি নিচু হইয়া গিয়াছে। আমি চার বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কের পরীক্ষক ছিলাম। নম্বর দেওয়ার যেরূপ নির্দেশ থাকে তাহাতে দেখিয়াছি ছেলের ফেল করাই কঠিন, পাস করা কঠিন নহে। কিছু লিখিলেই নম্বর দিতে হইবে। অঙ্কের দুই এক ধাপ শুদ্ধ হইলেই ২।১ নম্বর তাহার প্রাপ্য হইবে, জ্যামিতি কিছু না বুঝিয়া মুখস্থ করিলেও নম্বর আটকাইবে না। দুই এক স্থানে অসঙ্গতির জন্য দুই এক নম্বর কাটিবে মাত্র। সংস্কৃতে প্রায় ৩০ নম্বর শুধু মাতৃভাষায় অনুবাদ বা কাহিনী লিখিবার জন্য থাকে। তাহাতে ২৫।২৫ নম্বর অনেকেই আনে।

সংস্কৃতে অনুবাদে ২৫-এর মধ্যে ২১৩ নম্বর এবং বাকী ব্যাকরণে ২৩ নম্বর আনিতে পারিলেই ছেলে সংস্কৃতে পাস হইল। অর্থাৎ সংস্কৃতে পাস করিতে সংস্কৃত জানার দরকার নাই। পরীক্ষার্থী মধ্যে মধ্যে যে 'ভূলে' দুই একটি কথা শুদ্ধ লিখিয়া ফেলিয়াছে (কিন্তু কোনটারই শুদ্ধরূপ সম্বন্ধে সে নিজে নিঃসন্দেহ নয়) তাহার দরুণ ৬।৭ নম্বর পাওয়া তাহার আশ্চর্য নয়। এরূপ ছেলেকে সংস্কৃতজ্ঞ বলিবেন কি? ইংরেজিতে পাস করাটাই বা কিছু কঠিন। স্বাধীনতা লাভের পর ইংরেজির পাস মার্ক শতকরা ৩৬এ হইতে ৩০এ নামান হইয়াছে। তথাপি এখনও ইংরেজিতে ফেলের সংখ্যাই সর্বাধিক এবং অনেকে শুধু ইংরেজির জন্যই ফেল করে। বর্তমানে যে ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে তাহাতে শীঘ্রই ডিগ্রিধারীর মধ্যেও এরূপ লোক পাওয়া কঠিন হইবে যে ইংরেজি একখানা সাধারণ বই বা সংবাদপত্র পড়িয়া বুঝিবে বা কোন বিদেশীর সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে পারিবে।

তারপর, পরীক্ষাটা কি? ইহাতে পরীক্ষার্থীর প্রকৃত যোগ্যতার কতটুকু পরিচয় পাওয়া যায়? আজকাল ছেলেরা স্কুলে আসিয়া আর কিছু শেখার আগেই চুরিবিদ্যা শেখে। পরীক্ষায় অপরের উত্তর দেখিয়া নকল করা, মৌখিক সাহায্য লওয়া, চিরকুট, পুস্তকের ছিন্নপত্র বা অখণ্ড পুস্তক হইতে নকল করা ইত্যাদি বাড়িয়াই চলিয়াছে। অনেক অভিভাবককেও বাহির হইতে এই সকল বস্তু সরবরাহ করিতে দেখা যায়। পরীক্ষা কি এবং তাহাতে সহজে উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি, এই সব কৌশল যাহা ছেলেরা স্কুলে না আসিলে কখনই শিখিত না, অতি অল্প দিনেই আয়ত্ত করিয়া লয়। কিছু ছেলে তো সম্পূর্ণ এ সকলের উপর নির্ভর করিয়াই পরীক্ষাগৃহে আসে। তাহারা পরীক্ষাতেই যা কিছু লিখিয়া কাগজ খারাপ করে, ক্লাসে সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেও চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকে। অঙ্কের নিকট যেমন দিন-রাত্রি সমান, ইহাদের নিকটও তেমন সহজ কঠিন সব সমান। যে চার-পাঁচ নম্বর প্রতি পেপারে আনে, তাহাও একাকী বন্ধগৃহে পরীক্ষিত হইলে আনিতে পারিত না। চোরেও অপহৃত দ্রব্যের মূল্য বুঝে, ইহারা যাহা পায় তাহাই চুরি করে—কখনও নিজের মতই কোন মূর্খ বালকের উত্তর হইতে।

অতঃপর অত্যন্ত লজ্জা ও খেদের সহিত বলিতেছি যে যে শিক্ষকতা বৃত্তি সর্বাপেক্ষা সৎ ও সাধু বৃত্তি ছিল, তাহাতে এত অসাধুতা ও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে যে তাহা বলিবার নয়। অনেক শিক্ষকেরই পুত্র, ভাই, ভাগনে, জামাতা, বন্ধুর ছেলে, প্রাইভেট ছাত্র ইত্যাদি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে থাকে। তাঁহারা বিবিধ উপায়ে পরীক্ষার্থীদের মাথা খাইয়া থাকেন—প্রশ্ন বলিয়া দিয়া, পরীক্ষাভবনে সাহায্য করিয়া এবং উত্তর দেখিবার সময় পক্ষপাত করিয়া। টিউশনি লইয়াই অধিক দুর্নীতির সৃষ্টি হয়। আমাদের ছেলেবেলায় গৃহশিক্ষকের কাছে পড়া বিলাসিতা বলিয়া গণ্য ছিল। কিন্তু এখন অনেক গরীব পিতামাতাও মনে করেন যে, নিজেরা খাই বা না খাই ছেলের টিউটর রাখিতেই হইবে। অনেক ছাত্র শুধু এই সর্তেই প্রমোশন পায় যে টিউটর রাখিয়া কর্মী পূজা করিবে। মাষ্টারদের টিউশনের একটা মৌসুম আছে। ছেলেরা পড়িতে বা অধিক জ্ঞান লাভ করিতে টিউটরের কাছে আসে না। তাহারা আসে পরীক্ষার জন্য 'important' অংশগুলি জানিতে, ও তাহাদের উত্তর লিখাইয়া লইতে। অভিভাবকদের নিকট চক্ষু লজ্জা রাখিতে এবং নিজেদের ব্যবসা কায়েম রাখিতে তাঁহারা শুধু প্রশ্নই বলিয়া দেন না, আরও যাহা কিছু সম্ভব হয় করেন, কেহ কেহ পাসের চুক্তি করিয়াও ছেলে পড়ান।

এত করিয়াও যে সব ছেলে 'পাস করিতে' অর্থাৎ প্রমোশন লইতে পারিল না, তাহাদের

অভিভাবকগণ প্রথমে পরীক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষকের নিকট পৌঁছিবেন। অনেক সময় মুখের খাতিরেই কাজ হইয়া যায়, নতুবা উৎকোচ দানে বশীভূত করিতে হয়। ছোট ছেলেদের বুঝান যায়, বড়দের যায় না। তাঁহারা 'বুঝিতে' আসেন না, কার্যোদ্ধারের জন্য আসেন। তাঁহাদের সঙ্গে রাগারাগি চলে না। হেড মাষ্টার বিশেষ মনোবল-সম্পন্ন না হইলে প্রায়ই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিতে হয়, ফলে বেশী কড়াকড়ি করা যায় না। এইরূপে ছেলেরা পরীক্ষা কেন্দ্রে গেল। সেখানেও পরীক্ষা পরিচালকদের মধ্যে অনেকে ছেলেদের নিকট ভাল (অর্থাৎ কোপের) সিট দেওয়ার ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার সর্তে আবদ্ধ থাকেন; লিখোগ্রাফ হইয়া বাহির হইতে উত্তর আসে, খাতা বদল হয়, আরও কত কি। কোন্ দিন কোন্ ঘরে কে গার্ড থাকিবেন সে সব খবর লইয়া নানাবিধ পরিচয়সূত্র ধরিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করা হয়। অনেক গার্ডই ভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, পরীক্ষাগৃহে বহুবিধ দুর্নীতি অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও উপেক্ষা করিয়া যান, অথবা ইহা স্বাভাবিক মনে করেন। ছাত্রেরা পরীক্ষা দিয়া আসিলে দেখি, তাহারা নিজে কোন্ পেপারে কেমন লিখিয়াছে বা কত নম্বর আশা করে সে খবরের চেয়ে এই খবরই বেশী জানে যে কোন্ পেপার কোন্ পরীক্ষকের নিকট গিয়াছে। জিলা স্কুলের কেরানীদের এই উপলক্ষে বেশ দু' পয়সা হয়। পরীক্ষক যে শহরে থাকেন, সেখানে ছাত্রের অভিভাবকের পরিচিত কেহ থাকিলে তৎসাহায্যে অথবা সোজাসুজি গিয়া সামবানাদি উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করা হয়। সেখানে বিফলমনোরথ হইলে প্রধান পরীক্ষককে এবং সর্বশেষে টেবুলেটারদের পাকড়ান হয়। বিশেষত ধনী ছাত্রেরা মনে করে না যে, তাহাদের পাস কখনও আটকাইতে পারে।*

আমি টিউশনির ঘোর বিরোধী। ইহা দ্বারা ছাত্রদের কোন উপকার হয় তাহা আমি বিশ্বাস করি না। ইহাতে ছাত্রেরা আত্মনির্ভর হারাইয়া ফেলে। ক্লাসের পড়ান তাহারা মনোযোগের সহিত শোনে না, পরে টিউটরের কাছে বুঝিয়া লইব ভাবিয়া ছাড়িয়া দেয়। টিউটর ছাত্রকে কোন নূতন শক্তি দিতে পারেন না। ঘোল করিয়া মিলাইতে গেলে যেমন লোকের বহুশ্রম হয়, ইহাদেরও সেইরূপ বলা হয়। আমি এরূপ উদাহরণও জানি যে, এক হেড মাষ্টারের ছেলে ক্লাসে দ্বিতীয় হইত। তাহাকে প্রথম করিবার জন্য তিনি নানা রকমে অনেক বিষয় শিখাইয়া ও লিখাইয়া দেন। কিন্তু ফলে দেখা গেল যে তাহার আগের শক্তিও তাহার নাই এবং পরের পরীক্ষায় সে তৃতীয় স্থান অধিকার করে। স্কুলে যে সমস্ত কাজ দেওয়া হয় নিয়মিত রূপে তাহা করিয়া গেলেই যথেষ্ট। টিউটার ছেলেকে আর বেশি কি শিখাইবেন? অতিরিক্ত কাজ করিতে গেলে অবশ্যই সে ক্লাসের কাজ অবহেলা করিবে। Dalton plan প্রভৃতি আধুনিক শিক্ষণ-প্রণালীগুলি সবই ছেলেদের স্বাধীনতা দিতে বলে। কিন্তু আমাদের অভিভাবকেরা টিউটর লাগাইয়া ছেলেদের স্বল্প স্বাধীনতাও কাড়িয়া লন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ভাষায় "চোখের উপর ঝুলুর লেলাইয়া দেওয়ার মত ইহারা ছেলেদের উপর টিউটার লেলাইয়া দেন," এবং এই শাস্তি শুধু এই জন্য যে তাহাদের পিতার নষ্ট করিবার মত কিছু টাকা আছে। 'ঘষে মেজে' চেহারা বানাইলে সে রূপ যেমন স্থায়ী হয় না, 'ঘষে মেজে' পাস করাইলে সে বিদ্যাও স্থায়ী হয় না, এবং রাষ্ট্রের কোন কাজে লাগে না।

একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে পৃথিবীতে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়াই জন্মগ্রহণ করে।

* উপরে যে সকল দুর্নীতির কথা বলিলাম তাহার একটিও অতিরঞ্জিত নয়। তবে আশা করি, বর্তমানে এতটা অধঃপতন হয় নাই।

তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা (environment) ও ছেলের ইচ্ছাশক্তি সম্মিলিত হইয়াই কাহাকেও সফল ছাত্রে ও অপরকে সফল কারিগরে পরিণত করে। একথা অস্বীকার করিয়া আমরা যে ছেলে দক্ষ কারিগর হইবার জন্যই জন্মিয়াছে, শুধু পিতার ইচ্ছায় তাহাকে উচ্চ শিক্ষার বিড়ম্বনা দিয়া থাকি। ফলে প্রচুর শ্রম, অর্থ ও শক্তির (energy) অপব্যয় হয়। এই শিক্ষার মোহে কত দেশী শিল্প চিরতরে লোপ পাইতেছে কে তাহার হিসাব করিবে? হিতোপদেশের একটা কথা "ন বিকারহেতৌপি সতি বক্তঃ" সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। ছোট ঘটিতে যেমন বেশী জল ধরে না, অনেকের মাথায়ও বেশী বিদ্যা ধারণ করার শক্তি নাই। আসলে মাষ্টার ছাত্রকে শিখায় না, ছেলেই নিজেকে শিখায়। Education কথার অর্থই unfoldment বা বিকাশ। যে শক্তি ছেলের মধ্যেই আছে, তাহারই বিকাশের সুযোগ দেওয়া। অতিরিক্ত শক্তি শিক্ষক কোথায় পাইবেন? রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "অপরে আমাকে যাহা শিখাইতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহা আমি কিছুই শিখিতে পারি নাই। আমি শুধু তাহাই শিখিয়াছি যাহা নিজে নিজেকে শিখাইয়াছি।" কে উচ্চশিক্ষার অধিকারী এবং কে নয় তাহার বিচার কে করিবে? পিতামাতারা সকল ছেলেকেই 'বাবু' করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিচারের কোন মূল্য নাই। কোনরূপে পাশ করিয়া গ্রামের ছেলেরা চাকুরি করিতে শহরে চলিয়া গেলে তাহাতে গ্রামের কোন লাভ আছে কি? এই প্রশ্নের সহিত শিক্ষকেরও স্বার্থ জড়িত আছে। আজ যদি তাঁহারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে যত ছেলে হাই স্কুলে পড়িতে আসে, অর্ধেক মাধ্যমিক শিক্ষার অনধিকারী, তবে অর্ধেক শিক্ষকের চাকরিও চলিয়া যাইবে।(ক্রমশ)

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত (বিজ্ঞপ্তি নং ২২ টি. বি. ২৯।১১।৫০ দ্রষ্টব্য)

ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দমোহন গুপ্ত প্রণীত

কথা-শেখা

দেখা যায় বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দিতে যথেষ্ট সময় অপব্যয় হয়। অথচ বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে ছবি ও বস্তুর সাহায্যে অতি অল্প সময়েই বর্ণপরিচয় ও বাক্যগঠন প্রণালী শেখানো যাইতে পারে।

'কথা-শেখা' বইখানিতে চিত্তরঞ্জক চিত্রের সাহায্যে বর্ণপরিচয় ও বাক্য গঠনের জন্য অক্ষরের পরস্পর সাদৃশ্যকে ভিত্তি করিয়া সুললিত ছন্দে বর্ণযোজনা করা হইয়াছে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুরা অক্ষর চিনিয়া সহজ বই পড়িতে পারিবে। গতানুগতিক ভাবে যেখানে ছয় মাসেও শিশুদের কিছু শেখানো যায় না সেখানে দুই মাসেই শিশু নিজে নিজে সহজ বই পড়িতে পারিবে।

বুকাক্ষর বর্জিত মজার গল্প, মন ভোলান ছড়া ও পাতায় পাতায় রঙিন ছবি বইখানির বৈশিষ্ট্য। দাম মাত্র চৌদ্দ আনা।

দি সিটি বুক কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | বৈশাখ ১৩৬০ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

আলোচনা

পঁচিশে বৈশাখ

রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়াছেন, চির নূতনের যে ছিল ডাক, পঁচিশে বৈশাখ। সত্যই এই দিনটি এ যুগের বাঙালীর জীবনে বর্ষে বর্ষে, চিরনূতন রূপে দেখা দেয়। শুভ বৈশাখের প্রথমেই তাই বাঙালীর মনে পড়ে সেই কবিগুরুকে, যাঁহার জন্ম বাঙলার মাটিকে পুণ্য করিয়াছে, বাঙালীকে ধন্য করিয়াছে, যিনি সুদীর্ঘ জীবনের সাধনায় অমৃত আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার বিপুল সাহিত্যের কাব্যে ও গানে, সুরে ও ছন্দে। রবীন্দ্রনাথের মত মহাপুরুষের জন্ম জাতির জীবনে এক অপূর্ব আবির্ভাবের মতো। মহাপুরুষদের জীবনেই সৃষ্টিকর্তার অসীম বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখিয়া যুগে যুগে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়।

শিক্ষার বৈশাখ সংখ্যায় আমরা আনন্দে ও শ্রদ্ধায় কবিকে স্মরণ করিতেছি। যে অসীম রহস্যের সন্ধান লাভ করিয়া বিস্ময়ে তাঁহার কবিচিত্তে গান জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহার কণামাত্রও আমাদের নিকট প্রকাশিত হউক, কুহেলিকা আমাদের উন্মোচিত হউক।

আজ আমাদের জাতীয় জীবনে যে রিক্ততা, যে ব্যর্থতার জাল সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তাহা ছিন্ন করিয়া আবার আমাদের মধ্যে কবির অভ্যুদয় হউক। আমাদের আহ্বানে নিখিলের চিত্ত সাড়া দিক, কবির বাণী আমাদের অবসন্ন প্রাণে বীর্য দান করুক, নূতন বর্ষে উন্মুখ দিগন্তে আশার আলো দেখা দিক, কল্যাণশঙ্খ বাজিয়া উঠুক।

রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা ও শিক্ষকতা

কবি রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস উপলক্ষে দেশের সর্বত্র প্রচুর আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি প্রতি বৎসরেই এই দিনটি প্রতিপালন করে। এবার তো মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের স্পষ্ট নির্দেশই ছিল। স্কুল কলেজ, ছেলেমেয়েদের ক্লাব ও মণিমেলা, সাহিত্য পরিষদ, মহাজাতিসদন, সাংস্কৃতিক বহু সমিতি ও সংঘ, প্রাদেশিক কংগ্রেস প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বিপুল অবদানের নানা দিক্ লইয়া

আলোচনা করা হইয়াছে, শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দান করা হইয়াছে, কবির গান গাহিয়া নাটক অভিনয় করিয়া গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা করা হইয়াছে। অনেক জায়গায়ই মনোরম পরিবেশে সুন্দর সুরুচিপূর্ণ আবহাওয়ায় অনুষ্ঠানগুলি বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

কবির দানের শেষ নাই, যেদিকেই হাত দিয়াছেন সেদিকেই তিনি অজস্র সম্পদে আমাদের পাত্র পূর্ণ করিয়া দান করিয়াছেন, এখন অঞ্জলি ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেই হয়। শিক্ষা ও শিক্ষকতা সম্বন্ধেও তাঁহার দান যে কতখানি তাহা আমরা সব সময় স্মরণে রাখি না, ভুলিয়া যাই যে, শিক্ষা-সমস্যা কবির জীবনের অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবে ঐ দিকটার আলোচনা তেমন হইল না। কবি নীরস শুষ্ক ভাবে শিক্ষার সমস্যা লইয়া পরীক্ষা করেন নাই। শান্তিনিকেতন তাহার প্রমাণ। শিশুর চিত্ত প্রকৃতির আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া ফুলের মত সহজ সুরে বিকশিত হইবে। সেই বিকাশের কাজে শিক্ষক সহযোগিতা করিবেন। তাঁহার নিজের জীবন দ্বারা ছাত্রের মধ্যে জীবন সঞ্চার করিবেন, জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানের বাতি জ্বালিবেন, স্নেহের দ্বারা তাহার কল্যাণ সাধন করিবেন; তবেই না তাঁহার গৌরব। এই ছিল শিক্ষকের সম্বন্ধে কবির আদর্শ। এ বিষয়ে তিনি যে কত ভাবিয়াছিলেন, কত পরীক্ষা করিয়াছিলেন আজ আমরা যতই সে সবের আলোচনা করিব, ততই আমাদের কল্যাণ হইবে। কবি এক জায়গায় বলিয়াছিলেন, ব্যর্থ কবিদের সান্ত্বনা স্থল "পস্টারিটি" অর্থাৎ অনির্দিষ্ট উত্তর কালের মধ্যে আশ্বাস লাভের চেষ্টা। কবি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পরিকল্পনাকে সযত্নে সার্থক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে দেশবাসী তাঁহার প্রকৃত শ্রদ্ধাতর্পণ করিবে ও তাঁহাকে আপনার বলিয়া গর্ব করিবার যোগ্যতা অর্জন করিবে, তাঁহার অসমাপ্ত কাজ হাতে তুলিয়া লইয়া তাঁহাকে তৃপ্ত করিবে।

শিশু-শিল্পকলা প্রদর্শনী

পশ্চিমবঙ্গ শিশুকল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে একটি শিশু-শিল্পকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের বহু ছেলেমেয়ের হাতের কাজ রাখা হইয়াছিল। ছাত্র ছাত্রীরা নৃত্যে গীতে আবৃত্তিতে দর্শকদের প্রীত করে। নানা রকম খেলনা, বাঁশ ও বেতের কাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। পরিষদের সভানেত্রী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু বলেন যে, বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের নির্মল আনন্দ প্রদান ও কাজ করার উৎসাহ সঞ্চার করার জন্য এই পরিষদ চেষ্টা করিতেছেন। অনেক শিশু প্রতিকূল অবস্থায় অর্থ নৈতিক বিপাকে পড়িয়া নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া ফেলে। শিক্ষা ও স্বাভাবিক স্নেহ লাভের সুযোগে ইহারা বঞ্চিত। কি ভাবে চেষ্টা করিলে সুযোগ সুবিধা দিয়া ইহাদের অন্তর্নিহিত গুণাবলী ও সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করিয়া তোলা যায়, পরিষদ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতেছেন।

তিনি আরও বলেন যে, বোম্বাই মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে শিশুদের রক্ষা ও কল্যাণের জন্য ব্যাপক চেষ্টা চলিতেছে, কিন্তু আমাদের বাঙলা দেশে এখনও এরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। ১৯২২ সালে শিশু আইন পাশ হয়, ১৯৩৩ সালে তাহা সংশোধিত হয়। কিন্তু আজও তাহা সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় নাই। সম্প্রতি দেখিতেছি, কেন্দ্রীয় সরকার একটি শিশু-রক্ষার (Children's Bill) আইন সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন।

স্বাধীন ভারতে লাঞ্ছিত, পীড়িত, দরিদ্র, অবনত, অনাথ ও অসহায় সকল শিশুই রাষ্ট্রের অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবে। সকলকেই বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে, সকলেরই উপযুক্ত

খাওয়া পরার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। দেশের শতকরা ৯০ জন লোক অসচ্ছল অবস্থায় আছে, তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা সুপ্তায়িত রহিয়াছে, সেই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো রাষ্ট্রের কাজ। এই সব শিশুদের দেশসেবার উপযোগী করিয়া গড়িতে না পারিলে দেশ বড় হইবে কিসের জোরে? এই সব হতভাগা ছেলেমেয়েদের প্রতি যাহারা অত্যাচার উৎপীড়ন করে, আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাহারা ইহাদের পাপ ব্যবসায়ে লিপ্ত করে, তাহাদের প্রকাশ্যভাবে লাঞ্ছিত করা জনগণের কর্তব্য।

নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবার বড়দিনের ছুটির মধ্যে কলিকাতায় নিখিলভারত শিক্ষা-সম্মেলনকে আহ্বান করিয়াছেন। এই সম্মেলনে ভারতের সকল প্রদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণ যোগ দিবেন। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক হইয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ-বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রমোহন সেন। প্রদর্শনী বিভাগ পরিচালনা করিবেন ঐ বিভাগের অধ্যাপক শ্রীপরমচন্দ্র দত্ত।

শিক্ষক-সমিতির নূতন প্রচেষ্টা

আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সমিতির উদ্যোগে এই বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে শিক্ষকদের জন্য একটি 'রিফ্রেসার কোর্স' খোলা হইয়াছে। একমাসে এই কোর্সের কাজ শেষ করা হইবে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এইরূপ একটি মিলন ক্ষেত্রে একত্রিত হইলে পরস্পর আলাপ আলোচনা, অভিজ্ঞতার আদান প্রদানের দ্বারা নিজে অনেক লাভবান হইবেন। আমরা এই উদ্যোগের জন্য শিক্ষক-সমিতিকে অভিনন্দিত করিতেছি।

সমাজ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বৃত্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বোম্বাইয়ের টাটা সমাজ-বিজ্ঞান পরিষদে শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রদের জন্য আগামী জুলাই মাস হইতে বাৎসরিক ১২৭০৲ টাকা হারে দুইটি বৃত্তি দিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। স্নাতক ছাত্রছাত্রীরা এই বৃত্তি পাইবার অধিকারী। ছাত্রদের জন্য একটি ও ছাত্রীদের জন্য একটি বৃত্তি দেওয়া হইবে। পশ্চিম-বঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা সব সম্প্রদায়ের প্রার্থীর জন্য প্রদত্ত এই বৃত্তি, সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের অধিকর্তার সুপারিশ অনুযায়ী উক্ত বিদ্যাভবনে পাঠরত ছাত্রগণের মধ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গের জনশিক্ষা-অধিকর্তা প্রদান করিবেন।

নিরক্ষরতা দূর ও সমাজকল্যাণ

ইংলণ্ডের হাউস অব কমন্সে গত জানুয়ারির শেষে ইংলণ্ডের শিক্ষামন্ত্রীকে দীর্ঘ প্রশ্নের বাক্যবাণ সহিতে হইয়াছিল, নিরক্ষরতা ও অপরাধের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা, স্কুল পালানো ও নিরক্ষরতার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা, তাঁহার বিভাগীয় অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে কি বলে। এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করিতে বলিলে শিক্ষা-মন্ত্রী মিস হরসব্রা Horsborough বলিলেন যে নিরক্ষরতা বা অনুপস্থিতি সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষের স্কুলরেকর্ড প্রকাশ করিয়া দেওয়া তাঁহার উচিত হইবে না। কিন্তু ঐ দুইটি বিষয়ে কোন সম্পর্ক আছে কিনা, সে বিষয়ে কিছু তথ্য তাঁহার গোচরে আসিলে তিনি অবশ্যই তাহা প্রকাশ করিবেন।

এ বিষয়ে তথ্য আমাদেরও অনুসন্ধান করা বিশেষ দরকার। শিশু অপরাধীদের অপরাধ-প্রবণতার নানা কারণের মধ্যে অবৈতনিক বিদ্যালয়ের স্বল্পতা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অভাব, বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-প্রণালীর নীরস ও শুষ্ক ব্যবস্থা, শিক্ষকদের শৈথিল্য, কোনটাই কম দায়ী নয়। গৃহের

পরিবেশ প্রায়ই অনুকূল হয় না। শিশুমন আপনার অবলম্বন খুঁজিয়া পায় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুর চিত্ত ঐ কারণেই অসামাজিক হইয়া ওঠে। সেই ক্ষেত্রে সংশোধনের ও ক্ষতিপূরণের ভার তো সমাজ বিদ্যালয়কেই অর্পণ করিয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার নিরক্ষরতা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে শিশু-চিত্তকে সামাজিক কল্যাণের পথে চালিত করিলে অপরাধীর সংখ্যা অবশ্যই কমিয়া যাইবে।

ছাত্রদের চিত্তবিক্ষেপ

[শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়]

বিজ্ঞান আর বিজ্ঞাপন, প্রচার আর প্রশাসন যুগটাকে এমন ভাবে বিব্রত করে তুলেছে যে, শান্ত-স্নিগ্ধ জীবনের সুখ ছোঁয়া চারিদিকে, আমরা দেহ মনের অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলছি দিনরাত। বিশেষ করে মধ্যবিত্তের জীবন-চর্যার ইতিহাসে আজ পারিপার্শ্বিক দুর্যোগের ছায়াপাত সত্যই মর্মস্পর্শী অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মন খুলিয়ে উঠছে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বদৈন্যের পংকিলতায়, সর্বনাশা বঞ্চনার অভিশাপ আগুন লাগিয়েছে মানুষের মনের কুটিরে। তেল আনতে নুন ফুরানো সংসারের অশান্তি যেন মিটতে চায়না। এ সবের পরে আছে ছেলে মেয়ে মানুষ করার সমস্যা। মূর্খ পুত্র অশান্তির কারণ, "যাবজ্জীবং সুখো নরেৎ" জেনেই পিতামাতাকে ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করতে হচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে চেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালা হচ্ছে···ছেলের ছেলেত্ব দুদিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মানুষ হওয়ার আশাও দিগন্তে বিলীন। দুশ্চিন্তার পাথর পিষছে দিনরাত শত সমস্যায় জর্জর মধ্যবিত্ত পিতার মনটিকে···পাঠে অনুরাগ হারিয়ে ফেলেছে সন্তানেরা, ভুলে গেছে তপস্যার করণ কারণ···ফলে, ব্যর্থতার মহাপঙ্কে হাবুডুবু খাওয়া ছাড়া পথ নেই।

ছাত্র সমাজের মধ্যে আজ পড়া শোনার আগ্রহ যে লক্ষ্যণীয় ভাবেই কমে এসেছে, তার প্রমাণ হামেসাই পাওয়া যাচ্ছে। তবে, কারণ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। আমি আমার নিজের মতটাই প্রকাশের ধৃষ্টতা দেখাতে পারি। আমার মতে ছাত্রদের চিত্ত বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত থাকার ফলেই পাঠে অনুরক্তি কমে আসছে, আর তার ফলেই এই বিরাট ব্যর্থতা। মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকই স্বীকার করবেন যে, অনুরাগ না থাকলে মনোযোগ পাঠ-মুখী হতে পারে না। আজ ছাত্রসমাজ বিদ্যালয়ের বাহিরে সেই অনুরাগের বহু আহরণ করার সুযোগ পেয়েছে, তাই বিদ্যালয় তাদের কাছে বন্দিশালা; পড়াশোনা হুইলাইন-বড়ির মতই বিস্বাদ, এই বিস্বাদ-বিরক্তি নিয়ে আর যাই হোক, পড়াশোনায় মন সাধনা যে চলতে পারেনা, তা সবাই মানবেন। এখন দেখা যাক, পাঠে এই বিরক্তি ঘটাবার পক্ষে কোন কোন প্রভাব কার্যকরী হয়েছে।

ছাত্রদের জীবনে সংযমের পবিত্রতা-রক্ত আদর্শে ও ঐতিহ্যে সবচেয়ে বেশী কালিমা লেপন করেছে সিনেমা বা চলচ্চিত্র। সরস্বতী মার চেয়ে ছাত্র-সমাজ আজ সিনেমার পায়ে অঞ্জলি দিচ্ছে বেশি ক'রে···দক্ষিণার অঙ্কটাও এখানে বেশি। কাক-ডাকা ভোরে টিং টিং ঘণ্টা বাজিয়ে হকার আসে রাজ্যের সংবাদের ডালা সাজিয়ে···রসের যজ্ঞ-

পালার দ্বার খুলে দেয় ছেলেদের সামনে···কৌতূহলী দৃষ্টি আর উপবাসী মন নিয়ে তারা এই রসের নিমন্ত্রণে সাড়া দেয়। তবে, সংবাদপত্রের দুটি মাত্র পাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাদের মনের যাতায়াত···একটি সিনেমা আর একটি খেলা, পূর্ণ-পুরবী-চিত্রার রাজ্যে ঘুরে বেড়ায় সে মন, 'লাইট হাউস' আর 'মেট্রো'র বুকিং এর দরজাটাও নেড়ে দিয়ে আসতে সে ভোলে না, তার পর সুরু হয় ছেলেদের আলোচনা, শুধু বাড়ীতে নয়, পথে ঘাটে ক্লাসে গুঞ্জন চলে···মন-ভোমরা মধুর খোঁজে উড়ে বেড়ায় 'নিম্মি-নার্গিস-মধুবালার' দেশে··· তাদের বংশ কুলজী কণ্ঠস্থ হয়ে যায় পাঁচ বছরের ছেলেটিরও সিনেমা-দেখা, প্রত্যেকটি অভিনেতা অভিনেত্রীর অভিনয়ের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ, তুলনামূলক আলোচনা, পূর্ববর্তী রেকর্ড ইত্যাদি নিয়ে ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করতে যে সব ছেলের নাওয়া খাওয়া ভুল হয়ে যায়, তারা বিদ্যালয়ের পাঠে বিরক্তি দেখালে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকে কি? এই সিনেমা থেকে ছাত্রদের মধ্যে পলায়ন (Truancy) তৎপরতাও বেশ বেড়ে গেছে। আগে ছেলে পালাত স্কুল থেকে, আজ একেবারে বাড়ী থেকেই পালাচ্ছে···গিয়ে উঠছে ভারতের হলিউড, সিনেমার স্বর্গধাম বোম্বাইয়ে। অবশ্য এর আগে প্রস্তুতি হিসেবে পোষাক পরিচ্ছদে নাটুকে ভাবটাকে বন্ধ করতে বেশ কিছুদিন পড়াশোনায় ফাঁকি দিতে হয়েছে। কেশে বেশে বাবুয়ানী না ফোটাতে পারলে, আর যাই হোক 'রাজকাপুর' কি 'অশোক কুমার' হওয়া যায় না, সিনেমার আনন্দ নির্দোষ আনন্দ নয় বলেই বয়ঃসন্ধির সময় ঝোঁক খানিকটা নেশার মতই দুর্দম হয়ে পড়ে। যৌন প্রবণতা যখন homo-sexual থেকে hetero-sexual স্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখন 'লাবেলাপ্পাই' মার্কা হিন্দী ছবির আবেদন যে ছাত্রদের মনকে বেশ খানিকটা দুলিয়ে দেবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

তারপর দ্বিতীয় উপসর্গ খেলার মাঠ। খেলা বলতে বিশেষ কোন খেলা নয়, সব খেলাই। বারো মাসে তের পার্বণের মত ছাত্রদের রাজ্যেও একটা না একটা খেলার পার্বণ লেগেই আছে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকিই প্রধান। তা ছাড়া মরশুমী ফুলের মত সফরকারী বিদেশী দলের অসময়ের খেলা, তাও বাদ যায় না। খেলার শিক্ষণীয় গুরুত্ব আমি অস্বীকার করি না। Surplus energy theory বা Repetition compulsion theoryতে বিশ্বাস আমার কারও চেয়ে কম নয়। কিন্তু এ তো খেলাধুলো করা নয়, খেলা দেখা। ধাতুটা 'ক্রু' থেকে 'ক্রুশ্'-এতে রূপ নিয়েছে, তাই আপত্তি। তাও পরিমিতি বোধ থাকলেও না হয় কথা ছিল। একটা শীল্ড ফাইন্যাল দেখবার জন্যে দুই দিন গড়ের মাঠে যাযাবরী বৃত্তি নিয়ে কাটালে আপত্তি করবেন না? 'আমেন' আর 'সাত্তারের' মধ্যে লেফ্‌ট্ ইনে কে খেলা, তাই নিয়ে তর্ক যদি শেষে হাতাহাতিতে পৌঁছয় তাহলে আকবর-আওরঙ্গজেবে এত অল্প জ্ঞান কেন? একি শুধু প্রতিভার অভাব, না, আর কিছু? হাজারের টেস্ট লেকুচির তালিকা যাদের আঙুলের গাঁটে, অষ্ট্রেলিয়ার মিলার লিওওয়ালের 'বোলিং এভারেজ' যাদের কণ্ঠস্থ, তারা লেখাপড়ায় এত পিছ-পা কেন? 'গড়ের মাঠ' 'খেলার মাঠ' 'রূপালি' 'রূপমঞ্চ' যাদের হাত থেকে নামতে চায় না, পুঁথি তারা খুলবে কেন? খেলায় আমার আপত্তি নেই, আপত্তি আতিশয্যে। তবে, অনেকে বলবেন, পড়ায় কারিকুলামে একটু আধটু এসবের বিশেষ দিলেও তো পারেন। জানি না তা সম্ভব কিনা।

তারপর আছে রেডিও। দোকানে বাজারে ঘরে রেডিও আজ সর্বগামী। সবে সুরু করেছে কোন ছেলে, A. B. C. একটি ত্রিভুজ, অমনি পাশের বাড়ী থেকে ভেসে এল গায়কের কণ্ঠে 'কোন এক গাঁয়ের বধূ', ব্যস্! ত্রিভুজ পুঁথিচাপা রইল,

ছেলেটি তন্ময় হয়ে সেই ঘুঘুডাকা গাঁয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। দুপুরে প্রায়ই থাকে অনুযোগের আদর, তখন শত অনুযোগেও বাবাজীবনদের পড়ার রাজ্যে ঘরে রাখা যাবে না। বিদ্যার্থীমণ্ডল যা তাদেরই বিশেষ অনুষ্ঠান, তাকেও আজকের বিদ্যার্থীরা অর্থহীন বলেই মনে করে।

এ ছাড়া বারোয়ারী উৎসব অনুষ্ঠানের ঠ্যালা তো আছেই। চাঁদা আদায়, আয়োজন ইত্যাদিতে মেতে থাকতে আপত্তি নেই কারুর। এ্যামেচিকারায় কায়দা করে রাখবে উৎসাহকে। পাড়ায় পুজো থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের হীরের টুকরো ছেলের পক্ষেও জ্ঞানসাধনায় একাগ্র থাকা সম্ভব নয়। 'সারেলাল্লা' শুনে বৃদ্ধেরা যতই খাপ্পা হয়ে উঠুন না কেন, সদ্যোজাত বাঙালী সন্তানের রক্তে এই গান নাচন না জাগিয়ে পারে না।

এ সব ছাড়া আছে রাজনীতি, আছে স্লাব। সভা সমিতি থাকলে রাজনীতির স্লোগান ছাড়তে ছাড়তে ধর্মঘট করে কোন এক পার্ক বা ময়দানে জমায়েত হতে কোন ছেলেরই আপত্তি থাকে না। আর আজকের বহু-দল-কণ্টকিত বাংলায় যেখানে শিক্ষক বা অধ্যাপকেরা দল গড়তে তৎপর, সেখানে ছাত্রদের চিত্ত-বিক্ষোভ এমন কিছু মারাত্মক ব্যাপার বলে মনে না হওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক বিদ্যালয়ে শ্রেণী উন্নয়ন 'জলবৎ-তরলং' হওয়ায় ছাত্রগণ সেখানে গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াতে দ্বিধা বোধ করে না। ক্লাসের পড়াতে তাই তাদের মন বসে না, বাইরের পৃথিবী দু'হাত দিয়ে হাতছানি দিচ্ছে দিনরাত। আর আছে গৃহশিক্ষকের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। যারা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে তাদের বিদ্যালয়ের পড়াশোনার উপরে গুরুত্ব না দিলেও চলে, কারণ বাড়ীতে একজন আছেন। স্বভাবতই এ সব ছেলেরা পাঠ-বিমুখ হয়, কাজেই ব্যাপক কন্ট্রোলের দোহাই দিয়ে যারা ছাত্রদের চিত্ত-বিক্ষেপের সাফাই গাইতে চান, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, ওটা মনকে চোখ ঠারবার একটা উপায় হলেও আসল সমস্যা অত সহজে এড়িয়ে যাবার নয়। অভিভাবকদের দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁরা আজও সচেতন হতে পারেন নি। ছাত্রজীবনে বিপর্যয় আনতে স্কুল আর গৃহের কুপ্রভাবই প্রধানত উল্লেখযোগ্য। গৃহের পরিবেশ যদি অনুকূল না হয়, গৃহের শাসন যদি সদাজাগ্রত না হয় এবং সামাজিক পরিবেশে যদি ক্ষতিকারক উপাদান বীভৎস ভাবেই জড়ো হতে থাকে তাহলে ছেলেদের পাঠে বিরক্তি দূর করা কোনও শিক্ষকের পক্ষেই সম্ভব হবে না। আবার বিদ্যালয়ের পাঠন-পদ্ধতিতে অভিনবত্ব বা নূতন প্রাণ যদি সঞ্চারিত না হয়, Extracurricular ব্যবস্থা বেশ সুসমঞ্জস ভাবে যদি পাঠনার সহায়ক রূপে প্রবর্তন করা না যায়, এবং সন্তানদের সমাজ-সংগঠকের দৃষ্টি এবং বলিষ্ঠ কর্মপ্রেরণায় আমরা যদি শিক্ষাকার্য চালাতে না পারি, তাহলে ছাত্রদের মধ্যে অসংযম, দুর্নীতি বা অন্যায়ের এই বন্যাকে রোধ করা যাবে না। জাতীয় যুবশক্তির এই ভাঙন রোধ করতে সকলেরই সর্বাত্মক প্রয়াস করা উচিত।

রাষ্ট্র ও শিক্ষা

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে যদি প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করি তবে দেখিতে পাই যে পূর্বে পণ্ডিতদের ঘরে ঘরে একটা বিদ্যালয়ের মত ছিল, সেখানে ছেলেরা পিতার নিকটই মোটামুটি বিদ্যালাভ করিত। উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষায়তনের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। নালন্দার মত বিদ্যাকেন্দ্রে দূর দূর হইতে জ্ঞানপিপাসুরা অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়া সমবেত হইত এবং যথার্থ বিদ্যা তাহারাই লাভ করিত। যখন রেলপথ হয় নাই, দূরদেশ যাত্রা যখন অত্যন্ত দুঃখময় ও বিপদসঙ্কুল ছিল, তখনও ছাত্রেরা বিদ্যালাভের জন্য বাঙ্গালা হইতে সুদূর মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থানে যাইত, শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপ আসিত এবং সেই কালোপযোগী যাবতীয় বিদ্যা আহরণ করিয়া আনিত। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ কামনা করিয়া তাহারা পড়িতে যাইত না, যাইত শুধু বিদ্যালাভের জন্য. ঐরূপ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মাণীর ছাত্রেরা ইটালি ও স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রতি ধাবিত হইত। পুস্তক নকল করা কঠিন কার্য ছিল, সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রেরা গুরুর নিকট শুধু পাঠ শুনিয়া লইত এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন* দ্বারা জ্ঞানলাভ করিত। আজকার মত লিখিত পরীক্ষা ছিল না। গুরুর সমক্ষে ছাত্রদের সঙ্গে 'শাস্ত্রবিচার' করিয়া উত্তীর্ণ হইলে তাহারা উপাধি লাভ করিত। মৌখিক পরীক্ষায় চুরি চলে না। বরং উহাতে উত্তরের promptness বা ক্ষিপ্রতা বুঝিতে পারা যাইত। আজকাল যেমন প্রশ্নে বহু বিকল্প (alternatives) থাকে, সেরূপ থাকিত না। বৈকল্পিক প্রশ্ন থাকিবে জানিয়া আজকাল অনেক পরীক্ষার্থী পাঠ্যক্রমের অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ ছাড়িয়াই দেয়, ফলে কোন বিষয়েই তাহাদের জ্ঞান পুরা হয় না। আজকাল কোন ছাত্রই জ্ঞান চাহে না, চাহে সস্তা পাস। কোন্ বিষয় তাহার নিজের পক্ষে, পরিবারের পক্ষে বা সমাজের পক্ষে হিতকর তাহা না দেখিয়া শুধু এরূপ বিষয় নির্বাচন করে যাহাতে পাস করা সহজ। আর যতই স্কুল বাড়িতেছে, যতই লোকের ঘরে ঘরে বিদ্যা বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে, ততই মা সরস্বতী যেন ভয়ে পিছাইয়া যাইতেছেন। অথচ যখন বিদ্যা বিশেষ জাতির বা ঘরানার মধ্যে নিবদ্ধ ছিল তখন তাহাদের কাছ হইতে বিদ্যা আহরণ করিতে লোকে কতই না কৌশল অবলম্বন করিত। 'বিদ্যাই শক্তি' একথা প্রাচীনেরা বুঝিয়াছিলেন। গ্রীক পুরাণে এক কাহিনী আছে, যে, যখন মানুষ জানিতে পারিল যে কতগুলি বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াই দেবতারা মানুষের চেয়ে বেশী শক্তিমান্ হইয়াছেন বা মানুষের উপর প্রভুত্ব করিতেছেন, তখন এক অসম সাহসী মানুষ ছদ্মবেশে স্বর্গে গিয়া ঐ বিদ্যার কিয়দংশ চুরি করিয়া আনে। পুরোহিত শ্রেণী বহুদিন বিদ্যাকে যত্নের সহিত নিজেদের মধ্যে সুরক্ষিত রাখিত, পাছে সাধারণ লোকে তাহা শিখিয়া তাহাদের প্রভুত্ব অস্বীকার করে। সঙ্গীতের দুই একটি উচ্চ বিষয় যাহা কোন বিশেষ ঘরানায়

---

* নিদিধ্যাসন শুধু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য। কিন্তু নানাবিধ অপরা বিদ্যার জন্যও পাঠের 'মনন' এক আবশ্যক ধাপ, যাহা বর্তমানে ছাত্রেরা করে না। ছাত্রদের কর্তব্য পুস্তক বন্ধ রাখিয়া প্রতিদিনের পাঠ কিছুকাল মনন করা এবং ভাবা, আজ কি কি নূতন বিষয় শিখিয়াছি।

নিজস্ব, তাহা তাহারা সহজে কাহাকেও দেয় না। তবু দেখিয়াছি সঙ্গীত-প্রেমী লোক দূর দূর হইতে আসিয়া তাহাদের পিছনে লাগিয়া থাকে। এরূপ নিষ্ঠা ছাড়া বিদ্যালাভ হয় না। এখনও কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে কয়েকটি মাত্র সঙ্গীত বিদ্যালয় আছে এবং যথার্থ বিদ্যার্থীরা ত্রিপুরা হইতেও লক্ষ্ণৌ গিয়া উপযুক্ত গুরুকে ধরে। সুযোগ্য ছাত্র পাইলে গুরুও প্রাণ খুলিয়া তাহাকে শিক্ষা দেন। আজ যদি সমস্ত স্কুলে সঙ্গীতকে এক বাধ্যতামূলক বিষয় করা হয় তবে ইহার আর কদর থাকিবে না এবং অধিকাংশ ছাত্র ও অধ্যাপকের পক্ষে ইহা একটা প্রকাণ্ড পণ্ডশ্রমে পরিণত হইবে।

নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে পরিপূর্ণ মানব (Homo Sapiens) যখন প্রথমে ধরাধামে বিবর্তিত হয় তখন হইতে আজ পর্যন্ত মানবের বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞান-লাভের শক্তি মোটেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। কমিয়াছে কিনা ঠিক বলিতে পারি না, তবে যে বাড়ে নাই তাহা আমরা শিক্ষকেরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। পূর্বজন্মের ক্রমাগত সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছু কিছু নূতন আবিষ্কার মিলিত হইয়াই মানবজাতির বর্তমান উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে। তৎসহ কতকগুলি সামাজিক কারণ মিলিত হইয়া বর্তমান মানবকে কিছু wide outlook বা উদার দৃষ্টি দিয়াছে যাহাকে অনেকে ভুলক্রমে মানবের বুদ্ধির উন্নতি বলিয়া মনে করে। সুতরাং ২০০০ বৎসর পূর্বে যদি জনসংখ্যার শতকরা দুই ভাগ উচ্চ শিক্ষার অধিকারী ছিল তো আজও তাহাই আছে। অতএব যখন সমস্ত জিলায় একটি মাত্র হাই স্কুল ছিল যাহাতে বিদ্যার্থীরা দূর গ্রাম হইতে সমবেত হইত এবং অধিকারীরা শুধু যোগ্য ছাত্রদের নির্বাচন করিয়া লইতে পারিতেন, তখন হয়তো শতকরা ৮০ পাসের হার সেখানে সম্ভব ছিল। কিন্তু এখন গ্রামে গ্রামে স্কুল খোলায় শতকরা ৩০জন পাস দেখানও কঠিন হইয়াছে। বিশেষজ্ঞ মনো-বৈজ্ঞানিক দ্বারা ছেলেদের মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করাইয়া তদনুসারে শিক্ষাদান করিলে হয়ত পার্সেন্টেজ কিছু বাড়ান যায়, কিন্তু অত অর্থব্যয় আমাদের দেশে পোষাইবে না। তারপর সকলেই যদি শিক্ষিত হয়, তবে শ্রমিকের কাজ কাহারা করিবে? জনগণের মধ্যে শ্রমের মর্যাদাবোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত হওয়ার পূর্বে সামূহিক শিক্ষার mass education প্রবর্তন 'ঘোড়ার আগে গাড়ি জোতার' সমান হইবে। স্কুলে একবার আসিলেই উহার শেষ পর্যন্ত দেখিতে হইবে, এ ধারণা দূর করিতে হইবে। কোন ছাত্রের ম্যাট্রিক পাসের খবর পাইলেই আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, "কোন্ কলেজে পড়িবে"? যেন ম্যাট্রিকের পর আই এ, ও তাহার পর বি-এ, ইত্যাদি একটা চিরস্থায়ী পথ পড়িয়া আছে। যতদূর সম্ভব পরীক্ষা শ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া কার্যব্যপদেশে সহরে গমন, ইহাই সকলের চরম পুরুষার্থ। যে ঘরে কৃষিকার্য দেখাশুনা করিয়া উক্ত কেরাণীদের চেয়ে বেশিও রোজগার করে, সেও আক্ষেপ করে, "কি করিব? বসিয়াই আছি!"

এমন কতকগুলি বিষয় হাইস্কুলে পড়ান হয় যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে মোটেই দরকারি নয়। স্কুল কলেজে ৭।৮ বৎসর পাঠ্য কবিতাগুলি পড়িয়াও যাহার কাব্যে রুচি জন্মিল না এবং যে অবসর কালে কাব্যপাঠ না করিয়া শতরঞ্জ খেলে, তাহার কখনও কাব্যপাঠ উচিত হইয়াছে কি? ছয় বৎসর ইংরেজি পড়ার পরেও যে ইংরেজিতে শতকরা ছয় নম্বর পায় তাহার এ বিড়ম্বনা কেন? জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি বিষয় সাধারণ লোকের পক্ষে কোন্ কাজে আসে? বিশেষত যে ছাত্র একটি অতি সহজ জ্যামিতিক 'অতিরিক্ত'ও (extra deduction) নিজে সমাধান করিতে পারিল না অথচ মুখস্থ করিয়া জ্যামিতিতে পাস্ করিয়া গেল, তাহার সম্বন্ধে বলিতেই হইবে যে উক্ত বিষয়ে

চেষ্টা করা তাহার উচিত হয় নাই এবং ইহাতে সে যে সময় লাগাইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে। পূর্বে আমাদের দেশের ছাত্রেরা যাকরণ সমাপ্ত করিয়াই ন্যায়শাস্ত্র পড়িত। আজকাল অনেকেই বলেন যে ঐ শাস্ত্র সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অল্পসংখ্যক লোককে উচ্চতর গণিতে ও বিজ্ঞানে সাহায্য করা ছাড়া জ্যামিতিও সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। অথবা mental discipline এর জন্য উভয়েরই তুল্য প্রয়োজন। কিন্তু তাহা, যে উহার আলোচনায় আনন্দ পায় তাহার জন্যই না? অপরের পক্ষে "খরশ্চন্দনভারগ্রাহী ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য"। ১৯০০ হইতে বিহারে অষ্টম শ্রেণীতেই Trigonometry, Physics, Chemistry প্রভৃতি আরম্ভ করান হইয়াছে এবং তদুপলক্ষে প্রত্যেক স্কুলে বহু টাকার যন্ত্রপাতি রাখিতে হইতেছে। 'প্রকৃতি পাঠ' শিশুদের উপযুক্ত হইলেও আমি Experimental Science কখনও উপযুক্ত মনে করি না। গ্রামাঞ্চলে স্কুলগুলি হইতে এরূপ বিষয় সযত্নে পরিহার করিতে হইবে, যাহার গ্রামাজীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। মেধাবী ছাত্রেরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ পাক, ইহা আমাদের দেখিতে হইবে, সেইরূপ backward ছেলেদের যাহাতে 'শিক্ষার' বিড়ম্বনা ভোগ করিতে না হয় তাহাও দেখিতে হইবে। ফেল করা ছেলে, যে উচ্চশিক্ষার অধিকারী বলিয়া গণ্য হইল না, সে ও তাহার অভিভাবকেরা মনে করেন যে তাহার জীবনই নষ্ট হইল। অথচ ইহাদের মধ্যেই কত ভাবী বিদ্যুৎ, বালমিকি, কালিদাস ও কাবিয়াল্লা পড়িয়া আছে, কে জানে? বহু কলেজে কমার্স কোর্স খুলিয়াছে এবং আমার কৃতপূর্ব ছাত্রদের অনেকে কমার্স পড়ে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, B. Com পাস করিয়া কি করিবে? একটি 'আপরওয়ালার' দ্বারে চাকুরি করিবে তো? তার চেয়ে নিজেই কেন 'আপরওয়ালা' হও না, যে কোন পাসই নয়।" প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন, "সৌভাগ্যক্রমে রাজেন্দ্রনাথ ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় ফেল করেন, তাই আজ তিনি আর এন্ মুখার্জী। পাস করিলে বড় জোর ৪০০৲ মাহিনার সরকারি চাকুরি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।" বার্নার্ড শ বলিয়াছেন "My schooling did me more bad than good।" এম্-এ ক্লাসে যে সকল কবির বই পড়ান হয়, তাঁহারা কেহই এম্-এ পাস ছিলেন না। সুতরাং কোনরূপ পাস করাই চাই এই মোহ পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এই শিক্ষার মোহ আজকাল মেয়েদেরও পাইয়া বসিয়াছে। মেয়ের পিতামাতাও মনে করেন দুই একটা পাস না করাইয়া মেয়ের বিবাহ দিব না। কিন্তু জ্যামিতি, বীজগণিত প্রভৃতি যদি বহু ছেলের পক্ষে অনাবশ্যক হয় তো মেয়েদের পক্ষে আরও অনাবশ্যক ও অনুপযুক্ত। মেয়েদের বিশেষ রুচি, যোগ্যতা ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যক্রম প্রস্তুত হয় না। মেয়ে মেধাবিনী হইলে যে কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাইতে পারে এবং বি.এ, এম্-এ পাস করিয়া আই-সি-এস্ বা পি-এইচ-ডি পদবি লাভ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস করে। আর অমনী মেয়েরা একটা পাসের আশায় সর্বোৎকৃষ্ট সময় অতিক্রম করিয়া অবশেষে দেখে, বিবাহের বাজারে তাহাদের গ্রাহক নাই। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া ছোট মেয়েকে অনেকেই বিবাহ করিতে চাহিবে কিন্তু ঐ পর্যন্ত পড়া বয়স্থ মেয়েকে চাহিবে না।

উপরে যে সকল সমস্যার কথা বলিলাম সে সম্বন্ধে সরকার বা শিক্ষাবিভাগের অধিকারিবর্গ কতটা সচেতন বলিতে পারি না। বেশি উচ্চে আসন গ্রহণ করিলে নীচের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুসকল দৃষ্টিগোচর না হইবার কথা। ইহার ব্যাপক অনুসন্ধান

আবশ্যক। এই সকল সমস্যার প্রতিকারকল্পে আমার নিজের কয়েকটা suggestion দিতেছি।

(১) সমগ্র শিক্ষাসংস্থান অবৈতনিক করিতে হইবে। অর্থাভাবে দরিদ্র পিতা সন্তানের সুশিক্ষা দিতে পারিবেন না, অথচ ধনী পিতা ছেলেকে উচ্চ-শিক্ষার বিড়ম্বনায় বিলাত পাঠাইবেন, এরূপ না হয়। ইহাতে বুঝা যাইবে যে রাষ্ট্র নিজের সমলে সকলের শিক্ষার ভার লইয়াছে, এবং যাহাকে দরকার মনে করে বিলাতেও পাঠাইবে। সকলেরই প্রয়োজন মত অবৈতনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা লাভ মানবমাত্রের জন্মগত অধিকার বলিয়া রাষ্ট্রকে স্বীকার করিতে হইবে। এখন প্রশ্ন হইবে যে, সব শিক্ষাই অবৈতনিক হইলে এত টাকা সরকারের কোথা হইতে আসিবে। যে দেশে সমস্ত ভূমির ও কলকারখানার কেন্দ্রীকরণ প্রচলিত আছে, তাহার পক্ষে ইহা কোন প্রশ্নই নয়। ভারতেও অন্তত এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে যে, সমস্ত শিক্ষাব্যয় 'শিক্ষাকর' হইতে নির্বাহ হইবে। কাহার উপর উপর কত শিক্ষাকর ধার্য হইবে, তাহা করদাতার কয়টি ছেলে মেয়ে আছে, বা তাহারা স্কুলে পড়ে কিনা তাহার উপর নির্ভর করিবে না। ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে শিক্ষা রাষ্ট্রের প্রয়োজনের জন্য, কাহারও নিজস্ব স্বার্থের জন্য নহে।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা (অর্থাৎ মিডল পর্যন্ত) বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। ইহার এক উদ্দেশ্য, দেশের সকলেই সাক্ষর (literate) হয়, মানুষের অবশ্য জ্ঞাতব্য জিনিষগুলি (পড়া, লিখা, অঙ্ক এবং একটু ইতিহাস, ভূগোল স্বাস্থ্য ও সমাজবিজ্ঞান) জানে। অপর উদ্দেশ্য দেশের সমগ্র জনসংখ্যা হইতে উচ্চশিক্ষার উপযোগী ছাত্রদের বাছাই করা। যেহেতু যে কোন ছেলে মেয়ের কাছে কিছুমাত্র আশা করা যায়, তাহাকে রাষ্ট্র কিছুতেই হাত ছাড়া করিতে পারে না। সকলকেই আত্মবিকাশের সমান সুযোগ দিতে হইবে। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় অর্ধেক সময় শারীরিক ও অর্থকরী কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। সুতাকাটা, চাটাই বোনা, মাটির খেলনা তৈয়ারি প্রভৃতি কতকগুলি কাজ পরবর্তী জীবনের জন্য যতটা না হয়, হস্ত ও চক্ষুর ট্রেনিং এর জন্য ততটা দরকারি।

(৩) মিডল্ পরীক্ষাকে পুনরায় external examination-এ পরিণত করিতে হইবে। প্রশ্ন রচনা ও পরীক্ষার ভার স্থানীয় স্কুলের হাতে রাখিলে সমস্ত কোর্সটা পড়ানই হয় না। বরং বহু পক্ষপাত ও দুর্নীতির সৃষ্টি হইতে থাকিবে এবং স্থানীয় অভিভাবকদের চাপে এই পরীক্ষা এত শিথিল হইয়া যাইবে যে তাহাকে আর পরীক্ষা বলাই সঙ্গত হইবে না।

(৪) হাই স্কুলের সংখ্যা কমাইতে হইবে। কিন্তু কোন কোন অঞ্চলে হাই স্কুল থাকা উচিত, তাহার নির্ণয় রাষ্ট্রই করিবে। কিছুদিন পূর্বে আমরা বিহার শিক্ষাবিভাগ হইতে এক সার্কুলার পাইয়াছিলাম যাহার মূল মর্ম এই যে, সরকার ইহা চান না যে যত ছেলে মিডল্ পাস করে সকলেই হাইস্কুলে যায়। বরং বেশির ভাগ ছেলে নানারূপ 'হাতে কলমে' (Practical) কাজ শিখে বা টেক্‌নিক্যাল স্কুলগুলিতে পড়িতে যায়। কিন্তু এই আদেশ কার্যত কখনও প্রতিপালিত হয় নাই। মিডল্ পাস ছেলেরাও আসিয়া অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হইতেছে। আমার এই অভিমত যে, যত ছেলে মিডল্ পরীক্ষা দেয়, তাহার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্রের হাইস্কুলে প্রবেশাধিকার থাকে।

(৫) বাকি ছেলেদের যদি শিক্ষা দিতেই হয় তবে তাহাদের জন্য এরূপ স্কুল বা প্রতিষ্ঠান খুলিতে হইবে যেখানে তাহারা শ্রমের কাজ শিখিতে পারে। অর্থাৎ অধিক সংখ্যায় Post-Basic ও Technical Institutes খুলিতে হইবে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে গ্রামের প্রয়োজনগুলিই আগে

রাখিতে হইবে। প্রত্যেক স্কুলে অন্তত একজন আধুনিক কৃষিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিবেন। যদিও এখানে প্রায় তিন চতুর্থাংশ সময় শ্রমের জন্যই ব্যয়িত হইবে, তথাপি যাহাতে ছেলেরা লেখাপড়া একেবারে ভুলিয়া না যায় সেজন্য কিছুকাল সাহিত্য, অঙ্ক, পত্র-দলিলাদি লেখা, সংবাদপত্র পাঠ ও নাগরিক অধিকার প্রভৃতি শিখান হইবে। মিডল্ পরীক্ষায় বা হাইস্কুলের কোন ক্লাসের পরীক্ষায় একবার ফেল করিলে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ফেল করিলে তাহাদের এই সকল উত্তর বুনিয়াদী স্কুলে যাইতে হইবে।

(৬) আইন করিয়া টিউশানি, পড়া বা পড়ান, উঠাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু তৎপরিবর্তে শিক্ষকদের এরূপ বেতন দিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের টিউশানির কোন দরকারই থাকে না। আমার মতে টিউটারদের ক্রমশ মনুষ্যত্বই লোপ পায়, কারণ তাঁহারা বিদ্যা ব্যবসায়ী হইলেও অধ্যয়ন বা self-culture এর কোন সময়ই পান না। কোন বিভাগেই লোকের কাজের সময় সপ্তাহে ৬×৬=৩৬এর বেশী হওয়া উচিত নয়। যদিও সকলেই পরোপকারের জন্য যত সময় চান কাজ করিতে পারেন, কিন্তু অধিক উপার্জনের জন্য অধিক কাজ যেন কেহ না করেন। ছাত্রোত্তর জীবনে যাঁহার ইচ্ছা সঙ্গীত, বিদেশী ভাষা প্রভৃতি শেখার জন্য টিউটার নিযুক্ত করিতে পারেন।

(৭) ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে কোন স্কুলের শিক্ষক বা অধিকারিবর্গের যাহাতে কোনরূপ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট না থাকে, তাহা করিতে হইবে। জিলা স্কুলগুলি ছাত্রদের 'বাজাইয়া' লইতে পারে। তাহাদের ছাত্রসংখ্যা ১০০ হউক বা ৫০০ হউক, তাহাতে তাহাদের কোন স্বার্থ নাই। ছাত্রসংখ্যা অতিরিক্ত কমিয়া গেলে সেখান হইতে স্কুল উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক স্কুলের সংবিধান এইরূপই হওয়া উচিত। এবং সব স্কুলই জিলা স্কুলের পর্যায়ে আনা সরকারের কর্তব্য। যদি কোন বেসরকারি স্কুল থাকে তো প্রতিষ্ঠাতার আদর্শানুযায়ী তাহার পাঠ্যক্রমও ভিন্ন হইবে (যথা শান্তিনিকেতন)।

(৮) পরিদর্শকদের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে, যাহাতে তাঁহারা স্ব স্ব এলাকার স্কুলগুলিতে অনুষ্ঠিত দুর্নীতিগুলি লৌহ হস্তে দমন করিতে পারেন।

কলেজের শিক্ষা সম্বন্ধেও উক্ত কথা গুলি খাটিবে। ম্যাট্রিকুলেশন বা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাসের পর অধিকাংশ ছাত্রকে নানাবিধ ব্যবহারিক কাজে লইয়া যাইতে হইবে। শুধু যাহারা সাধারণ দিকে উৎকর্ষ দেখাইবে এরূপ আশা করা যায়, তাহারাই কলেজে পড়িবে। রাষ্ট্রের জন্য প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষাগুলি ঐ বিশেষজ্ঞ প্রস্তুতের জন্য।

সর্বশেষে প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই এই প্রবন্ধ শেষ করিব। পৃথিবীতে জ্ঞাতব্য বস্তু অনন্ত। স্কুলে দুই চারিখানা পাঠ্য পুস্তক পড়িলেই বিদ্যা সমাপ্ত হয় না। কোন ভাষার উপর দখল জন্মাইতে হইলে দুই এক খানা পাঠ্য পুস্তক কতটুকু সাহায্য করিবে? যথার্থ বিদ্বান হইতে হইলে মনুষ্যকে তো আমরণ 'ছাত্র' হইয়াই থাকিতে হইবে। ছাত্রজীবনে নিয়ম পূর্বক (systematically) শিক্ষাকে গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখা হয়; কিন্তু ছাত্রোত্তর জীবনে মনুষ্য নিজ নিজ রুচি অনুসারে স্বাধীনভাবে জ্ঞানভাণ্ডার বাড়াইতে পারে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বলিয়াছেন, "ছাত্রজীবন অতিক্রম করিয়াই মানুষের প্রকৃত বিদ্যালাভ আরম্ভ হয়।" এরূপ বহু লোকের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যাঁহাদের ছাত্রজীবন মোটেই উজ্জ্বল ছিল না, কিন্তু উত্তরকালে তাঁহারা যশস্বী পণ্ডিত বা সাহিত্যিক রূপে পরিগণিত

হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ, বার্ণার্ড শ, ফ্যারাডে, এডিসন প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

আমাদের রুচি যদি পরিমার্জিত না হইল তো দশটা পরীক্ষায় পাস করা পণ্ডশ্রম মাত্র। কাব্যকলা, যাহার উদ্দেশ্যই সৌন্দর্যসৃষ্টি, তাহা আধুনিক শিক্ষিত পাঠকদিগকেও আকৃষ্ট করে না। স্কুল কলেজে বছরের পর বছর কঠিন পরিশ্রম করিয়া ইংরেজি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা যে শিক্ষা করা হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্যই তো ঐ সকল ভাষার প্রবেশের জন্য, যাহাতে বড় হইয়া উহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি নিজে অধ্যয়ন করিতে পারা যায়। নতুবা এত পরিশ্রম তো বৃথাই মনে করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে পাই দেশের যুবকেরা অবসর সময় প্রায়ই তাস-পাশা খেলিয়া কাটাইয়া থাকে। বড় জোর কেহ উপন্যাসপাঠ বা সাময়িক রাজনীতি চর্চা করিয়া কাটায়। গম্ভীর (serious) বিষয়ের অধ্যয়নে খুব কম লোকেরই উৎসাহ দেখা যায়। ছাত্র জীবনের সেখা বিষয়গুলিও তাহারা এই সময় ভুলিতে আরম্ভ করে। কোন প্রশ্ন উঠিলে বলে, "হাঁ, ছাত্র জীবনে ঐরূপ কোন জিনিষ পড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহা কি এখনও মনে আছে?"

'বয়স্কদের শিক্ষা' বলিলে আমরা সাধারণত নিরক্ষর বয়স্কদের 'ক, খ' পড়ানই বুঝি। ইহাও দরকারি জিনিষ, কারণ রাষ্ট্রের জন্য যে কোন নাগরিকই নিরক্ষর না থাকে ইহা প্রয়োজন কিন্তু শিক্ষিতদের মধ্যে শিক্ষার ধারা বজায় রাখার জন্য নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে সরকার হইতে পুস্তকালয় খোলা উচিত। কিন্তু বহু উত্তম পুস্তকালয়েরও সদ্ব্যবহার মোটেই হয় না। বয়স্ক শিক্ষার আর একটি ভাল উপায় হইল যে, শিক্ষিত ব্যক্তিরা মিলিয়া সর্বত্র ক্লাব, মিলন মন্দির বা আলোচনা সভার প্রতিষ্ঠা করিবে এবং প্রতি রবিবার বা মাসে দুইবার বা কমপক্ষে মাসে একবার তথায় মিলিত হইবে। এই ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাষার ও বিষয়ে বিদ্বান্ প্রতিনিধি থাকিবেন। পৃথক্ গৃহের অভাব হইলে এক এক দিন এক এক সভ্যের ঘরেই কোন পূর্ব নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রতিনিধি কিছু আলোকপাত করিয়া দিবেন এবং অন্যান্য সভ্যেরা আবশ্যকমত নোট করিবেন ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। গৃহস্বামীই সেদিনকার মত অতিথিবর্গকে জলযোগে আপ্যায়িত করিবেন। আমার মতে আজকাল মুদ্রিত অক্ষরের ও চক্ষুর ব্যবহার অত্যধিক হইতেছে। শুধু শ্রবণ দ্বারা জ্ঞানলাভের জন্য কিছু সময় দেওয়া কর্তব্য। একজন যাহা পড়িয়া আনন্দ পাইবেন, পর্যায়ক্রমে সেই আনন্দের কিয়দংশ বন্ধুবান্ধবদিগকে বিতরণ করিবেন। সরকারের কর্তব্য এতদর্থে লাইব্রেরি গৃহেই রেডিও ও মিলন মন্দিরের ব্যবস্থা করা।

আজকাল কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্মিলন এবং নগরে নগরে উহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে। আমি ইহার নিন্দা করি না। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানে সাধারণত বৎসরে দুই এক বার বৈঠক হয়, তদুপলক্ষে দূর দূর হইতে সাহিত্যিক ও বক্তা আসেন যাঁহাদের অভ্যর্থনাদিতে বহু খরচ হয়। অতঃপর বক্তৃতা প্রবন্ধপাঠ, কবিতাপাঠ ও করতালি ধ্বনিতে প্যাণ্ডেল গুঞ্জরিত হয়। 'ক্লাব' বলিতে আমার সেরূপ অভিপ্রায় নয়। আমাদের দেশে সাহিত্য ও রাজনীতি ছাড়া প্রায় কোন সভা বা বক্তৃতাই হয় না। কিন্তু ক্লাবে সকল বিষয়েরই আলোচনা হইতে পারে—যথা, ডারুইনের বিবর্তনবাদ, ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব, কার্ল মার্ক্সের অর্থনীতি, কপিল বা কাণ্টের দার্শনিক মত, ইত্যাদি। সাহিত্য সমিতিগুলিতে শুধু নিজ ভাষার সাহিত্যেরই চর্চা হয়, কিন্তু উপরি-কল্পিত ক্লাবগুলিতে এক এক জন ইংরেজি, সংস্কৃত, হিব্রু, ফারসী প্রভৃতি ভাষায় অভিজ্ঞ সভ্য রাখিলে ঐসব সাহিত্যেরও অনেক কিছু শুনা যাইবে যথা, মেঘদূতের কিছু নির্বাচিত শ্লোকের অনুবাদ, মুদ্রারাক্ষসের আখ্যানভাগ, কবীরের নির্গুণ বাদ,

সুফীদের কাব্যসাধনা ইত্যাদি। বিদ্যা বা সংস্কৃতি কোন দেশের নিজস্ব নয়। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা নিজেদের জ্ঞানকে শুধু স্বদেশ বা স্বজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন না। কিছুকাল ভারতে থাকিয়াই অনেক ইংরেজ ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ভিন্টারনিৎস ভারতে না আসিয়াই তিনটি বড় বড় খণ্ডে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখিয়াছেন। কোন ব্যক্তি হয়তো ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাস লিখিলেন, যিনি ভারতীয়ও নন, চিকিৎসকও নন। ছাত্রজীবনে হয়তো চিকিৎসা বা ইতিহাস কিছুই তাঁহার বিশেষ বিষয় ছিল না এবং পেশাতেও হয়তো ছিলেন কোন প্রদেশের গভর্নর বা জজ. জার্মাণীতে যাও তো দেখিবে, সেখানে যেমন বড় বড় সংস্কৃতে পণ্ডিত আছেন, সেরূপ বড় বড় আরবীতে পণ্ডিতও আছেন। প্রতিবেশী জাতির কিছুই শিখিব না, এইরূপ মনোভাব ভারতেও পূর্বে ছিল না। আলবেরুণী, আমীর খুসরু, ফৈজী, আবুল ফজল ও দারা শিকোহ সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন ও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফারসীতে তর্জমা করিয়াছেন। হিন্দুর মধ্যে ফারসীতে বিদ্বান্ সেদিন পর্যন্ত পাওয়া যাইত। রমাশঙ্কর, রতননাথ ও ব্রজনারায়ণ উর্দু কবি ছিলেন, আবার, মুহম্মদ জায়সী, রহিম ও রসখান হিন্দী কবি ছিলেন। সমস্ত সাম্প্রদায়িক ঝগড়ার মূলই তো misunderstanding বা একের অপরকে না বুঝা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ ভাবের আদান-প্রদান হইলে সমস্ত ঝগড়ার মূলচ্ছেদ হয়। বিশেষত বর্তমান জগতে বিশ্বমানবতার ভাব খুবই দরকারি। এই উদ্দেশ্যে সরকার হইতে যথেষ্ট সংখ্যায় public lectures এবং cultural contact centres খোলা কর্তব্য।

স্থানাভাবে নিরক্ষরদিগকে সাক্ষর করা সম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। তবে এই কাজ বহুল পরিমাণে ছাত্রদের উপরই ন্যস্ত করা উচিত। ছুটির দিনে তাহারা যাহাতে অধিক সংখ্যায় গ্রামের নিরক্ষর অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহারা যে শুধু শিক্ষক হিসাবেই গ্রামে যাইবে তাহা নহে, বরং অভিজ্ঞ কৃষকদের নিকট কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞান লোক সাহিত্য ও গ্রামগীত প্রভৃতিও শিখিতে পারিবে। গ্রামে গ্রামে নৈশ বিদ্যালয়ে অথবা কোন বড় গাছের নীচে যাহাতে লোক সমবেত হইয়া অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যরক্ষা নিবারণ, স্বাস্থ্যের নিয়ম, নাগরিকের অধিকার প্রভৃতি বিষয় শিখিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদিগের গ্রামে গ্রামে ঘোরার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

Education and Reconstruction. A collection of Essays. শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। মূল্য বারো আনা মাত্র।

শিক্ষা জগতে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহাশয়ের নাম অপরিচিত নহে। প্রবাসী ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

আলোচ্য পুস্তিকায় চারটি প্রবন্ধ (পূর্বে ইংরাজি পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল) একত্র সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা হইয়াছে, তাহাতে ভূমিকা ও উপসংহার হিসাবে দুইটি নূতনও জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, ফলে লেখাগুলি সংহতভাবে ও নূতন আকারে দেখা দিয়াছে। পৃষ্ঠায় ৬০-এর অধিক, কিন্তু ইহার ভাবনার গুরুত্ব আছে, অর্থাৎ পুস্তিকার ধার আছে।

শিক্ষার পুনর্গঠন কি ভাবে হইবে? আলোচ্য পুস্তিকার মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ যখন ইংরাজি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে মহাত্মাজীর প্রবর্তিত নয়ী তালিম রূপ গ্রহণ করিয়াছে ও করিতেছে। কাঠের কাজ, হাতের কাজ যে মানুষের বুদ্ধিকে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দৃঢ় করে, জীবনের সঙ্গে শিক্ষার যে অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ, নানা পরিবেশে লক্ষ্মীশ্বর বাবুর এবিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময়ে ওয়ার্ধার নব শিক্ষানীতি তাঁহার পক্ষে নবযুগের সূচনা করিল। পিতৃদত্ত মন্ত্র মহাত্মাজীর সংস্পর্শে আসিয়া শক্তিলাভ করিল। শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র গ্রামসেবার যে স্বপ্নকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা আজও বাস্তবে পরিণত হয় নাই, তাহা দুঃখের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু যে দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করিয়াছেন, দুঃখবৈভবের মধ্যেও তাহা উজ্জ্বল। "If we wish our villages to become once more living and pulsating, we have to begin our education with the actual necessities of life. No abstract object lessons can acquaint us with the actual business of life and of living. The importance of correlation of such subjects as the mother-tongue, general science, social studies etc, with constructive crafts can be grasped fully only if we grasp the implications of craft work in its natural, organized and scientific aspects."

অর্থাৎ, যদি আমরা আমাদের গ্রামে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার ও স্পন্দন দেখিতে চাই, তাহা হইলে জীবনের বাস্তব প্রয়োজন লইয়া শিক্ষা আরম্ভ করিতে হইবে। বস্তুনিরপেক্ষ পাঠ গ্রহণে আমাদের বাস্তবিক জীবনধর্ম ও বাঁচিবার ব্যাপারের সহিত পরিচিত করিবে না। মাতৃভাষা, সাধারণ বিজ্ঞান, সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতির সঙ্গে সৃষ্টিধর্মী শিল্পের সংযোগ সাধনের গুরুত্ব তখনই পুরাপুরি বোঝা যাইবে যখন আমরা শিল্পকাজের স্বাভাবিক, সংঘটিত ও বৈজ্ঞানিক রূপের অর্থ ও ব্যঞ্জনা বুঝিতে পারিব।

আমরা বুনিয়াদি শিক্ষার মধ্য হইতে সাধারণত craft work বাদ দিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা যে আদর্শ নহে, তাহা যে বিপদের অবস্থা, এই কথা আজ ভাল করিয়া বোঝার

প্রয়োজন হইয়াছে। লক্ষ্মীশ্বরবাবুর দৃষ্টি শিল্পের দিকে, কিন্তু সে শিল্প সৃষ্টিধর্মী গ্রামশিল্প, সে শিল্প —শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান। বিদেশ ভ্রমণ ও বিদেশে শিক্ষাগ্রহণ, তাঁহার শিক্ষাদত্ত ও অনুকূল পরিবেশে বর্ধিত বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে সবল করিয়াছে। সেই বুদ্ধি ও সেই বিশ্বাস ভারতবর্ষের শিক্ষাকর্মীদের মহাত্মাজী প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার অনুরাগী করিতে পারে। শিক্ষার নূতন ধারা দেশে বহাইতে হইলে এক আধ জনের নয়, সকল শিক্ষকেরই মানসিক চিন্তা ও বুদ্ধির পরিবর্তন প্রয়োজন, নতুবা আমরা এক পাও অগ্রসর হইতে পারিব না, তাহা এই কয় বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমাদের বোঝা উচিত। অল্পবয়সেই নূতন পথ গ্রহণের সাহস না জন্মাইলে পরবর্তী জীবনের চেষ্টা ও যত্ন যে ব্যর্থ হইবে সে কথা মনে রাখিলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার রূপ অবশ্যই বদলাইবে, এবং শিল্পের মাধ্যমেই, হাতে কলমে শিল্পশিক্ষা দিলেই তবে শিশুবয়স হইতে নূতন পথ গ্রহণের সাহস ও আত্মনির্ভরতা জন্মিবে; এবং তাহাই যে প্রকৃত শিক্ষার প্রবেশপথ, সেবিষয়ে বেশি বলা অবশ্যই বাহুল্য।

এই দিক দিয়া লক্ষ্মীশ্বর বাবুর বইখানি নব শিক্ষার অনুরাগী সকলকে মন করিয়া পড়িতে অনুরোধ করি।

আমাদের শিক্ষা। ডক্টর ক্ষেত্রপাল সাসমোহ প্রণীত। এ মুখার্জী এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা মাত্র। তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৫৮।

ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টর ঘোষের আমাদের শিক্ষা আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছে ও ইহার মধ্যে পুস্তকখানির তিনটি সংস্করণও মুদ্রিত হইয়াছে। "এমন একখানা বই যা পড়ে দেশের শিক্ষা-সমস্যাগুলো সম্বন্ধে মোটামুটি জানতে পারা যায় এবং সে সম্বন্ধে মতামতও গঠন কর্তে পারা যায়"— পাঠকেরা নিশ্চয়ই পড়িয়া উপকৃত হইবেন। সংস্করণ তিনটি ইহার উপযোগিতা সূচিত করিতেছে।

পুস্তকখানি চতুর্দশটি প্রবন্ধের সমষ্টি। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া বয়স্ক শিক্ষা পর্যন্ত বিভিন্ন ধারার আলোচনা ইহাতে আছে। কিন্তু যুগে যুগে যে পরিবর্তন হয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে পাঁচ বৎসরে তাহার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা দিয়াছে। ইতিমধ্যে রাধাকৃষ্ণন কমিশন হইয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য আলোচিত হইতেছে এবং ভাষা-শিক্ষা, বিশেষ করিয়া হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃতের সামঞ্জস্য কি করিয়া রক্ষা করা হইবে তাহার প্রতি নূতন করিয়া দৃষ্টি পড়িয়াছে ও পড়িতেছে। পাঁচ বৎসরের মধ্যেও এই যে পরিবর্তন তাহার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা তৃতীয় সংস্করণে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাইলে সুখী হইতাম। আমাদের মাধ্যমিক বোর্ড কত নূতন বিষয়ে হাত দিয়াছেন, আজ দুই বৎসর হইতেই পাওয়া যাইতেছে, এবং এ সব বিষয়ের ইঙ্গিত অধ্যক্ষ ঘোষের মত সুপণ্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে তাঁহার সুচিন্তিত মতামত পাইলে লোকে উপকৃত হইত, সন্দেহ নাই। যেমন দেখা যায়, কাযত সার্জেন্ট পরিকল্পনা সাধারণের মন হইতে ধুয়ে গিয়াছে, অথচ বিদ্যালয়ে কোন বয়সে কোন ভাষা শেখানো হইবে আজ তাহার আলোচনার গুরুত্ব বেশি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অপর পক্ষে একটা কথা বলিতে পারি, কালকের সমস্যা ও আজকের সমস্যা যে এক নয়, এই দিক দিয়া আমাদের দেশের শিক্ষাসমস্যা যে নূতন আকার ধারণ করিতেছে, তাহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে। এক হইলে বুঝিতাম, আমাদের অচলায়তন। এখন যত মন্থরগতিই হউক, বলিতে পারি সচলায়তন। আলোচ্য পুস্তকে সন্নিবিষ্ট 'পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনায়'

মধ্যে এখনকার পাঠক ভাবের কোনও কথা পাইবেন না। ভাবের খোরাকও পাইবেন কি না সন্দেহ। আমরা কি বলিতে পারি না যে, ইহাই হইল আমাদের জীবনে অগ্রগতির মাপ?

ভক্টর ঘোষের রচিত পরিভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। Handicapped ত্রৈব্যগ্রস্ত কেন? বাধাগ্রস্ত বলিলেই তো হয়। ত্রৈব্য কথাটার যে ব্যঞ্জনা তাহা বুঝিয়া গেলেও সাধারণ কথা হিসাবে বাধাগ্রস্ত অধিক উপযুক্ত বলিয়া মনে করি। Wastage অপচয় না হইয়া 'কাজিল' বা 'বাতিল', ইহাও ঠিক হয় নাই মনে হইতেছে। Priority সর্ব্বাগ্রাধিকার কেন? অগ্রাধিকার শুধু বলিলেও তো হইত। তেমনি youth movement যুব আন্দোলন, youth service যুব সেবা সংগঠন না করিয়া যুব সঙ্গঠন প্রচেষ্টা, সমূহ সেবা বিভাগ করার অর্থ স্পষ্টতর হইয়া উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। Employed 'সকার', বোধ হয় বেকার নয় এই অর্থে, কিন্তু 'কাজ পাইয়াছে' বলিলে লোকে বুঝিতে পারিত। Privilege বিশেষ অধিকার, না নির্বিচার অধিকার?

অনমতি বিস্তরেণ। ভক্টর ঘোষ যে বলিয়াছেন, 'এ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ব্যতীত কোন সন্তোষজনক ফল লাভ অসম্ভব' তাহা খুবই ঠিক কথা, সন্দেহ নাই; শিক্ষণশিক্ষার্থিন্ বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে যদি এরূপ সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছান, তবে তাহার মূল্য আছে, এবং সেই মূল্য যেন আমরা বুঝিতে পারি—আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনা ও বাস্তবে সেই পরিকল্পনাকে রূপায়িত করাই হইল স্বাধীন ভারতের কাজ। ভক্টর ঘোষের মন্তব্য শুধু প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধেই করা হইয়াছিল (৩২ পৃঃ), কিন্তু আজ তাহার যাপ্তি অধিকতর।

বুনিয়াদী শিক্ষা দ্বারা বিপ্লবাত্মক সমাজ সেবা

শ্রীসতীশ চন্দ্র দাসগুপ্ত প্রণীত।

খাদি প্রতিষ্ঠান

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূল্য চারি আনা।

অনধিক ষাট পৃষ্ঠার মধ্যে সতীশবাবু শিক্ষাতত্ত্বের আড়ম্বর না করিয়া সহজ সরল ভাষায় বুনিয়াদী শিক্ষায় অবলম্ব উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল শিক্ষা কি করিয়া সম্ভব তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। ভারতবর্ষের চতুরাশ্রয়ী সম্পদ—মানবতা, ভূমি, গাভী, কুটির শিল্প—অবলম্বন করিয়া এই বুনিয়াদী শিক্ষাকে প্রসারিত করিলে ভারত পুনরায় জগৎ-সভায় তাহার উপযুক্ত আসন পাইতে পারিবে। ভারতের অগ্রসর হইবার এই প্রশস্ত পথে অগ্রণী হইবার জন্য শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাইবে, সে প্রশ্নের উত্তর দিয়া সতীশ বাবু পুস্তিকাখানি সমাপ্ত করিয়াছেন। উত্তরটি সদুত্তর এবং তিনি যে ভিত্তির কথা বলিয়াছেন, অনুভূতির ভিত্তি, তাহার উপরই কর্মসৌধ নির্মাণ করিতে হইবে। "আজ চাই আপনাদের নিজেদের ভিতর সেই প্রেরণার অনুভূতি যাহা অসাধ্যসাধনে আদর্শবাদীকে মাতায়।"

পুস্তিকাখানির আর্থিক মূল্য চার আনা হইলেও যথার্থ মূল্য কম নয়।

শিক্ষা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ | ৭ম সংখ্যা

আলোচনা

মনীষি স্মরণে : জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় আমরা বাঙলা দেশের দুই মনস্বী শিক্ষাব্রতীকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করিতেছি। একজন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও অপরজন বাঙলার পুরুষসিংহ বলিয়া বিখ্যাত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ইহারা উভয়েই বাঙলা ও বাঙালীর নমস্য। চিন্তায় ও কর্মে ইহারা বাঙালীর জীবনধারায় ও বাঙলা দেশের শিক্ষাজগতে বিশেষ ছাপ রাখিয়া গিয়াছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যাবজ্জীবন পুরাকালের সরল জীবন যাপনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন ; মোটা খাওয়া, মোটা পরা, আহারে সংযম এবং উচ্চ জ্ঞানের অনুশীলনে তপস্যা—ইহাই ছিল তাঁহার পরিচয়। আর স্যর আশুতোষ তেজস্বিতায় ও বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে নূতন করিয়া গড়িবার শক্তিতে ভারতের আদর্শ স্থানীয়। বিংশ শতাব্দীর বাঙালী ইহাদের ভুলিলে তাহার নিজেরই অবমাননা।

এই সঙ্গে আরেক জনের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। বাঙলাদেশে একদিন মানুষের মত মানুষের অভাব ছিল না, ইহাদের নাম সেই কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। দেশবন্ধু ছিলেন খাঁটি বাঙালী। প্রতীচ্যের বিদ্যা তিনি আহরণ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের মর্মবাণী বাঙলার মাটি-জলের সঙ্গে বাঙালীর একান্ত নিজের সুরের সঙ্গে বাঁধা ছিল। শিক্ষা দীক্ষায়, স্বাদেশিকতায়, জাতীয়তায়, কর্মশক্তিতে, মহানুভবতায় তিনি বাঙালীর জন্য যে উন্নত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধার অর্ঘ্য অর্পণ করি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও আসন্ন সেনেট নির্বাচন

শীঘ্রই নূতন সংবিধান অনুযায়ী সেনেটের সমস্ত নির্বাচন হইবে। প্রার্থীগণ তোড়জোড় করিতেছেন। ভোট গ্রহণের দিন ২০শে জুলাই স্থির হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মহাশয় ভোট গণনা করিয়া ফলাফল নির্দেশ করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ যাহাতে গণতন্ত্র অনুযায়ী

চলে, এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্বাচকমণ্ডলী বহু ব্যাপক করা হইয়াছে। দেশের বিভিন্ন সংস্থাগুলি হইতে উপযুক্ত সদস্য নির্বাচিত হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজ ভাল ভাবে চলিবে আশা করা যায়। আজ দেশ যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন, তাহাতে এই নির্বাচনের উপর দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ভাল মন্দ অনেকখানি নির্ভর করিবে। আমরা আশা করি, সদস্য নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থ নয়, দেশের কল্যাণের কথাই বিবেচিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল :

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ ও আই. এস্ সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। পাশের হার এবার আই, এ পরীক্ষায় শতকরা ৩৪.১ আই, এস. সিতে শতকরা ৩৪.৮। গতবৎসরের তুলনায় সামান্যই পরিবর্তন দেখা গেল। পরীক্ষা দিয়াছিল মোট প্রায় কুড়ি হাজার, পাশ করিল মোট প্রায় সাত হাজার, বাকি সকলে পাশ করিতে পারিল না। বিফলমনোরথ ছাত্র-ছাত্রীদের কথাই মনে পড়িতেছে। অবশ্য আংশিক ভাবে এই অকৃতকার্যতা অনিবার্য, কিন্তু সেই অংশ যখন মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তখন তাহার কারণ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। যুবশক্তির এই অপচয়ের জন্য দায়ী কে, এবং কি, তাহা বিশেষজ্ঞদের ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা—মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ১৯৫০ সালের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। এই বৎসর পাশের হার শতকরা ৫৩.২—৫১,৯৮৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র হাজার খানেক। এই সংখ্যাটি আরও বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা কম দেখিলে আমরা সুখী হইতাম। ইহাদের সঙ্গে কলেজে প্রবেশ করা কঠকর, এবং প্রবেশ করিলেও অনেক স্থলেই দেখা গিয়াছে—পরবর্তী পরীক্ষায় ইহাদের ফল ভাল হয় না।

পূর্বের প্রবেশিকা বা বর্তমান স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্যক্রমের মধ্যে মস্ত এক ব্যবধান; এই ব্যবধান অতিক্রম করা নানা কারণেই দুঃসাধ্য। তাহার মধ্যে শিক্ষার মাধ্যম কারণটি অন্যতম। কলেজে আসিয়া অনেক ছেলে-মেয়েই অধ্যাপকের বক্তৃতা বুঝিতে পারে না, ইংরেজিতে একটানা কথা শোনার অভ্যাস জন্মে নাই, তার উপর বিষয়বস্তুও সম্পূর্ণ নূতন ও জটিল মনে হইতে থাকে। মুষ্টিমেয় ভাল ছাত্রছাত্রীর কথা ছাড়িয়া দিলে অধিকাংশেরই এই অবস্থা। আমাদের মনে হয়, কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ এ বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার কৃতী ছাত্র

বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাশীরাম দাস ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র শ্রীমান গদাধর বণ প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষ্ণনগর সেণ্টজন হাইস্কুলের দ্বিতীয় স্থান। মেয়েদের মধ্যে প্রথম হইয়াছে লেক বালিকা বিদ্যালয়ের মীরা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সব কৃতী ছাত্রছাত্রীকে আমরা আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানাই। জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় ইহাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হউক, ইহাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধিত হউক।

এভারেষ্ট বিজয়

তুষারমৌলি নগাধিপ হিমালয়ের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট যুগ যুগ ধরিয়া সমস্তদের মানুষকে আকর্ষণ করিয়াছে, আহ্বান জানাইয়াছে, কিন্তু এতকাল তাহার দুর্জয় মৌন ভঙ্গ হয় নাই। এভারেষ্ট ছিল অবিজিত, আপনার গৌরবে আপনি উদাসীন। কিন্তু মানুষের দুর্জয় সাহস, আকাশের সমান উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, অপরিমেয় অধ্যবসায় ও কষ্টসহিষ্ণুতা আজ সেই হিমগিরিকেও অতিক্রম করিয়াছে। সর্বোচ্চ শিখরে আজ মানুষের জয়পতাকা উড়িতেছে। কাল যাহা ছিল অসম্ভব, কল্পনার কথা, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

স্থান কাল বিজয়ী মানুষেরই জয় হইয়াছে। ইংলণ্ডবাসী জন হাণ্টের নেতৃত্বে এভারেস্ট ও টেনজিং শেরপা হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন।

এই দুর্গম অভিযানে যাঁহারা যাত্রী ছিলেন তাঁহারা সকলেই আমাদের অভিনন্দনীয়। কোন বিশেষ একজনের কৃতিত্বে আজ এভারেস্ট আরোহণ করা সম্ভব হয় নাই। ধাপে ধাপে বারে বারে যে অভিযাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরিয়া এই দুষ্কর কর্মে ব্রতী ছিলেন তাঁহাদের সকলের সমবেত চেষ্টাই আজ জয়কে সম্ভব করিয়াছে। আজ তাই বিজয়ীদলের পূর্ববর্তী দলসমূহকেও আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া যাহারা দুর্গমকে আয়ত্ত করিতে, দুর্লঙ্ঘ্যকে লাভ করিতে প্রয়াসী হয় তাহাদের সাহস ও বিশ্বাসই মানুষকে আশ্বাস দেয়।

আমরা বর্তমান অভিযানের নেতা ও বিজয়ী দলকে সমবেতভাবে অভিনন্দন জানাই, আর, বিশেষভাবে টেনজিং ও হিলারী দুই জনের গৌরবে আমরা গৌরব বোধ করিতেছি। আবার টেনজিং ভারতীয় বলিয়া আমাদের গৌরব ও আনন্দ আজ সমধিক। বাঙালী রাধানাথ সিকদার ও টেনজিং এই দুই সাহসী ভারতবাসীর দৃষ্টান্ত আমাদের যুবকদের মনে অদম্য সাহস ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলুক এবং মহৎ কর্মে প্রেরণা দিক।

পরলোকে শিক্ষাব্রতী

বিগত ২০শে মে আসামের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মনোমোহন মজুমদার মহাশয় ৬১বৎসর বয়সে তাঁহার শিলচরস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। আসাম শিক্ষা বিভাগের স্কুল সমূহের সহকারী পরিদর্শকের পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি শিলচরের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সেগুলির উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করেন। অধিকাপুর উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও শিলচরস্থ বালিকা বিদ্যালয় তাঁহারই চেষ্টায় স্থাপিত হয় ও তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই দুই বিদ্যালয়ের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। স্থানীয় গুরুচরণ কলেজ ও সুর্মাকুমার চতুষ্পাঠী, মহিলা কলেজ, জন-শিক্ষা সমিতি, স্কাউট দল প্রভৃতি সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রকল্যাণ সংঘের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

মজুমদার মহাশয়ের পৈত্রিক বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলা। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে শিক্ষাবিভাগের উচ্চে নিয়ে সর্বত্রই আপনার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যানুরাগী একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে আমরা তাঁহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

প্রথম শ্রেণীতে পাঠদান

[শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত]

পূর্বে এক প্রবন্ধে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। নিজে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে পরীক্ষামূলক কর্ম-কেন্দ্রিক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে নানা শ্রেণীতে পাঠদান করে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, প্রথম শ্রেণীতে পাঠদান করতে শিক্ষকেরা সব চেয়ে বেশি অসুবিধা বোধ করেন। তার কারণ হচ্ছে, এই শ্রেণীতে শিশুরা বাড়ি থেকে প্রথমে এসে ভর্তি হয় এবং গৃহ ও বিদ্যালয়ের ব্যবধান তাদের কাছে অত্যন্ত বড় বলেই বিদ্যালয়ের জীবনকে সহজ করা তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক বোধ হয়। তারপর বিদ্যালয়ের নূতন জীবনের সঙ্গে আসে লেখা, পড়া, অঙ্ক, যাদের সাথে কোন পরিচয়ই শিশুর পূর্বে ছিল না। অতএব সব কিছুর সামঞ্জস্য বিধান করে শিক্ষকের পক্ষে চলা অত্যন্ত কঠিন বলে বোধ হবে, এতে আর বিচিত্র কি। অন্যান্য শ্রেণীর শিশুর কতকগুলি অভ্যাস পূর্বেই গঠিত হয়েছে, এবং লেখা পড়া অঙ্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ ভিত্তি শিশুমনে দানা বেঁধে ওঠায় ফলে শিশুর অগ্রগতিতে শিক্ষকের সাহায্যদান অপেক্ষাকৃত সহজ বলে মনে হয়।

কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও পুরাতন প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ না করলেও প্রকৃত ব্যবধান হিসেবে, এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিশুদের শিক্ষা জীবন-বহির্ভূত নয়, লেখাপড়া ও অঙ্কের সঙ্গে শিশুজীবনের যতটুকু জ্ঞান ও কর্ম সেই বয়সের উপযুক্ত, তা শিশুর অবশ্য করণীয়। 'গুরুজনকে ভক্তি করিবে,' শুধু বইয়ের পাতায় নয়, শিশুর জীবনেও উহা অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত থাকে; পৌরকর্তব্য যা তাহা বিষয়ক অন্যান্য শিক্ষা বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, জীবনের অবশ্য পালনীয় নির্দেশ হিসেবে শিশুকে গ্রহণ করতে হয়। ঘরে বেঁধে শিশুকে নির্দেশ দেওয়া হয় না, সর্বোক্ত নির্দেশ কর্মের ভেতর দিয়ে শিশুর জীবনে অভ্যাসরূপে গঠিত হয়। অতএব কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে জীবন ও জীবনের জন্য প্রস্তুতি এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে শিশুকে চলতে হয় বলেই, প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে চালনা করা সবচেয়ে কঠিন কাজ বলে শিক্ষকের মনে হয়।

এই শ্রেণীতে বিদ্যালয়ে শিশু প্রথম আসে। প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন শিক্ষাই সে পায় নি, অতএব সে বিদ্যালয়ে এসে কিভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে, তাই তার কাছে হয় সমস্যা। এসমস্যা শুধু শিশুর নয়, শিক্ষকেরও, এবং তাঁর কাছে এ-সমস্যার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। কারণটা একটু খুলে বলছি। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে, সেখানে শিশুরা নাকি খুব বেশি স্বাধীনতা পায়, নিজের ইচ্ছামতো কাজ করতে পায়। স্বাধীনতাও শিশু পায়, শিশুর ইচ্ছাকেও সম্মান দেওয়া হয়, কিন্তু কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি করা হয় না। শিশুকে নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার ভেতর না রাখলে শিক্ষাদান সম্ভব হয় না। শিক্ষকের ইঙ্গিতপূর্ণ (suggestive) নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা দানের ফলেই শিশু শিক্ষায় একটা ধারা পেতে পারে, সুঅভ্যাস তার মধ্যে গঠিত হওয়া সম্ভব হয়, লেখাপড়ার দিকে শিশুমন একটা গতি পায়। অতএব শিক্ষকের দায়িত্ব কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে যথেষ্ট, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

সাধারণ প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব শুধু বইয়ের পাতার মধ্যেই নিবদ্ধ, কর্মকেন্দ্রিক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব তেমনি সীমাবদ্ধ বইয়ের বাইরে বহু দূরে প্রসারিত; কর্মের ধারা উভয়ের পক্ষে বিভিন্ন।

প্রচলিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক শিশুদের উপর বাইরের শাসন আরোপ করে শ্রেণীগত ভাবে শিক্ষা দিয়ে নিজের দৈনন্দিন কর্তব্য শেষ করেন, কিন্তু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষককে শিশুদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, আগ্রহ, ঔৎসুক্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে শিশুর সমগ্র জীবন গঠনে অগ্রসর হতে হয়। শিশুর কাজের মধ্যে থাকে আনন্দ, এবং তার মারফৎ শিশুরা শেখে স্বাস্থ্যনীতি, পৌরকর্তব্য, লেখাপড়া, অঙ্ক ইত্যাদি; শিশুর অজানিতে শিশুর মনের মধ্যে শিশুজীবনের কর্তব্যগুলি দানা বেঁধে ওঠে। এখানে শিশুর উপর বাইরের শাসন নেই, আছে কর্মের মধ্য দিয়ে ইঙ্গিত-পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা। কর্মে আনন্দ, এবং কর্ম-উদ্ভূত ক্লান্তির অপনোদনের যে ব্যবস্থা তাও আনন্দ-পূর্ণ, অতএব শিক্ষার রূপ শিশুদের কাছে ভীতির বস্তু নয়, আনন্দের আহ্বান মাত্র। শিশুর জীবনে যিনি এইরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করেন, সেই শিক্ষকের দায়িত্ব কতটা গুরুতর, তাহা সহজেই অনুমেয়।

এই প্রবন্ধে প্রথম শ্রেণীর শিশুদের জন্য একটি পাঠ-দান কি ভাবে চলবে, তার মধ্যেই আলোচনা নিবদ্ধ রাখব। তাছাড়া বিশেষ পাঠ হবে লেখা ও পড়া শিক্ষা। এই পাঠটি প্রথম শ্রেণীর শিশুদের বৎসরের দ্বিতীয় মাসের শেষ দিকে বা তৃতীয় মাসের প্রথম দিকে দেওয়া চলতে পারে। বৎসরের প্রথম মাস দেড়েক যাবে শিশুদের বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় করাতেই। শিক্ষক এ সময় নানা গল্প, খেলা ছড়া সঙ্গীত, প্রকৃতি-পরিচয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিশুদের জড়তা কাটিয়ে দেবেন, এবং শিশুর মনকে নানা ভাবে পড়া ও লেখার জন্য প্রস্তুত করবেন। তাই দ্বিতীয় মাসের শেষের দিকে বা তৃতীয় মাসের প্রথম দিকে যখন শিশুরা মৌখিক প্রকাশে কিছুটা দক্ষ, যখন তাদের অঙ্কন বা নানা রকম কাজ করার ফলে অঙ্গুলি সঞ্চালন কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, তখন এরূপ পাঠদান সম্ভব, এবং শিশুদের পক্ষে আনন্দ সহকারে অনুসরণও সহজসাধ্য। বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় শিশুরা নানারকম খেলার ছলে বা লেখাপড়ার জন্য মন প্রস্তুতীকরণের ফলে নিজের নাম বা কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দ সমগ্র ভাবে পড়তে বা লিখতে শিখেছে। এরূপ অবস্থায়ই নিম্নরূপ পাঠের অবতারণা চলতে পারে।

নীচের পাঠটীকা দেখে সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে শিশুদের জন্য মাত্র তিন রকমের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে। শিক্ষকের পক্ষে যেসব কাজের উপকরণ সংগ্রহ করা সহজসাধ্য তাই এখানে উল্লেখ করা হল। অবশ্য এসব উপকরণও সব সময়ে সব বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়; এর চেয়েও কম পয়সায় বা বিনা পয়সায় জোগাড় করা যায় এমন সব উপকরণ এবং তৎসংযোজিত কর্মের কথা কেউ হয়তো উল্লেখ করতে পারেন। কিন্তু শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য একটি নিম্নতম সীমা নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। মনোমুগ্ধকর বস্তু একেবারে কিছু নেই, এভাবে কাজ চলতে পারে না। সামান্য কিছু রং, রং পেন্সিল, ক্রেয়ন, কাঁচি বা এই জাতীয় অল্প কিছু ছাড়া শিশুদের চলবে না। উপকরণ অনেক সময় কাজের স্পৃহা বর্ধিত করে, অতএব সেদিকে একেবারে দৃষ্টি না দিলে চলবে কেন? তিনটি কাজের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তার কারণ যদি বেশি ইউনিটের কাজের বন্দোবস্ত করা যায়, তাহলে শিক্ষকের পক্ষে ২৫।৩০টি শিশুকে নিয়ন্ত্রণ করা একটু অসুবিধাজনক হয়ে পড়তে পারে। শিক্ষক

পাঠ—বাংলা লেখা ও পড়া

বিশেষ পাঠ—কয়েকটি বাক্যের সঙ্গে পরিচয়

শ্রেণী—প্রথম শ্রেণী
ছাত্র-সংখ্যা—২৫—৩০
উপস্থিতি— ২৫—৩০
সময়— ২ ঘণ্টা

I

কাজ	উদ্দেশ্য	উপকরণ	পরিকল্পনা	উপস্থাপন	প্রয়োজন
ছবি আঁকা, কাগজ-কাটা ও মাটির জিনিষ তৈরী করা	১। আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দেওয়া ২। লেখা ও পড়া শেখান	ছবি, খাতা, লাল নীল পেন্সিল, ক্রেয়ন, রং, তুলি, মাটির জিনিষ, চক, বোর্ড ইত্যাদি	শিশুদের সহযোগিতায় শিশুদের তিনটি দলে ভাগ করে কাজ বণ্টন ও উপকরণাদি বিতরণ। কাজের শেষে কে কি কাজ করেছে তার পরিচয় দান। **বিশেষ দ্রষ্টব্য :** যদি এমন ২।১টি শিশু থাকে, যারা নূতন এসেছে, অন্য কোন কাজ করতে চায় না, তাহলে তাদের কয়েকটি ছবির সীমারেখা টেনে দেব, তারা লালনীল পেন্সিল দিয়ে ছবি ভরাট করবে।	শিশুরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করবে, আমি তাদের সাহায্য করব। ১। ছবি আঁকার দল—শিশুদের সংখ্যানুযায়ী বহুত রংএর বাক্স রব, অতএব সেখানে যাতে কোন গোলমাল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখব। ২। ছবি কাটার দল—শিশুরা নানা রকমের ছবি কাটবে, তারপর ছবিগুলি বিভিন্ন ভাগে তাহাদের শ্রেণী পুস্তকে আঠা দিয়ে সাঁটবে। ৩। যে মাটির জিনিষগুলো শিশুরা তার দোকানঘরের জন্য তৈরী করেছিল, সেগুলো তারা রং করবে। ৪। বাকী ২।১ টি শিশু সীমারেখ ছবিগুলি লাল নীল পেন্সিল দিয়ে এঁকে ভরাট করবে।	১। ১নং দল যে যে ছবি এঁকেছে তা তারা বর্ণনা করবে। আমি তার বর্ণনা কার্ডে লিখে দেব। তারা পড়বে ও লিখবে। ২। ২নং দল ছবি কেটে ছবির বর্ণনা করবে। আমি তাদের কথা কার্ডে লিখে দেব। তারা পড়বে ও লিখবে, আমি সাহায্য করব। ৩। মাটির যে জিনিষগুলিতে শিশুরা রং দিল সেগুলি শিশুরা বলবে, আমি সেকথাগুলি কার্ডে লিখে দেব, শিশুরা পড়বে ও লিখবে। আমি সাহায্য করব। ৪। বাকী ২।১টি শিশু কোন ছবি ভরাট করল তা বলবে, আমি ছবির নীচে বড় বড় করে লিখে দেব। শিশু পড়বে ও লিখবে, আমি সাহায্য করব।

পরে ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য

যদি কম ইউনিট ঘুরে বেড়াতে পারেন, তবেই সকলের কাজ এবং প্রয়োজন বোধে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ভাবে সাহায্য করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয়। ছবি আঁকা, কাগজ কাটা ও মাটির জিনিষে রং করা এই তিনটি কাজের মধ্যে শিশুদের আগ্রহ, ঔৎসুক্য ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ করা সম্বন্ধে অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন, কিন্তু বেশি ইউনিটের কাজের অসুবিধার কথা যা পূর্বে বিবৃত করা হয়েছে, তা ছাড়াও যদি শিশুকে যে কোনও কাজ করবার স্বাধীনতা দেওয়া যায়, তবে তার শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না, তার শিক্ষাও একটি বিশেষ গতিপথ ধরে অগ্রসর হবে না। অতএব কর্মগুলি যে কোন ধরণের হউক না কেন কয়েকটি নির্দিষ্ট কর্মের মধ্যে শিশুর কর্ম বাছাইয়ের স্বাধীনতাকে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

কাজগুলি স্থির থাকলেও সেই কাজগুলি সম্পর্কে দলবিভাগে শিশুদের প্রাধান্য থাকবে বেশি, তাদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যকে যথাসম্ভব সম্মান দিতে হবে। তবে যদি এমন অবস্থা হয় যে শিশুরা সকলেই কাগজ কাটতে চাইল, তবে কি হবে? কাঁচি রয়েছে ৮।১০টি, কাগজ কাটতে চাইল ২৫ জন, এ অবস্থায় শিক্ষক ইঙ্গিতের (suggestion) সাহায্যে শিশুগণকে অন্যান্য কাজের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন।

শিশুদের তিনটি দল নানা কাজ করতে লাগল। দু'একটি শিশু হয়তো একেবারে নূতন এসেছে, তাদের নিয়ে কি কাজ করা যাবে? যদি তারা নির্দিষ্ট দলগুলির মধ্যে প্রবেশ করে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে কাজ করতে পারে তো ভালই; যদি না পারে, যদি পূর্বের নানা খেলা ও কর্মের সঙ্গে তাদের অপরিচয়ের ফলে তারা কাজে অভ্যস্ত হতে না পেরে থাকে, তবে হয়তো তারা ঐসব কর্ম হতে বিরত থাকবে, হয়তো চুপ করেই বসে থাকতে চাইবে। যদি সেরূপ অবস্থাই হয় তবে কয়েকটি কাগজে গরু, ঘোড়া, বাড়ি, গাছ ইত্যাদি সীমারেখা টেনে দিয়ে ঐ শিশুদের লালনীল পেন্সিল দিয়ে ছবি তরাট করতে দেওয়া যেতে পারে। এইরূপ করতে হয়তো তাদের আপত্তি হবে না। কারণ নূতন কাজে অনভ্যস্ততা-জনিত ভীতির কারণ এখানে নেই, এখানে তাদের শুধু অর্ধেক কাজ সমাপ্ত করতে হয়েছে। অতএব তারা হয়তো ঐ কাজ করবে।

এদিকে দলগুলির কাজ চলল। কাজের শেষে শিক্ষক শিশুদের পড়া ও লেখা শেখাবেন। কি করে শেখাবেন? কাজ শেষ হবার সাথে সাথে কাজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করার আগ্রহ শিশুমনে জাগিয়ে তোলা সম্ভব। শিশুরা কি এঁকেছে, কি কেটেছে, কি লাগিয়েছে, ইত্যাদির পরিচয় দিতে তারা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করবে। এ আগ্রহ তাদের স্বতঃস্ফূর্ত। এ অবস্থায় যদি শিক্ষক পূর্বেই কাজের পরিচয় সম্বন্ধে কতকগুলি কার্ড তৈরী করে নিয়ে যান, এবং যে যে কাজের পরিচয় তিনি পূর্বে আন্দাজ করতে পারেন নি, তা তৎক্ষণাৎ কার্ডে লিখে শিশুদের দেন, তাহলে শিশুরা সেগুলি পড়তে ও লিখতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করবে। এ অবস্থায় প্রায়ই ব্যক্তিগত সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে। কারণ কোন দল হয়তো ছবি এঁকেছে, কিন্তু দলের মধ্যে কেউ এঁকেছে বিড়াল, কেউ গাছ, কেউ বাড়ি, কেউ মোটরকার ইত্যাদি। এ অবস্থায়, 'আমি বিড়াল এঁকেছি' একথা শুধু যে বিড়াল এঁকেছে সেই পড়বে ও লিখবে।

ব্যক্তিগত সাহায্য করতে গেলে বহু সময়ের দরকার, এবং শ্রেণী মধ্যে গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। কথাটা অর্ধসত্য হলেও সম্পূর্ণ নয়। যদি সকলে একত্র কাজ শেষ করে পড়তে ও লিখতে চায় তাহলে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু দলগুলি সাধারণত একই সময়ে কাজ শেষ করবে না, আর, একটি দলের

মধ্যেও সকলের কাজ একই সময়ে শেষ হবে না। এ অবস্থায় কাজ আরম্ভ করার কিছুক্ষণ পর থেকেই কাজের কার্ডগুলি বিলি করা, পড়া ও লেখা কাজ আরম্ভ করলে সকল শিক্ষকেই সাহায্য করা চলবে। আর তৃতীয়তো শ্রেণীর যে পৃথকীকরণের আলোচনা করা উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বলা যেতে পারে, যে শিশুরা মাস দুয়েকের মধ্যে পৌরুষত্বের সম্বন্ধে কিছুটা ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করেছে তারা নিজেরাই একত্র হয়ে শ্রেণীকক্ষের বেড়ালে তাদের বক্তব্য টাঙিয়ে রেখেছে।

"এভাবে কথা বলব না।"

"আস্তে বলব।"

"পালার জন্য অপেক্ষা করব।" ইত্যাদি। এবাক্যগুলি শিশুরা প্রতিদিন প্রথম শিক্ষকের সাথে সাথে পড়ে। অতএব অনর্থক 'লাল,' 'লাল' বলে চেঁচিয়ে শ্রেণীর পৃথকীকরণ তারা বেজায় করবে না। শিশুরা যতটুকু কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে শিখেছে তা তারা জীবনের সঙ্গে সংযোগ রেখেই শিখতে আরম্ভ করেছে, পৃথকীকরণের আলাদা কক্ষ শিক্ষকের কাছে নেই।

পাঠটীকার উপরে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এই পাঠটি দুই বার চলবে। তবে প্রথম দিন আরম্ভটা কাজ, ৪৫ মিনিট লেখা ও পড়া, এবং তারপর দিন ৪৫ মিনিট বাক্যগুলি পুনরায় লেখা ও পড়া, এই ভাবে সময় ভাগ করলে ভাল হয়। এই অবস্থায় বাক্যের ও শব্দের পুনরাবৃত্তি যত বেশি হয়, ততই মঙ্গল। পুনরাবৃত্তির ফলে বাক্যের ও শব্দের বৃত্তরূপের সঙ্গে শিশুর পুনঃ পুনঃ পরিচয় ঘটে।

তাহলে কোন বলগুলি কি কি লিখল তা একবার দেখা যেতে পারে। অবশ্য বাক্যগুলি শিশুর কর্মের পরিচয় দিচ্ছে, অতএব শিশু যত বেশি কাজ করেছে, তত বেশি বাক্য সে লিখতে পারবে। বাক্য কি আকারে হবে, সম্পূর্ণ না জানা থাকলে লিখলিপির বন্ধনের হতে পারে।

১। মৃত্তিকা বল পড়ল ও লিখল—বিড়াল, ইঁদুর, ঘোড়া, কাক, বাড়ি ইত্যাদি।

২। ছবি আঁকার বল পড়ল ও লিখল—আমি ছবি এঁকেছি। আমি বিড়াল এঁকেছি। আমি ঘোড়াটার এঁকেছি। আমি গাছ এঁকেছি। আমি বাড়ী এঁকেছি। আমি ফুল এঁকেছি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৩। ছবি কাটার বল—আমি ছবি কেটেছি। আমি কাগজ কেটেছি। আমি মানুষের ছবি কেটেছি। আমি গরুর ছবি কেটেছি। আমি ঘুড়ুরের ছবি কেটেছি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

৪। রং দেওয়ার বল—আমি কলার রং দিয়েছি। আমি কমলার রং দিয়েছি। আমি আমের রং দিয়েছি, আমি সবুজের রং দিয়েছি। আমি নিলিমিতে রং দিয়েছি। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলগুলির মধ্যে দেখা যাবে, অনেকেই কতকগুলি কাজ একরকম করেছে। যেমন ছবি আঁকার বলে অনেকেই 'গাছ' এঁকেছে, 'বাড়ি' এঁকেছে ইত্যাদি, কিংবা কাগজ কাটার বলের মধ্যে অনেকেই হয়তো 'গরুর ছবি', 'গাছের ছবি', 'বাড়ির ছবি' কেটেছে ইত্যাদি; রং দেবার বলে অনেকেই 'কলার' রং দিয়েছে, 'আমে' রং দিয়েছে ইত্যাদি। অতএব বাক্যের ভাষা অবশ্য-বরণ করেও শিশুরা লিখতে বা পড়তে পারে। এ নিয়ে একটি পড়া-লেখার খেলাও অবতারণা করা সম্ভব। লেখা ও পড়ার শেষে, বলের সব কার্ডগুলি একত্র করে, কোন একটি ছেলে বা মেয়েকে বলতে পারা যায় "তুমি যে যে কার্ডগুলির কাজ করেছ, সেগুলি বেছে নাও ও পড়।" এভাবে সব ছেলেমেয়েকেই তাদের পড়া ও পরিচয় পরীক্ষা করা যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে, যে শিশুদের আক্ষরিক জ্ঞান নেই, তারা নিজেদের নাম বা প্রয়োজনীয় কয়েকটি শব্দ মাত্র লিখতে পড়তে শিখেছে। এখন কর্মের সাথে যুক্ত শিশুর নিজস্ব বক্তব্য, বাক্যের আকার

দিয়ে শিশুর কাছে যখন উপস্থিত করা যাবে, তখন শিশু সেটা আরও সহজেই পড়বে। আর পড়া বা লেখায় শিশুদের বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না। কোন একটি ফল, ধরা যাক, ছবি আঁকার ফল, যখন 'আমি ছবি এঁকেছি' এই বাক্যটির যুক্তাক্ষর দেখে যখন পড়তে ও লিখতে শিখল, তখন ছুটো দিকের ছুটো পথ ঠিক রেখে মাঝের পথ বাড়িয়ে গেলে শিশুদের পড়তে ও লিখতে সুবিধা হবে, পড়া ও লেখার পুনরাবৃত্তি হবে এবং বাক্যগুলির যুক্তাক্ষর শিশুর মগজে ছাপ রেখে যাবে। প্রত্যেক ফলের প্রথম বাক্যটি ফলের সকলের জন্য, অতএব সেই বাক্যটি বোর্ডে বড় করে লিখে দেওয়া চলে, তাতে বাক্যের যুক্তাক্ষরের সঙ্গে শিশুর চাক্ষুষ পরিচয় হবে বেশি। অপরের সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলেও বাক্য থেকে এভাবে শিশুদের শিক্ষা দেওয়া চলে। এ প্রত্যক্ষ দেখা গেছে। বলা বাহুল্য, এ পদ্ধতিকে বাক্যাত্মক শিক্ষাপদ্ধতি বলা হয়, সেকথা সকলেই জানেন।

বাংলা শব্দের বহুবচন

[শ্রীবৈদ্যনাথ পাল]

বাংলা ভাষার বচনের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। সংস্কৃত ভাষায় বিভক্তি দ্বারা বিভিন্ন বচন সূচিত হয়, কিন্তু বাংলা ভাষার শব্দের বহুবচনের কোনও বিভক্তি নাই। সেইজন্য একবচন ও বহুবচন শব্দের 'রূপের' কোনও পার্থক্য নাই। বাংলা শব্দকে বহুবচন করিবার সময় মূল শব্দের শেষে কতকগুলি প্রত্যয় যোগ করা হয়, এবং তাহার পর যে বিভক্তি দেওয়া হয় তাহা একবচনেরই। বাংলা ভাষার শব্দগুলির অর্থের দ্বারা না-একবচন না-বহুবচন এমন একটি ভাব প্রকাশ পায়। শব্দের প্রয়োগের দ্বারাই একবচন বা বহুবচনের বোধ হয়। বহুবচন বুঝাইবার জন্য বাংলায় -রা, -এরা, -গুলি, -গিল, -কুল, -গণ, -বৃন্দ প্রভৃতি প্রত্যয় বা প্রত্যয়স্থানীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কতকগুলি হইল সংস্কৃত শব্দ। যেমন—-কুল, -গণ, -বৃন্দ প্রভৃতি। '-গিল' ফার্সী 'গিরদ' শব্দ হইতে আসিয়াছে এবং সম্ভবত মুসলমান যুগেই ইহা বাংলা ভাষায় প্রত্যয়াধিকার লাভ করিয়াছে। -রা, -এরা, -গুলি ইত্যাদি হইল উহুর প্রত্যয়। -রা যোগে বহুবচন গঠন করার পদ্ধতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন যুগের পূর্বে প্রচলিত ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে মাত্র তিনবার ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। যেমন—আম্হারা, তোহারা। চর্যাপদে -রা, -এরা দ্বারা গঠিত বহুবচনের ব্যবহারই নাই।

কিন্তু সর্বত্রই যে এই -রা, -এরা, -গুলি প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা বহুবচন করিতে হয় তাহা নহে। যেমন—'আমার বাড়ির সমুখ দিয়া লোক যাতায়াত করে।' এখানে লোক বহুবচন। ইহার কোনও প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। অথবা, 'আমওয়ালা আম বিক্রয় করিতেছে' অথবা 'কাপড়ওয়ালা কাপড় বিক্রয় করিতেছে।' এই বাক্যগুলিতে আমরা দেখিতে পাই 'আম' বা 'কাপড়' এই শব্দগুলির উত্তর কোনও বহুবোধক প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। বহুবোধক প্রত্যয় প্রয়োগ করিলে বরং ভুল হইত। কারণ 'আমগুলি' অথবা 'কাপড়গুলি' বলিলে নির্দিষ্ট ভাবে কতকগুলি আম বা কাপড়

বুঝাইত। অধিকন্তু, 'পায়ে জুতা পরিয়াছি' 'চোখে দেখি', 'কাণে শুনি' প্রভৃতি বাক্যে পা, জুতা, চোখ, কাণ প্রভৃতি যে বহুবচন একথা নিশ্চয়ই বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে এই বোঝা যায় যে তৎসম শব্দে বহুত্ববোধক প্রত্যয়ের প্রয়োজন হইলেও তদ্ভব শব্দে সাধারণত বহুত্ববোধক প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে প্রাচীনতম বাংলায় বোধ হয় বহুবচন বলিয়া কিছু ছিল না। এই সন্দেহ আমাদের আরও দৃঢ় হয় যখন আমরা দেখি যে বাংলা ক্রিয়ার বহুবচনের কোনও বিশেষ রূপ নাই। যেমন—'বালকটি পড়ে' এবং 'বালকেরা পড়ে'। অবশ্য সর্বনাম শব্দে বহুবচনের রূপ কিছু দৃষ্ট হইলেও উহা প্রাচীনতম বাংলায় ছিল কিনা সন্দেহ।

যাহা হউক বর্তমানে বাংলায় আমরা যে বহুবচনের ব্যবহার পাই তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট। যেমন—'ছেলেরা খেলা করিতেছে, এখানে 'ছেলেরা' অনির্দিষ্ট বহুবচন, এবং 'আমার পাঁচটি ছেলে' এখানে ছেলে নির্দিষ্ট বহুবচন। বাংলায় নির্দিষ্ট বহুবচনের সময়ও মূল শব্দ কোনও বহুত্ববোধক প্রত্যয় গ্রহণ করে না। ইংরেজিতে I have five children, সংস্কৃতে মম পঞ্চ পুত্রাঃ (সন্তি) চলিবে। অর্থাৎ ইংরেজি ভাষায় five এই বহুত্ববোধক বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও child, children হইবে, এবং সংস্কৃত ভাষায় 'পঞ্চ' এই বহুত্ববোধক বিশেষণ থাকার জন্যও পুত্রঃ, পুত্রাঃ হইবে, কিন্তু বাংলা ভাষায় 'পাঁচটি' এই বহুত্ববোধক বিশেষণ থাকা সত্ত্বেও 'ছেলে' কখনও 'ছেলেরা' বা 'ছেলেগুলি' হইবে না।

বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতিকে দ্বিত্ব করিয়া বাংলায় বহুবচন সৃষ্টি করিবার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন—'ছোট ছোট ছেলে।' ইংরেজিতে small small child বা children হয় না। এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা অনির্দিষ্ট বহুত্ব বুঝাইলেও মূল শব্দের উত্তর কোনও প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয় না। যেমন—'ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মিষ্টি খেতে ভাল বাসে।' তবে, নির্দিষ্ট করিয়া বুঝাইলে বা জোর দিয়া বুঝাইলেই মূল শব্দের উত্তর বহুত্ববোধক প্রত্যয়ের প্রয়োজন হয়। যেমন—'স্কুলের ভাল ভাল ছেলেরাও নোট বই মুখস্থ করে'। ইংরেজি ব্যাকরণের প্রভাবে আজকাল কোথাও কোথাও দ্বিত্ববোধক বিশেষণের পরও মূল শব্দে প্রত্যয় যোগ করা হয়। যেমন—'ছায়াঘনবিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি' 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি সে সময়ে আদরের সহিত পঠিত হইত।'

বিশেষ্যকে দ্বিত্ব করিয়াও বাংলায় বহুবচন করার রীতি আছে। যেমন—'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'; 'ঘরে ঘরে হাহাকার' ইত্যাদি। সংস্কৃতে বা ইংরেজিতে এরূপ প্রয়োগ হয় না।

ব্যাকরণকারগণ বহুবচনকে আবার সমষ্টার্থক ও তুচ্ছার্থক—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। এই বিভাগ অনুযায়ী বহুবচনে ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলিও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, সাধারণত -রা, -এরা -দিগ প্রভৃতিকে সমষ্টার্থক এবং -গুলি, -গুলা প্রভৃতিকে তুচ্ছার্থক প্রত্যয় বলা হইয়া থাকে। সর্বনাম, মানুষ, দেবতা প্রভৃতি শব্দে -রা, -এরা, -দিগ প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়, এবং অপ্রাণীবাচক অথবা বিবেকবুদ্ধিহীনতাবোধক শব্দে সাধারণত -গুলা, -গুলি প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন—দেবতারা, মনুষ্যদিগের; পশুগুলি, বিড়ালগুলা ইত্যাদি। কিন্তু এখানে একটি কথা বলার রহিয়াছে। এই ভাবে প্রত্যয়গুলির বিভাগে সর্বত্র সমতা রক্ষা করা যায় না। কারণ, অপ্রাণীবাচক শব্দ বালক, লোক প্রভৃতিতেও -গুলি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়।

আমার মনে হয়, -রা, -এরা প্রত্যয় শুধুমাত্র অনির্দিষ্ট বহুবচন বুঝাইতেই ব্যবহৃত হয়, যেমন—'বালকেরা', 'পশুরা' প্রভৃতি; এবং 'গুলি', 'গুলা' প্রভৃতি নির্দিষ্ট বহুবচনে ব্যবহৃত হয়, যেমন—

বালকগুলি, গরুগুলি প্রভৃতি। কারণ, বালকেরা অপেক্ষা বালকগুলির অর্থ নির্দিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ। এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন এই যে, নির্দিষ্ট বহুবচনে -গুলি, -গুলা প্রত্যয় ব্যবহৃত হইলেই যে অনির্দিষ্ট বহুবচনের সময় -রা, -এরা, প্রত্যয় ব্যবহৃত হইবে তাহা নহে। অনির্দিষ্ট বহুবচনের সময় -রা -এরা, প্রত্যয় ব্যবহৃত হইতেও পারে বা মূল শব্দের নিজস্ব রূপই বলবৎ থাকিতে পারে। যেমন—

'বালকগুলি' নির্দিষ্ট বহুবচন, 'বালকেরা' অনির্দিষ্ট বহুবচন, কিন্তু 'গরুগুলি' নির্দিষ্ট বহুবচন হইলেও 'গরু' অনির্দিষ্ট বহুবচন। অনির্দিষ্ট বহুবচনে 'গরুরা' ব্যবহার করা উচিত নয়।

নিছক সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালিয়া বাংলা ব্যাকরণের গঠনের ইচ্ছা আজকাল কমিয়া গেলেও কোনও কোনও বিষয়বস্তুর পাঠ যেওয়ার সময় সংস্কৃতের সহিত অনাবশ্যক সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রবৃত্তি এখনও অনেক বৈয়াকরণের মধ্যে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমার মনে হয়, এই কষ্টকল্পিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া বরং বাংলা ব্যাকরণের বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সত্য আবিষ্কারের জন্য ব্রতী হওয়া উচিত। বাংলা ব্যাকরণের শিক্ষার্থীর দৃষ্টি সেই বৈশিষ্ট্যের প্রতি সন্নিবদ্ধ করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের মনে মুখস্থ করার প্রবৃত্তি আসিয়া না উঠিয়া বরং মূলগত বৈশিষ্ট্য জানিবার স্পৃহাই জাগিয়া ওঠে।

'মহেশ' গল্পের ট্র্যাজেডীর মূল উৎস

(শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়)

জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষণকালীন মুহূর্তের রসরূপেই শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পের সার্থক পরিচয়। পৃথিবী জুড়ে নানা পথে জীবনের যে বিচিত্র শোভাযাত্রা চলেছে, তার পরিধি বিপুল, সমস্যাও জটিল, এই সমগ্র জীবনকে ধরে রাখতে পারে উপন্যাস কিন্তু এরই একটি খণ্ড অংশকে কেন্দ্র করে মুহূর্তের রসাবেদনকে চিরন্তন মহিমা দিতে পারে যে, সে ছোট গল্প। এই দিক থেকে বিচার করলে শরৎচন্দ্রের ছোট গল্পগুলি সার্থক শিল্প সাধনারই স্বাক্ষর বহন করছে। 'মহেশ' এই গল্প-সম্পদের কোহিনুর। এই গল্পটি নিজে ছোট হয়েও শরৎ প্রতিভার সমগ্র পরিচয়ের মহত্তর সার্থকতা লাভ করেছে। শরৎ প্রতিভার একটি বিচ্ছিন্ন আলোক রেখা হয়েও এ গল্পটি পূর্ণ দীপ্তিতে দেদীপ্য হয়ে উঠেছে। শরৎচন্দ্রের শ্রেণী-চেতনা, সমাজ-বোধ ও মানব চরিত্রের মূল্যায়নে এর সার্থকতা অভূতপূর্ব।

নিপীড়িতের মর্মশিল্পী ছিলেন শরৎচন্দ্র। চিরবঞ্চিত জীবনের নিঃস্বতা তাঁর হৃদয়কে করেছে ব্যথাতুর, ব্যক্তির হৃদয়ধর্ম ও সমাজের শাসনধর্মে যেখায় তীব্র বিরোধ, অনুষ্ঠানের আতিশয্যে আন্তরিকতা যেখানে বিড়ম্বিত, হৃদয়হীনতার মরুর উগ্র রসনায় মানুষের প্রাণ-রস যেখানে নিঃশেষিত, সব সংঘাত ও সংক্ষোভের সেই বিচিত্র পটভূমিকাই 'মহেশ' গল্পের প্রাণ। যে মীমাংসাহীন দ্বন্দ্বের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঐশ্বর্য, মনুষ্যত্বের সমস্ত মহিমা নিঃশেষে নষ্ট হয়ে যায়, সেই দ্বন্দ্বই সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডী। পিছনে উপেক্ষিত যে মানুষ পড়ে থাকে তার বিক্ষোভ একটি মাত্র জিজ্ঞাসার মধ্যে

আত্মপ্রকাশ করতে চায়। এই জিজ্ঞাসাটি মহেশ গল্পে শত দুর্বিপাকের মধ্যেও মাথা তুলতে চেয়েছে। 'মহেশে'র মৃত্যু বা গফুরের মানবিক অপচয়ের জন্যে দায়ী কে? একথা সত্য যে, এই অপচয়ই সভ্যতার ট্র্যাজেডী। এর মূলে রয়েছে সমাজ শক্তির বিচার-বুদ্ধিহীন, সমবেদনাহীন বিকৃতির বিকার। মানুষের অনুভূতি বা হৃদয়ধর্মের ওপরে কোন আইনই চলে না, কিন্তু আমাদের স্থূল সমাজনীতি হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম রহস্যের সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে মানুষের দুঃখ ও বেদনার ইতিহাসকে আরও মর্মন্তুদ করে তোলে।

'মহেশ' গল্পের মূল ঘটনা বাহুল্যে নয়, হৃদয়ের সংঘাতের মধ্যে। চরিত্রের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব বেদনাতে গল্পের চরম পরিণতি উত্তেজনাময় হয়ে উঠেছে। বিষয়-বৈভব, চরিত্র-গৌরব, গতিশীলতা, বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং সুস্থ ও স্বচ্ছ জীবনবোধ একই কেন্দ্রে সংহত হয়েছে। এই কেন্দ্রটি গফুরের স্নেহ-সিক্ত মানসকেন্দ্র। মূক পশুর প্রতি গফুরের সেই প্রাণস্পর্শী আকুতি 'তুই ত' জানিস, তোকে আমি কত ভালবাসি', সমগ্র গল্পের রসকেন্দ্র এইখানে। এই যে ভালবাসা, এ মাধুর্যে উচ্ছল, উদ্দামতায় উত্তাল, কিন্তু এর উচ্ছলতার প্রকাশ পথে সজাগ প্রহরী বসিয়েছে সমাজ। ঐশ্বর্যের শয়নে শয়ান সমাজ দারিদ্রের বিষজ্বালা বুঝতে চায় না। তাই হৃদয় যখন ভালবাসার অধিকার নিয়ে বিক্ষুব্ধ হতে থাকে, তখন রুক্ষ হৃদয়হীন সমাজ সে হৃদয়কে করে ক্ষত বিক্ষত। বিরাট বিশ্বে নিজের অসহায়তার বেদনা নিষ্ফল জানিয়ে দেওয়া, এবং কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে ওঠা বোবা কান্নাকে হৃদয়ের তটভূমিতে নিষ্ফল আক্রোশে চেপে ধরা—এ ছাড়া গফুরের আর কোন পথ ছিল না। কিন্তু গফুরের মানসকেন্দ্রে বিক্ষোভ যতই সঞ্চিত হতে থাকে, সহ্যের সীমারেখা ততই ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে আসে, তারপর একদিন ঘনিয়ে আসে মানবিক সংকটের সেই ভীষণ তুফান মুহূর্ত! অবশ্যম্ভাবী জীবনের মুখব্যাদানে একবার তীব্র বিরাগে মানুষ হারিয়ে বসে তার মনুষ্যত্বকে, ফলে গল্পের যে climax, তাহা নাটকীয় সমাপ্তি লাভ করে। এই climaxই মহেশের মৃত্যু।

পরম প্রিয়জনের মৃত্যুতে হৃদয় মহান্ বিক্ষোভে স্তব্ধ হয়ে যায়—সমস্ত অনুভূতি হয় শিলীভূত! মহেশের জীবনের অন্তিমাঘাত গফুর আপন স্বরূপ বোধের তীক্ষ্ণতায় জর্জরিত হয়ে পড়ে। কিন্তু গফুর কি সত্যই অপরাধী? গফুরের বিতর্কহীন বিশ্বাস আর প্রশ্নহীন সেই অতলান্ত প্রেমের কি কোন মহিমা নেই? গফুরও মহেশের দৈনন্দিন মন দেওয়া নেওয়ার রস-সিক্ত ইতিহাসের পাতাগুলি উলটিয়ে দেখলে 'মহেশ' হত্যার অপরাধী গফুরের নৈতিক ও মানবিক অধঃপতনের গভীরতা সহজেই বোঝা যায়। মূঢ়তার অভিমান আর আচারের যূপকাষ্ঠে গফুরের মতো কত উপক্রত ও হতভাগ্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটছে তার হিসাব কেউ না রাখলেও শিল্পীর শিল্প সাধনায় সে বেদনার বিবরণ, সে মানবিক অপচয়ের রক্তাক্ত কাহিনী শাশ্বত গৌরবে উৎকীর্ণ থাকেই, 'যারা তবু দিলো, পেলনা কিছুই'—তাদের আত্মিক অপচয়ের বেদনা তো মহেশের দৈহিক মৃত্যুর চেয়ে কোন অংশেই কম মর্মন্তুদ নয়। তবে কেন তর্করত্ন জমিদার আর মাখিক ঘোষেরা পায় বেকসুর খালাস, আর নিরপরাধ গফুরেরা চরম দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে সভ্য জীবনের রঙ্গমঞ্চ হতে নেয় বিদায়? তাদের চোখের জলের হিসাব নেবে কে?

———

নম্বর ও পুরস্কারের প্রভাব

[শ্রীবকুলমালা সেন]

শিশুদের অনুভূতি আপনাকে কেন্দ্র করিয়াই প্রথম বিকাশ লাভ করে। সেই অনুভূতিকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলাইয়া ক্রমশ প্রসারিত করিয়া দেওয়া, কেন্দ্র-বিন্দুটিকে ব্যক্তি হইতে সমাজে রূপান্তরিত করা সকলেরই কাম্য। পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে অথবা যেখানেই শিশুরা একত্র হইয়া খেলা ধূলা বা মেলামেশা করে, সেই সব স্থানই সঙ্ঘমন বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু আমি বিশেষ করিয়া বিদ্যালয়ের কথাই এখানে আলোচনা করিব। বিদ্যালয়ের বিধিব্যবস্থার মধ্য দিয়া আমরা অজ্ঞাতসারে কি করিয়া সামাজিক বোধ জাগ্রত করার আনুকূল্য নয়, পরন্তু প্রতিকূলতা করিয়া থাকি, সে বিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

সহজাত বৃত্তিগুলির যথাযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ও সর্বাঙ্গীন বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। আজিকার পৃথিবীতে মানুষের একক অস্তিত্ব প্রায় কল্পনা করা যায় না। সেই জন্য সঙ্ঘমনের স্ফুরণে বিশেষ রূপে সাহায্য করাও যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলির অন্যতম, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই বলিলেই চলে। কিন্তু শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যেই যে প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়া হইয়াছে, সেখানে আমরা সত্যিকার প্রধান স্থান দিই "লেখাপড়া শেখানো"কে। লেখাপড়া শেখানোর পিছনে আবার "পরীক্ষায় পাশ করানো" উদ্দেশ্যটি সর্বদাই আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করিয়া রাখে। সুতরাং আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার অপর সকল অঙ্গ ছাঁটিয়া ফেলিয়া একমাত্র লেখাপড়া শেখানোকে যে কর্তব্য বলিয়া কার্যত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকেও ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করিয়াছে "পরীক্ষায় পাশ করানো"।

লেখাপড়া শেখা বা পরীক্ষায় পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে ব্যক্তিগত বিষয়। সুতরাং এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া তাহাদের দিক হইতে সামাজিক বোধ জাগ্রত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহার সমষ্টিগত রূপ প্রতিভাত হয় শিক্ষকের মনে। শিক্ষকের দিক হইতেই শিক্ষাদানের কৌশলের মধ্য দিয়া এই ব্যক্তিগত বিষয়টিকে উদারতর ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা থাকা প্রয়োজন। পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য যে পড়া, তদতিরিক্ত নানারূপ আয়োজনের ভিতর দিয়া ইহার রূপ পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হয় সত্য, কিন্তু ইহার অনুকূল মনোভাব জাগ্রত করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যদি বিদ্যালয়ে শ্রেণী পরিচালনার রীতিনীতি ও শিক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ করা না হয়, তাহা হইলে সকল আয়োজনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অধিকাংশ সময় আত্মকেন্দ্রিক ভাবে মনকে নিমজ্জিত রাখিলে খেলা-ধূলার সামান্য সময়টুকুতে স্থায়ী প্রসারের আবির্ভাব আশা করা চলে না। উদারতর ক্ষেত্রে চিন্তাধারাকে নিয়োগ করিবার যথোপযুক্ত সুযোগ না পাইয়া আমাদের ছাত্রছাত্রীগণের শৈশবের আত্মকেন্দ্রিকতা আরও দৃঢ়মূল হইয়া উঠে। তারপর তাহারা যখন ভবিষ্যৎ জীবনে নাগরিকের কর্তব্য পালনে বিমুখ হয়, তখন আমরা ক্ষুব্ধ হই বটে, কিন্তু মূলদেশে অনুসন্ধান করিয়া তাহা নিরাকরণের চেষ্টা করি না।

জনৈকা শিক্ষিকা একটি সুনিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারিব, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সক্রিয় চেতনার অভাবে কিরূপে আমাদের শুভ ইচ্ছা এবং সদয় প্রচেষ্টাও শিক্ষার সুফল লাভে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

বিদ্যালয়টিতে ছাত্রীদের উৎসাহিত করিয়া তাহাদের চিত্তে শিক্ষা গ্রহণের অনুকূল ভাব জাগ্রত রাখিবার জন্য অনেক প্রকার পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। প্রতিদিনের 'বাড়ীর কাজ' 'শ্রেণীর কাজে' নম্বর দেওয়া হইত। এই সকল নম্বর ও সাপ্তাহিক পরীক্ষার নম্বরের গড় করিয়া প্রতি সপ্তাহের নম্বরের মান নির্ধারণ করা হইত এবং সেই মান অনুযায়ী ছাত্রীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন রং-এর কার্ড দিবার ব্যবস্থা ছিল। যে সকল ছাত্রী বৎসরের শেষে ছাব্বিশ খানা কার্ডের অধিকারী হইত, প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী প্রভৃতি নম্বরের ছোতক কার্ডের সংখ্যানুযায়ী তাহাদের বিভিন্ন বিভাগে চিহ্নিত করিয়া পুরস্কার দেওয়া হইত।

নিয়মিত এই ব্যবস্থা দ্বারা এইরূপ আশা করা হইত যে ইহার ফলে ছাত্রীরা নিয়মিত রূপে সাধ্য ভাল করিয়া বাড়ীর কাজ করিবে, শ্রেণীর কাজেও মনোযোগী হইবে, অর্থাৎ তাহাদের লেখাপড়া শেখার পথ সুগম হইবে। কিন্তু শিক্ষিকা কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যবস্থা যেরূপ সুফলপ্রদায়ী হইবে বলিয়া আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, বাস্তবিক পক্ষে তাহা হইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া শিক্ষিকা নিম্নরূপ সত্য আবিষ্কার করিলেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণ পুত্রকন্যাকে যথাসম্ভব উচ্চ শ্রেণীতে ভর্তি করিতে ইচ্ছুক থাকেন। তাহাদের শক্তি ও যোগ্যতা যে এ সময়ে বিশেষ ভাবে বিবেচ্য, তাহা মনে করেন না। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিদ্যালয়ের গণ্ডী পার হইতে পারা তাঁহারা তাঁহাদের সন্তানের পক্ষে গৌরবের বিষয় মনে করেন এবং কোন বিশেষ পরিচয়ের অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনাপন সন্তানের মেধাশক্তি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। সুতরাং যে সকল শ্রেণীর যোগ্য তাহাকে সপ্তম শ্রেণীতে এবং যে সপ্তম শ্রেণীর যোগ্য তাহাকে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করিতে তাঁহারা উৎসুক থাকেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নানা দুর্বলতার ফাঁকে অনেক স্থলেই তাঁহারা সফলকাম হইয়া থাকেন। অত্যল্পসংখ্যক অসাধারণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর কথা বাদ দিলে ইহা সর্বত্রই কুফল প্রসব করে বলা চলে। কারণ অনগ্রসর ছাত্রীর সংখ্যা বেশি হইলেও সেই শ্রেণীতে পাঠগ্রহণের যোগ্যতা-সম্পন্ন ছাত্রী যে একেবারেই থাকে না, তাহা নয়। সুতরাং অনগ্রসর ছাত্রীদের এমন সহপাঠিনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হয়, যাহাদের সমকক্ষতা লাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু নম্বর ও পুরস্কারের প্রভাব ছাত্রীদের উপর অপরিসীম। ইহার প্রত্যক্ষ ফল শিক্ষিকা অতি শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন। অপেক্ষাকৃত যোগ্য ছাত্রীরা প্রথম প্রথম নিজের ভাষায় 'বাড়ির কাজ' লিখিয়া আনিত, কিন্তু অসমর্থ ছাত্রীরা কম নম্বর পাওয়ার লজ্জায় এবং পুরস্কারের লোভে দুই চারিদিন পর হইতেই নোটবুকের ভাষা বা অপর কাহারও ভাষা অবিকল নকল করিয়া আনিতে সুরু করিল। নম্বরের অঙ্ক ইহাতে ভরোচিত হইল বটে, কিন্তু তাহাদের নিজস্ব প্রচেষ্টার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল। ইহার প্রতিক্রিয়া অচেষ্টায় নির্ভরশীল ছাত্রীদেরও একই পন্থা অবলম্বনে প্ররোচিত করিল। কারণ তাহারা বুঝিতে পারিল যে নিজের ভাষার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে নম্বরের প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িতে হইবে। ফলে তাহাদেরও উন্নতির পথ

হয় হইল। অসমশক্তিসম্পন্ন ছাত্রীদের একত্র পাঠদানের ব্যবস্থায় নম্বরের প্রভাব এমনি করিয়াই যোগ্য এবং অযোগ্য উভয় প্রকার ছাত্রীদেরই শিক্ষার উন্নতির পথে অর্গলের পাথরের মত চাপিয়া বসিল। সাধারণ ভাবে ছাত্রীদের ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খাতা দেখা ও নম্বর দেওয়ার জন্য পরীক্ষামূলক ভাবে খাতা দেখার মধ্যে পার্থক্য এই যে, দ্বিতীয় প্রকার খাতা দেখায় সময় প্রায় দ্বিগুণ লাগে। সুতরাং শিক্ষকের দ্বিগুণ পরিশ্রম, পুরস্কারের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত ব্যয় এবং ছাত্রীদের শিক্ষাকালের অমূল্য সময়ের বিনিময়ে আমরা কিছুই পাইলাম না। কিন্তু এ প্রথার অনিষ্টকারিতার এখানেই সীমারেখা টানিলে ভুল করা হইবে। ক্ষতকে আবৃত রাখা নিরাময় হইবার পথ নয়। আমাদের দেশে প্রত্যেক শিক্ষকশিক্ষিকাকে প্রতিদিন যতগুলি শ্রেণীর ও যত প্রকার বিষয়ের পাঠ পরিচালনা করিতে হয়, তাহাতে প্রতি বিষয়ে সপ্তাহে একদিন 'বাড়ির কাজের' ব্যবস্থা করিলেও প্রতিদিন অন্তত পক্ষে দুই বা ততোধিক শ্রেণীর খাতা না দেখিলে চলে না। প্রতি খাতায় নম্বর দিতে হইলে এ জন্য যে পরিমাণ সময়ের প্রয়োজন, ততটা সময় অনন্যচিত্ত, বিদ্যালয়গতপ্রাণ, নিষ্কাম কর্মী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান ভারতে যাঁহারা শিক্ষকতা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে পুরাকালের তপোবনবাসী গুরুগণের অবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষকগণের সংসার তাহার অপরিমেয় অভাব লইয়া—রোগ, শোক, দুঃখ, দুর্দশার হাজার দাবী লইয়া উদ্যত খড়্গের মত সর্বদা তীক্ষ্ণ হইয়াই থাকে। তাই তাঁহারা অনন্যকর্মী হইতে পারেন না। শিক্ষিকা দেখিলেন, এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সম্মুখে যে একটি মাত্র পথ খোলা থাকে, তাঁহারা সেইপথেই চলেন। অর্থাৎ অনন্যোপায় হইয়া ছাত্রীদের সঙ্গে, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এবং আপনার বিবেকবুদ্ধির সঙ্গে শঠতা করেন। সম্ভবত খাতার উপর ছাত্রীর নামটি একবার দেখিয়া লন, তারপর আপনার ধারণা অনুযায়ী যা হোক একটা নম্বর বসাইয়া দিয়া নিয়ম ও চাকুরি বজায় রাখেন। ইহার ফলে ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তাহার অনিষ্টকারিতা অবর্ণনীয়। যে সকল ছাত্রী ক্রমোন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকিয়া ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে, নম্বরের ভিতর দিয়া এ সম্বন্ধে শিক্ষক বা শিক্ষিকার স্বীকৃতি লাভ করিবার আগ্রহ থাকা তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু তাহারা যখন দেখে মুড়ি-মিছরি একই দরে বিকাইতেছে, তখন তাহারা যে শুধু শিক্ষক বা শিক্ষিকার উপর শ্রদ্ধা হারায় তাহাই নয়, তাহাদের শিক্ষা লাভ করিবার সকল আগ্রহও নষ্ট হইয়া যায়। ছাত্রছাত্রীগণের শ্রদ্ধার ভিত্তিতেই শিক্ষক-শিক্ষিকা-গণ তাহাদের মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন এবং তাহাদের শিক্ষাগ্রহণে কার্যকর ভাবে সাহায্য করিতে হইলে ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্ববাদী-সম্মত। এই শ্রদ্ধার অভাব ঘটিলে শিক্ষকশিক্ষিকাগণ তাঁহাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে শ্রেণী অনুযায়ী ছাত্র ছাত্রী নির্বাচনের শৈথিল্যের সহিত শিক্ষকের উপর সাধ্যাতিরিক্ত কার্যভার অর্পণের অবধারিত কুফল মিশ্রিত হইয়া যে রাসায়নিক দ্রব্যটির উদ্ভব হয়, তাহা কাহারও পক্ষেই আকাঙ্ক্ষিত নয়।

শ্রেণীর কাজে নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থার কল অনুসন্ধান করিতে গিয়াও শিক্ষিকা ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িলেন। তিনি দেখিলেন যে একটি শ্রেণীর প্রত্যেক ছাত্রীকে প্রশ্ন করিয়া উত্তর লওয়া এক দিনের এক ঘণ্টায় সম্ভব হয় না। অন্তত পক্ষে দুই দিনের দুটি ঘণ্টা প্রয়োজন। সাধারণত প্রতি বিষয়ের পাঠনার জন্য সপ্তাহে দুটি করিয়া দিনই

নির্ধারিত থাকে। সুতরাং সারা সপ্তাহ শিক্ষিকাকে শুধু পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াই কাটাইতে হয়। ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণে সাহায্য করার সুযোগ আর পাওয়া যায় না। শিক্ষকজীবনে ইহা হইতে বড় দুর্দৈব আর কিছু নাই। কি করিয়া এই রীতি রক্ষা করিয়া শিক্ষকের সত্যিকার কর্তব্য পালন করা যাইতে পারে? ছাত্রীদের উন্মুখ চিত্তকে নূতন নূতন ভাব ও বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে সাহায্য করিবার পথ কোথায়? শিক্ষিকা লক্ষ্য করিলেন, এ ক্ষেত্রেও শিক্ষকগণ সংসারের চাপে বা দায়ীত্বে নয়, আপনার অন্তরের শিক্ষক-বৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার জন্যই শঠতার আশ্রয় লন। জিজ্ঞাসু মনকে তৃপ্তি দেওয়ার মধ্যে যে আনন্দ আছে, তাহাই আস্বাদন করিতে গিয়া প্রতিটি ছাত্রীকে শুধু পরীক্ষামূলক প্রশ্নোত্তরেই আবদ্ধ রাখা চলে না। সুতরাং এক্ষেত্রেও নম্বরের অষ্টপাত পূর্বধারণা অনুসারেই ঘটিয়া থাকে। ফলে একটি ঘণ্টার অত্যল্প সময়টুকুতে শিক্ষা দান বা গ্রহণ অথবা নম্বর দেওয়ার সঠিক নীতির অনুসরণ—কোনটাই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না। শেখা বা শেখানো এবং রীতিরক্ষা—কোনটিই হইল না বটে, কিন্তু এমন একটি তৃতীয় বস্তুর আমদানী হইল, যাহা শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্রছাত্রী বা তাহাদের অভিভাবক কাহারও কাম্য নয়। বাড়ীর কাজ, শ্রেণীর আলোচনা, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, প্রত্যেক বিষয়েই নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় ছাত্রীদের মনে সর্বদাই ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার ভাব জাগাইয়া রাখা হয়, এবং এই নম্বরের উপর পুরস্কারের ব্যবস্থা ব্যক্তিচেতনার মূলে সর্বদাই ইন্ধন জোগায়। সুতরাং এ ব্যবস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ গড়িয়া ওঠার মত পরিবেশ সৃষ্টি তো হয়ই না, উপরন্তু সামাজিক বোধ যাহাতে জাগ্রত হইতে না পারে, অজ্ঞাতসারে সেই পন্থাই অবলম্বন করা হয়। অসম ক্ষমতা-সম্পন্ন ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ভাব উদ্রিক্ত হওয়ার অনুকূল এই সকল ব্যবস্থার ফলে ঈর্ষা ও হীনম্মন্যতার উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। ঈর্ষাকে একবার পথ করিয়া দিলে তাহার গতি রোধ করা দুঃসাধ্য। যে ঈর্ষা আজ আমাদের জাতীয় চরিত্রে বাসা বাঁধিয়া সকল প্রকার উন্নতির প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিতেছে, সচেতন সৃষ্টির অভাবে এমনি করিয়াই আমরা তাহাকে লালন করিতেছি। এমনি করিয়াই সঙ্ঘবদ্ধ গড়িয়া তোলার আদর্শটি আদর্শ হিসাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইতেছে বটে, কিন্তু বিদ্যা মন্দিরে স্থান পাইতেছে না।

কিছুদিন বিদ্যালয়ের সংস্রবে থাকিয়া শিক্ষিকা এই অভিজ্ঞতাই লাভ করিলেন যে যদি বুদ্ধির অটীকা ও অর্জিত জ্ঞানের মান অনুযায়ী শ্রেণী বিভাগ করা যায়, এবং উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে বাড়ীর কাজে নম্বর দেওয়ার রীতি সুফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভিত্তি রচনায় শৈথিল্য বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া এ রীতির প্রবর্তন অনিষ্টকরই হইয়া থাকে। পুরস্কারের ব্যবস্থা করার আগে সর্বক্ষেত্রেই গভীর ভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন। নম্বরের তারতম্য সমকক্ষ সহপাঠীদের মনে প্রতিযোগিতার ভাবই শুধু জাগায়, তাহা উন্নতির সহায়ক। কিন্তু পুরস্কারের ব্যবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব হয়। তা ছাড়া পুরস্কার পাওয়া ও না পাওয়ার মধ্যে আত্মশ্লাঘা ও হীনতাবোধের বীজ সংগুপ্ত থাকে। আত্মশ্লাঘা সীমার মধ্যে থাকিলে অনিষ্টকর হয় না বটে, কিন্তু হীনম্মন্যতা আত্মবিশ্বাস নষ্ট করিয়া দেয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসাধু উপায় গ্রহণের প্রেরণাও যে দেয় না, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না।

আমাদের দেশের মত দরিদ্র দেশে—যেখানে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার মান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নহে এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকে উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব নহে—সেখানে শুভইচ্ছা প্রণোদিত অধিকাংশ নিয়ম কানুন শুধু ব্যর্থতাই আনে না, অমঙ্গলকেও ডাকিয়া আনে। বিদ্যালয়ে গ্রহণযোগ্য সকল সুনিয়মের প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা রাখিয়াও একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে এরূপ ক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের প্রতি মনোযোগ একটু শিথিল করিয়া সুশিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব ও শিক্ষাদান কৌশলের উপর নির্ভর করিলে বর্তমান পরিবেশেও যথাসম্ভব সুশিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে; অর্থাৎ সুশিক্ষক নির্বাচন করা এবং তাঁহার কার্যকুশলতার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করাই আমিকার বাংলার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দিক হইতে একমাত্র গ্রহণযোগ্য হিতকর পন্থা বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | আষাঢ় ১৩৬০ | ৮ম সংখ্যা

আলোচনা

পরলোকে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গত ২২শে জুন কাশ্মীরের এক নার্সিং হোমে মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া দেশবাসী মর্মাহত হইয়াছে। বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু গভীরতর শোকের কারণ হইয়াছে।

ঠিক যখন সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উপযোগী গুণাবলী তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল, ভারতীয় পার্লামেণ্টে তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠস্বর, তীক্ষ্ণযুক্তি, বিচার বিবেচনা যখন দেশে এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাঙলা ও বাঙালী, বিশেষত উদ্বাস্ত বাঙালী যখন তাঁহার কাছে পথের সন্ধান করিতেছিল, অকস্মাৎ সেই সময়েই তাঁহার এই অকাল মৃত্যু দেশবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছে। আমরা আশা করিতেছিলাম অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ও ব্যাপক রাজনৈতিক দৃষ্টির সংযোগ হইলে তিনি একদিন দেশের অনেক সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন।

গণতন্ত্রে রাজ্য শাসন ও পালনের কাজে যে সত্য, ন্যায়, ও নিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রয়োজন তাহাকে চির সজাগ রাখিবার জন্য একটি বলিষ্ঠ বিরোধীদল থাকা শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত ভাবে অপরিহার্য। পণ্ডিত নেহেরুর মন্ত্রিসভায় বিরোধীদলের অন্যতম নেতা হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা লোকের অনেক দিন মনে থাকিবে।

শ্যামাপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররূপে যথেষ্ট নাম করিয়াছিলেন। উত্তর কালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা ক্ষেত্রে তিনি নিজের কর্মশক্তির পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর আশুতোষের মৃত্যুর পর মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে তিনি সিণ্ডিকেটের সভ্য হন, ও মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার হন। একমাত্র তিনিই এত অল্প বয়সে ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদের অধিকারী হন। ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দিকে উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। পিতার আরব্ধ কাজ, বাঙলা ভাষার প্রসার ও বাঙালী সাহিত্যিকদের সকল রকমে

সাহায্য করার ইচ্ছা তাঁহাকে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করিত। পোষ্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট থাকা কালে ছাত্রছাত্রীদের সকল প্রকার সুখ সুবিধার দিকে সর্বদা তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তাহারা সর্বদাই অবাধে তাঁহার কাছে যাইতে ও পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিত। ছাত্রছাত্রীরা যখনই কোন হাঙ্গামায় পড়িয়াছে বা কোন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে, শ্যামাপ্রসাদ অকুণ্ঠ চিত্তে দৃঢ় পদক্ষেপে আগাইয়া যাইতেন, তাহাদের আশ্বাস দিতেন, সমস্যার মীমাংসা করিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁহার আলস্য ছিল না। স্যার আশুতোষ যে দৃঢ়তেজে বিশ্ববিদ্যালয়কে পরনিয়ন্ত্রণমুক্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আপনার সকল শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার কিছুটা উত্তরাধিকারী হিসাবে পুত্রও পাইয়াছিলেন। এই তেজস্বিতার জন্যই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়। একদিন স্যার আশুতোষের মৃত্যুতে যে অভাববোধ বাঙালীকে পীড়িত করিয়াছিল, আজ তাঁহার সুযোগ্য পুত্রের মৃত্যুতে বুঝি বাঙালী তাহার অপেক্ষাও অধিক বেদনা বোধ করিতেছে।

অন্তরীন বা বন্দী অবস্থায় কেহ পীড়িত হইলে চিকিৎসার জন্য কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থা করা রাজনৈতিক শুধু নয় মানবধর্মের অঙ্গ। বিশেষত ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের মত যাঁহারা দূর বিদেশে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব হইতে একান্ত দূরে এইভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন, রাজ্যসরকারের তাঁহাদের জন্য কতখানি ব্যবস্থা করা প্রয়োজন তাহা কি আর বলিবার? দেশবাসী যদি জানে যে কাশ্মীর সরকার তাঁহাদের কর্তব্যে ত্রুটি করেন নাই, তাঁহাদের ঔদাসীন্য বা অবহেলায় নয়, অতর্কিত মৃত্যু ও অনিবার্য কারণে যথাশক্তি করা সম্ভব হয় নাই, তবে দেশবাসীর ও আত্মীয়বর্গের কিছুটা সান্ত্বনা মিলিবে।

প্রাথমিক শিক্ষা

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

সম্মেলনের কর্মিবৃন্দ,

আজ আমরা শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া গভীর শোকচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইয়া আছি। বাংলার, শুধু বাংলার কেন, সমগ্র ভারতের—একজন কর্মবীরের প্রশস্ত কর্মজীবনে সহসা ছেদ আসিয়া পড়িয়াছে। স্বনামধন্য তেজস্বী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্যামাপ্রসাদ আমাদের দৃষ্টিপটের অন্তরালে গিয়াছেন। বৃহত্তর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আগমনের পূর্বে তিনি দেশের শিক্ষাসমস্যার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন যে আমাদের সকলের অবিসংবাদিত নেতৃত্ব তিনি সহজ ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাংলা দেশের নেতৃত্ব এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া যাঁহারা করিয়া আসিতেছেন শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন তাঁহাদের সকলের অগ্রণী। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলেজী শিক্ষা, সেখান হইতে বিদ্যালয়, তাহার মূলে পাঠশালা—বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া সর্বত্র তাঁহার কর্মক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। স্যার আশুতোষ তাঁহার দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আন্তঃকোত্তর বিভাগ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, শ্যামাপ্রসাদ

তাহাকে পল্লবিত করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃতি সাধন করিয়া ছিলেন। বৃহত্তর ক্ষেত্রে কর্মৈষণা তাঁহাকে কলিকাতা হইতে দিল্লী লইয়া গেল, বাঙলা হইতে ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল তাঁহার সাধনা। কিন্তু বাঙলাকে তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই, বাঙলার মনীষার প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার স্বাজাত্য-বোধকে পুষ্ট করিয়াছিল, এবং বাঙলার শিক্ষা-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি কখনও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না। আপনারা সকলেই নিশ্চয় তাঁহার বিয়োগে আত্মীয় বিয়োগের মতই শোকগ্রস্ত হইয়াছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত প্রায় ত্রিশবৎসর ব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আমিও তাঁহাকে নিকট হইতে দেখিবার সুযোগ সুবিধা পাইয়াছিলাম, আপনাদের সহিত যুক্ত হইয়া আমিও আজ তাঁহার স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করি।

আমাদের আজিকার এই অধিবেশনে তাঁহার স্মৃতি যে আমাদের সকলের মনে সর্বাগ্রে ভাসিতেছে তাহা আরও প্রমাণ করিতেছে যে সমস্ত শিক্ষা, শিক্ষার সমস্ত স্তর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। শিশু পড়িতে লিখিতে জানিতে শিখিল, সেই আবার বড় হইয়া বীজগণিত শিখিবে, এমন কি ধর্মঘটও করিবে, আবার আরও বড় হইয়া কলেজে গিয়া দেশবিদেশের শাসনতন্ত্র ও শিল্পের ইতিহাস অধ্যয়ন করিবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যতদূর সম্ভব কোনও এক বিশেষ বিদ্যা অধিগত করিবে। শিক্ষার মধ্যে কোথাও পূর্ণ ছেদ নাই। ইহার অবিচ্ছিন্ন গতি continuous process—জীবনব্যাপী যাত্রা পরিণতির দিকে, এখানে কোনও টেনসিং হিলারী হাট বলিতে পারিবেন না যে তিনি বা তাঁহারা জ্ঞানের এভারেস্ট আরোহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে বলিতেই হইবে নিউটনের মত যে, তিনি সাগর পারাবারে কয়েকটি উপলখণ্ড কুড়াইতে পারিয়াছেন মাত্র। অনন্ত জীবন, তারকা খচিত নীলাকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কত তারকা চোখে পড়ে, কত জগৎ, সেখানে আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান কত ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হয়! মানুষের বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে তো এই, তাহার নিজের মনের কথাই বা সে কত সামান্য জানে। বিজ্ঞান উন্নতি করিতেছে, তাহার গতি অব্যাহত, দেশে দেশে কালে কালে সে প্রশ্ন করিয়া যাইতেছে, তাহার উত্তরও পাইতেছে; কিন্তু প্রশ্নের শেষ নাই। এই অনন্ত জ্ঞানপিপাসার মধ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগের কল্পনা কোথায় শূন্যে মিলাইয়া যায়! আমাদের পাঠশালার গুরুমহাশয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকপ্রবর উভয়ের মধ্যে লৌকিক মর্যাদা ও আর্থিক অবস্থার বৈষম্য ঘোরতর হইলেও উভয়ের এক জায়গায় সাম্য আছে। উভয়েই শিক্ষক, শিক্ষাদানকেই উভয়ে নিজের নিজের জীবনের করণীয় কার্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, বৃত্তি অপেক্ষাও বেশি বলিয়া ধরিয়াছেন। ছাত্রজীবনে শিশু হইতে কিশোরে, কৈশোর হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে পরিণতির পথে মানুষের জিজ্ঞাসাকে ইহারা তৃপ্ত করিবেন, তাহার মনুষ্যত্বকে ফুটাইয়া তুলিবেন। শুধু পুস্তক পাঠের শিক্ষা দিয়া নয়, পরীক্ষার প্রস্তুতিতে নয়, আত্মাকে ঊর্ধ্বমুখী করিয়া ধরিতে পারিলে তবেই না ইহাদের সার্থকতার পরিতৃপ্তি সম্ভব। যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি, from the cradle to the grave—পঁয়তাল্লিশ সালে সেবাগ্রামে বুনিয়াদি শিক্ষা সম্মেলনে গান্ধীজীর নির্দেশের মধ্যেও এইরূপ কথা ছিল। তাই আমরা যে স্তরের শিক্ষকই হই না কেন, সকলে সমব্যবসায়ী, এই কথা মনে করিয়া সকল সহকর্মীকে আন্তরিক অভিবাদন জানাই।

কিন্তু আমাদের সমস্যা এক নহে। মানুষের শৈশবে যে সমস্যা থাকে, তাহা হইল প্রথম জীবনে বহির্জগৎকে জানিবার চেষ্টা। কি করিয়া শিশু জানিবে তাহার অপরিচিত এই জগৎকে? স্পর্শের দ্বারা, ঘ্রাণের দ্বারা, স্বাদের দ্বারা জানিতে

চায়। শিশুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া আমরা হাসি, কিন্তু সে হাসি তাহার পরিপূর্ণ চাঞ্চল্য দেখিয়া, তাহার সব জিনিস আত্মসাৎ করিবার দৈহিক চেষ্টা দেখিয়া নয়। তেমনি কিশোর চায় তাহার শরীর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মনও যাহাতে বাড়ে সেজন্য বড়দের অনুসরণ, এমন কি অনুকরণও করিতে। যুবক চায় তাহার বুদ্ধির দ্বারা জগতের জ্ঞান-ভাণ্ডারকে আরও বাড়াইতে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান পাই করা, ও গবেষণার চর্চা দ্বারা নূতন বিষয়কে জগতের গোচর করা, এক নয়। সুতরাং ক্ষেত্রও ভিন্ন, সমস্যাও ভিন্ন। মাধ্যাহ্নিক আহার শিশুর পক্ষে যতখানি প্রয়োজনীয়, পরীক্ষাগারে নূতনতম যন্ত্র সাহায্যে গবেষণারত যুবকের পক্ষে ততখানি প্রয়োজনীয় কিনা সন্দেহ, অন্তত শিক্ষকের নিকটে তাহা আর 'সমস্যা' নয়। আর্থিক দিকেও উভয়ের মধ্যে বিষম ব্যবধান, এবং সে অর্থের সংগ্রহ উভয়ের পক্ষে যে একই পথ ধরিয়া হইবে তাহাও নয়। এক হিসাবে মানুষে মানুষে, প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে প্রভেদ থাকিবে। কিন্তু প্রভেদের প্রকার ভেদ আছে। বার্নার্ড শ ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, Education is mostly a pretext under cover of which parents get rid of the trouble, the vigilance, the noise, the unconscious chaperonage, the perpetual questioning of children—পিতামাতাকে শিশুদের লইয়া যে গণ্ডগোল সহিতে ও হাঙ্গামা পোহাইতে হয়, তাহাদের উপর যে চৌকিদারি করিতে হয়, নিজের অতর্কিতেই যে পাহারা দিতে হয়, এই সমস্ত এড়াইবার একটা কৌশল হইল শিক্ষা। ইহা ঠাট্টা হইলেও ইহার একটা বাস্তব দিকও আছে। কিন্তু ছেলেকে কি করিয়া আটক রাখা যাইতে পারে, ইহা পরবর্তী স্তরের শিক্ষকের জিজ্ঞাসার বিষয় নহে।

প্রাথমিক শিক্ষার যে সমস্যা সে সম্বন্ধে আরও অনেক সন্ধান করা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতির মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সত্য কিন্তু মনীষা যদি শুধু ভগবদ্দত্ত সম্পত্তি না হয়, যদি তাহার বাহিরেরও কারণ থাকে, শিক্ষার সঙ্গে যদি তাহার সম্পর্ক, কার্যকারণ সম্বন্ধ খানিক পরিমাণেও থাকে, তবে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার ভিত্তি স্থাপন হইবে, তাহার বুনিয়াদ গড়িবে এই প্রাথমিক বিদ্যালয়েই। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার সম্বন্ধে তদন্ত করিয়াছি, দুই বড় বড় ভল্যুমে সেই তদন্তের বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা তাহা তন্নতন্ন পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিতেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষারও কমিশন বসিয়াছে। সমগ্র ভারত ঘুড়িয়া কমিশনের সদস্যেরা তদন্ত করিয়াছেন, এবং তাহার বিবরণীও লিপিবদ্ধ করা হইতেছে, এখনও প্রকাশিত না হইয়া থাকিলেও লিপিবদ্ধ হইবার পর শীঘ্রই প্রকাশ করা হইবে শুনিয়াছি। কিন্তু এ সমস্তই আগার কথা, গোড়ার কথা নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধেও তদন্ত কমিশন হওয়া উচিত, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে একই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব না হইলেও সমগ্র দেশের পরিপ্রেক্ষিতে, আমাদের প্রদেশের, এবং প্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের জেলার সমস্যার স্বরূপ ও সমস্যার সমাধান সম্ভব, আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে এরূপ ভাবা অসঙ্গত নয়। তাই অনতিবিলম্বে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার সম্বন্ধে তদন্ত কমিশন না বসাইলে শিক্ষার ভবিষ্যৎ খানিকটা অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকিবেই বলিয়া মনে হয়, এবং এ পর্যন্ত যে কার্যের সূচনা হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

সকল সমস্যার মধ্যে আজ প্রকট হইয়াছে শিক্ষকের বেতন সমস্যা। জীবন যাপনের মান

এই গণতন্ত্রের যুগে শ্রেণীসাম্যের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্য আজ সর্বত্র সমান। তা ছাড়া ধনী ও দরিদ্রের জীবনযাত্রা একই আর্থিক গভীর মধ্যে থাকুক, ইহাও আমরা সকলেই চাই। সমাজের দিক দিয়া এই আর্থিক পার্থক্য দূর হউক, আত্মিকার দিকে আমরা অধিকাংশ লোকই ইহা চাই। শুধু আমার ছেলেটি দুধে-ভাতে থাক, ইহা আমাদের কাহারই আজ কাম্য নয়। কিন্তু দুধে-ভাতে অবশ্য দূরে থাক্ শুধু অন্ন, দুমুঠো ভাত, তাহাও জোগাড় করা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষকের বেতন, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক শিক্ষকের বেতন, আজ এত সামান্য যে সংসারে অন্য কোনও বৃত্তির তুলনায় তাহা আদৌ স্পৃহণীয় নয়। পিয়ন, দরোয়ান আর দুধ যোগাইবার, আর কিছু না হউক ইহাদের অন্তত আর্থিক সমান স্তরেও তো আনা আমাদের সমাজে এখনও সম্ভব হইল না। প্রাথমিক শিক্ষকগণ পঞ্চাশ টাকা পাইবেন, ইহাও আমরা দেখিতে পাইলাম না। পঞ্চাশ টাকায় পরিবার প্রতিপালন কি করিয়া হয়, সামাজিকতা কি করিয়া রক্ষা হয়, সে প্রশ্নের উত্তর আমরা দিতে পারি না; যদিও বার্নার্ড শ এই প্রসঙ্গেও ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন যে মামুলি শিক্ষক, যে শুধু ছেলেদের আটকাইয়া রাখিতে ও বেত মারিতেই জানে, তাহার জন্য তাঁহার কোনও সহানুভূতি নাই। The remedy is not to give professional pay and status to unskilled men who cannot even pronounce the alphabet presentably, but to exact genuine professional qualifications from the school master and pay him their market value. His status will then take care of itself...The true teacher can leave the doctor, the lawyer and even the parson nowhere in the rapidity with which he can gain respect and liking both in his school and out of it.

আমাদের সরকারের ঘরে সেই টাকা হইবে যাহাতে শিক্ষাব্যবস্থার এই উৎকট অশোভন অন্যায়ের প্রতিকার হইতে পারে?

শিক্ষকদের বেতন অন্তত গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে পর্যাপ্ত হইবে কি করিয়া, ইহাই হইল প্রথম সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা, পাঠ্যসূচী লইয়া। ইহারও যে দ্রুত সংশোধন প্রয়োজন। অনেক শিক্ষকের পক্ষেই ইহার ভাষার আবরণ ভেদ করিয়া বস্তুর নিকটে পৌঁছানো কঠিন। বিশদ চিন্তার বিশদ প্রকাশ—লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকিলে তাহাতে পৌঁছানো যায় না। সেই জন্যই বিশেষ করিয়া আমাদের পাঠ্যসূচীর ভাষা হওয়া চাই পরিষ্কার, এবং তাহার চেয়েও বেশি করিয়া চাই, যা তাহার জন্যই বেশি করিয়া চাই, চিন্তার পরিচ্ছন্নতা। প্রতি শ্রেণীতে কতখানি আমরা সহজে পড়াইতে পারি একথা কিন্তু যাঁহারা পড়ান না তাঁহাদের পক্ষে ঠিক করিয়া বলা কখনই সম্ভব নহে, কল্পনা কখনও অভিজ্ঞতার স্থান লইতে পারে না। তাই বলিয়া একথাও মনে করিতে পারি না যে যাঁহারা পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব লইয়াছেন তাঁহাদের আদৌ অভিজ্ঞতা নাই, অথবা তাঁহারা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের পরামর্শ গ্রহণে পরাঙ্মুখ। আমার বক্তব্য এই যে, প্রাথমিক শিক্ষকেরা কেন এই পাঠ্যসূচী প্রণয়নে বিষয়ানুযায়ী তাঁহাদের সুবিধা অসুবিধার কথা বলিবেন না, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁহাদের যাহা বলিবার সে কথা জানাইবেন না। পাঠ্যসূচী যত ভালই হউক, প্রকৃত রূপ দিবার ভার তো তাঁহাদের উপর, পাঠ্যসূচী যত মন্দই হউক, তাহাকে সংশোধিত করিয়া ছাত্রদের উপযোগী করিয়া নিবার ভারও যে তাঁহাদের উপর। বাহির হইতে কেহ তাঁহাদের

ছাত্র পড়াইতে আসিবে না। নানা অসুবিধার মধ্যেও তাঁহাদিগকে জাতিগঠনের এই গোড়ার কাজ করিতে হইতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহারা কতটা রূপ দিতে পারেন, কতখানি পড়াইতে পারেন, কতখানি রূপ দেওয়া সম্ভব, তাহাও যে আমরা জানিতে চাই। আমি জানি, পাঠ্য-সূচীর সংস্র অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁহারা তাহা সম্পূর্ণ করিয়া নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাজ করিয়া যাইতেছেন, কিন্তু সেই কাজের স্বরূপ জানা বড়ই প্রয়োজন, সমস্ত প্রদেশের কল্যাণ সাধন করিবার জন্যই জানা প্রয়োজন।

কিন্তু এত করিয়াও আমরা পুরাতন ছাত্রবৃত্তি মাইনর পরীক্ষার মানের নিকট পৌঁছাইতে পারিতেছি কই? সেকালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার যতখানি জিনিস শিখিতে হইত তাহাতে ইংরাজি ছাড়া এণ্ট্রান্সে আর কিছু শিখিতে হইত কিনা সন্দেহ। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এইরূপ ধারা চলিয়া আসিয়াছিল। একালে কি আমরা পুরাতন ধারাপাত ও নামতার যুগ পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছি? নূতন নূতন শিক্ষাপদ্ধতি শেখার সঙ্গে সঙ্গে যদি পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলি, যাহাকে drilling বলে তাহা যদি না করাই, তবে শিশুদের শিক্ষার একটা মস্ত দিকই যে বাকি থাকিয়া যাইবে। তখন বাঙলা কত বেশি শেখানো হইত, অংক কত বেশি শেখানো হইত। মাইনর ছাত্রবৃত্তিকে এখন ষষ্ঠ শ্রেণীর সমপর্যায়ে আনা হইয়াছে, সুতরাং পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে টানিলেও তাহার চেয়ে মাইনর ছাত্রবৃত্তির মান আরও কিছু বেশি থাকিবে সে কথা অবশ্য ভুলি নাই। এখন নানারূপ পরিবর্তনে শিক্ষার পরিধি হয়তো বিস্তৃততর হইয়াছে, কিন্তু তাহার গভীরতা যদি কমিয়া গিয়া থাকে তবেই তো বিপদের কথা।

এ পর্যন্ত আমরা শুধু বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষার কথাই ভাবিতেছি; কিন্তু আরও দুই একটা কথা বলা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষা পাঁচ বৎসর ব্যাপী হইলেও তাহাতে ইংরাজির স্থান থাকিবে না, এ কথা পরিষ্কার ভাবে বোঝার দরকার। অর্থাৎ ১১+ বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ইংরাজি শিখিবে না। এখানে, ইংরাজি আদৌ পড়িবে কি না, সে প্রশ্ন অবতারণা করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরাজি বাদ থাকিবে, ইহা যদি স্থির হয়, তবে ইহাকে সর্বত্র গ্রাহ্য করিতে হইবে, কোনও স্কুলে পড়ানো হয় আর কোনও স্কুলে পড়ানো হয় না, এরূপ করিলে চলিবে না। রেশনের যুগে কেন, বিগত যুদ্ধের সময় হইতেই আমরা 'কিউ' করিয়া লাইন দিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছি; এক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে আগাইয়া যাইব, নিয়মকে বর্জন করিয়া, তাহা তো হইতে পারে না। একই নিয়ম সর্বত্র চলিবে, ইহাই হওয়া চাই।

ছাত্রের বয়সের দিক দিয়াও একটা কথা বলি; হয়ত প্রাথমিক শিক্ষকের দিক হইতে একেবারে অপ্রাসঙ্গিক না-ও হইতে পারে। সেদিন এক উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম। ষোল বৎসরের ছেলে খুব কমই চোখে পড়িল, যাহাদের দেখিলাম তাহাদের দৈহিক গঠনও বলিষ্ঠ নয়। আমরা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে গিয়া যেন শিশুর মস্তক ভারাক্রান্ত করিয়া তাহাকে শারীরিক দুর্বলতার অভিশাপগ্রস্ত না করি। শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু বেশি অল্প বয়সে বিষয়বস্তু শিক্ষা দিলে সুফলের পরিবর্তে কুফলেরই সম্ভাবনা। আশু সুফল হয়তো পরিণামে তিক্ত বা কটু ফলে গিয়া দাঁড়াইতে পারে।

সরদার প্যাটেল বেশি বয়সে লেখাপড়া শুরু করিয়াছিলেন, এই কথা শুনিয়াছি, এবং সকলকে এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলি যে, অতি অল্প বয়সে ছেলেকে অধিক অগ্রসর করিয়া দেওয়ার চেষ্টায়

পরিণামে হানি হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের চোখ খোলা থাকা প্রয়োজন। সরদার সাহেবের দৃষ্টান্ত একক নহে, সেকালের অনেকেই যে বয়সে পড়াশুনা করিতেন তাহা একালের লোকদের দৃষ্টিতে একটু কেমন যেন মনে হইবে। অথচ তাহাতে পরিণামে খারাপ হয় নাই, তাঁহাদের কেহ কেহ সুদূরপ্রসারী জ্ঞানানুশীলন করিয়া দেশে বিদেশে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন ও ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, একথাও বলা যাইতে পারে। আমি শুধু নিবেদন করিতে চাই যে প্রাথমিক শিক্ষার কালে, শুধু প্রাথমিক কেন সকল স্তরেই, বয়স আমরা বাঁধিয়া দিয়াছি বটে, কিন্তু ইহা যেন জাতীয় জীবনে কঠোর নিয়মের দাগ কাটিয়া না বসে, তাহা হইলে জাতির মূলে গিয়া আঘাত পড়িবে, শিশুমৃত্যু না ঘটিলেও শিশুদুর্বলতা সঙ্গীন রকমের দাঁড়াইবে।

নদীয়া সীমান্ত মেলা; পশ্চিম বাঙলার অনেক মেলাই যে তাই। নদীয়ার বহু উদ্বাস্তু বাস। কিন্তু এই সব কারণে এক দিক দিয়া যেমন নিত্য নূতন সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে তেমনি অন্য দিক দিয়া সম্পদও বাড়িতেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে নদীয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬০৩, এইমাত্র শুনিলাম এখন ৮৭২; মেদিনীপুরে ১৯৪৮-৪৯ সালে ছিল ৩৪৪০; চব্বিশপরগণায় ২,২২১ ও বর্ধমানে ১,০০৮; নিশ্চয়ই ইহার এখন সংখ্যাগত পরিবর্তন হইয়াছে। লোকবলও একটা বল, এবং মস্ত বড় বল। Human material-কে Splendid বলিয়া বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি। মানুষ মানুষ হিসাবেই সম্পদ। সুতরাং নদীয়ার এই নবলব্ধ সম্পদকে আমরা যেন বিপদ বলিয়া ভুল না করি। মধ্য প্রদেশে ও উত্তর প্রদেশে নবধারায় দেশগঠনের কাজ চলিয়াছে; গ্রামে সড়ক তৈয়ারি হইতেছে। ছুটিতে কমিশিবিরে উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে মাটি কাটিবার ও রাস্তা তৈরি করিবার জন্য একত্র হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে আছেন প্রাথমিক শিক্ষকেরা। তাঁহাদের প্রেরণা, তাঁহাদের ত্যাগ, তাঁহাদের উৎসাহ ভুলিবার নয়। জাতি গঠনের কাজ থেকে তাঁহারা দূরে থাকেন নাই। এই দিক দিয়া নবজাতি গঠনের দিকে প্রাথমিক শিক্ষকেরা শুধু শিক্ষা দান ছাড়াও কাজ করিতেছেন, তাঁহাদের সহজ নেতৃত্ব কার্যে প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের ক্রমবর্ধমান সমস্যা শুধু রাস্তা তৈয়ারি নয়, অন্য কাজেরও পথ দেখিতে চাহিতেছে। বয়স্ক শিক্ষার কথাটাই ধরি। প্রাথমিক শিক্ষকের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন একাজ হইতে পারে কি না সন্দেহ। এজন্য পৃথক পদ্ধতি, পৃথক মনোভাব, পৃথক সংগঠনের কথা স্বীকার করিয়াও আজকার দিনে তাঁহাদের তো বাদ দিতে পারি না। কি ভাবে তাঁহারা কাজ করিবেন সে আলোচনা এখানে নাই করিলাম, কিন্তু তাঁহারা পরিকল্পিত পথ করিয়া চলিবেন, শুধু শিশুর নয়, শিশু ভারতেরও নির্দেশন করাইবেন, ইহাই হইল তাঁহাদের কাজ।

ভারতবর্ষের অন্যত্র, মাদ্রাজ ও গুজরাটে প্রাথমিক শিক্ষার মোড় ফিরাইবার চেষ্টা করা হইতেছে। আমরা এই যে প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুকে কিশোরকে তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে বিযুক্ত করিয়া ফেলি, তাহার আয়ের বা পারিবারিক সাহায্যের কাজ হইতে সরাইয়া নিতে চাই, ইহাতে প্রাথমিক শিক্ষা বেশি অগ্রসর হইতে পারে না। আমরা চাই অধিকসংখ্যক শিশুকে মোটামুটি লেখাপড়া শেখাইতে। কি করিয়া তাহা সম্ভব? মাদ্রাজ একটা নূতন দিকে চেষ্টা করিতেছে। ছাত্রকে সপ্তাহে তিন দিন পাঠশালায় আসিতে হইবে। শিক্ষক অবশ্য ছয় দিনই পড়াইবেন। কিন্তু ছাত্র একদিন পর একদিন পাঠ গ্রহণ করিতে পারিবে। অন্যদিন সে তাহার স্বাভাবিক বৃত্তি কি আর কোনও বৃত্তির কাজ হাতে কলমে করিতে

চেষ্টা করিবে। সেবেরের সপ্তাহে তিন দিন বিদ্যালয়ে আসিলে চলিবে, অথবা প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা করিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে হইবে। আমরা দেখিতেছি, বুনিয়াদি শিক্ষা আমাদের দেশে এখনও ভালভাবে চালাইতে পারিতেছি না। রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, মহাত্মাজী হাতের কাজের কথা সুন্দর ভাবে বলিলেও দেশ তাহা গ্রহণ করিতেছে না। আমরা সকলেই মিথ্যাচার করিতেছি—কিন্তু মাদ্রাজের এই পদ্ধতিতে হয়তো আমাদের বুনিয়াদি শিক্ষার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে। গুজরাতে লোকভারতী প্রতিষ্ঠিত হইতেছে লোকশিক্ষার চেষ্টায়। প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনের ভার যাঁহাদের উপর, তাঁহাদের এসব বিষয় ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

নদীয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের কর্মীরা আমাকে এই সভায় উপস্থিত হইয়া শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিবার সুযোগ দিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। আমাদের এই সম্মেলন আশা করি ফলদায়ী হইবে, একদিকে শিক্ষকদিগকে সংগঠিত করিবে, অন্যদিকে দেশকে শিক্ষার পথে অগ্রসর করিয়া দিয়া জাতীয় জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। আমাদের সেই আশা পূর্ণ হউক।

বন্দে মাতরম্*

---

*নদীয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ।

বিদ্যালয়ে অনুবাদ শিক্ষা

[শ্রীবৈদ্যনাথ পাল]

বিদ্যালয়ে অনুবাদ শিক্ষা দেওয়া উচিত কিনা, এবং উচিত হইলেও সাহিত্য পত্রের মধ্যে তার অন্তর্ভুক্তি যুক্তিযুক্ত কিনা, সে সম্বন্ধে যুক্তি তর্কের আর শেষ নাই। বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী থেকে অনুবাদকে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী যাঁরা, তাঁরা বলেন—অনুবাদ পাঠ্যসূচীর মধ্যে কি করে স্থান পেল তার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তনের সময় অনুবাদের যথেষ্টই প্রয়োজন ছিল। ইংরাজেরা চেয়েছিল বাঙালীকে কেরাণী বা মুন্সী তৈরী করতে। কারণ আইন আদালতে, সরকার ও বণিকের অফিসে অনুবাদের কাজ প্রধানত কেরাণীদেরই করতে হত। তাই শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে অনুবাদ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে স্থান পেয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়াতে এখন সে প্রশ্নই আর ওঠে না। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুবাদের স্থান থাকার আর প্রয়োজনই নাই।

আবার, যাঁরা মনে করেন পাঠ্যসূচীতে অনুবাদের স্থান থাকলেও অনুবাদকে সাহিত্য পত্রের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়, তাঁদের কথা মোটামুটি এই যে, সাহিত্য পরীক্ষার প্রয়োজন মাত্র একটি ভাষায় দক্ষতা। আর অনুবাদকরণে দুটো ভাষাতেই দক্ষতা থাকার প্রয়োজন। সুতরাং একটি ভাষার পরীক্ষায় অপর একটি ভাষা জ্ঞানের দাবি করা সম্পূর্ণ অসঙ্গত ও যুক্তিহীন। উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বলেন যে, বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষায় ইংরাজি অনুবাদ থাকার অর্থই হল—ইংরাজি ভাষায় ছাত্রদের জ্ঞানের পরীক্ষা করা। কিন্তু

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরীক্ষায় ইংরাজি ভাষাজ্ঞানের যাচাই উঠবে কেন?

যাই হোক্, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বর্তমানে অনুবাদ শিক্ষার স্থান যখন রয়েছেই তখন আমাদের তা শেখাতেই হবে। তাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুবাদ শেখান সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মতামত গুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু না বলে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুবাদ শেখানর রীতি শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে অনেকদিন ধরে চলে আসা সত্ত্বেও বর্তমানে কেন ছাত্রছাত্রীরা তাতে তেমন সুবিধে করতে পারছে না, এবং সুবিধা করতে হলে কি ভাবে অনুবাদ শিক্ষণ কার্য চলবে তাই আমরা আলোচনা করবো।

ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে একটি দল যতই পুষ্ট হচ্ছে, ছাত্রছাত্রীদের ইংরাজি শিক্ষার স্পৃহা ততই কমে যাচ্ছে। এখানে স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজি শিক্ষার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কোনও রকম উৎসাহিত করেন না। ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণার অনেক রকম কারণ আছে স্বীকার করি, কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের অনেকের জেহাদ যে অপারগতার জন্য, একথা অস্বীকার করা যায় না। এই অপারগতা কি করে জন্মাল? অনুবাদ তো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সর্বত্রই শেখান হচ্ছে। তবুও কেন আমরা দেখছি যে, দিন দিন অনুবাদ শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে? এসব বিষয় খুব যত্ন নিয়ে চিন্তা করা দরকার। এর কারণের হয়তো অন্ত নেই। শিক্ষা পদ্ধতির পুঁথিগত আলোচনা ছেড়ে দিয়ে আমরা অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি স্থাপন করে বলতে পারি যে, এর মৌল নীতিতে গলদ রয়েছে। আমার জানা বিদ্যালয়গুলোর খবর নিয়ে দেখেছি—এটা হয়তো সারা বাংলা দেশের অনেক জায়গারই খবর হতে পারে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে কি করে অনুবাদ করতে হয়, সেটা ছাত্রছাত্রীদের শেখান হয় না। অথচ তাদের যথারীতি 'কাজ (task)' দেওয়া হয়। বহু বিদ্যালয়েই ছাত্রদের অনূদিত অংশ সংশোধন করে দেওয়া হয় এবং সংশোধনের সময় ব্যক্তিগত বক্তব্য নেওয়া হয়। কিন্তু না বুঝিয়ে দিয়ে শুধু সংশোধন করলে কি লাভ হয়, সেটা বোধ হয় ভেবে দেখা হয় না। শিক্ষকদের দ্বারা সংশোধিত অংশ পড়া ও মা' আর বই থেকে মুখস্থ করাও তা। মুখস্থ না করে ছাত্রের অনুবাদ করার শক্তি যাতে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। তাহলে আমাদের দেখতে হবে, কি করলে ছাত্রদের নিজে থেকে শেখার শক্তি বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে আমাদের প্রথম করণীয় হলো, অনুবাদ করার সময় ছাত্রছাত্রীরা যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেগুলো দূর করা। অনুবাদ জিনিসটা কি, তা' অনেক ছাত্রই বোঝে না। এ বিষয়ে তাদের ঠিকমত চিন্তা করার ইঙ্গন জোগানও হয় না। ফলে এ সম্বন্ধে তাদের ধারণা অস্পষ্ট থাকে। ঐ সম্বন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট করা সর্বপ্রথম দরকার।

অনুবাদ করার সময় আক্ষরিক অনুবাদ করার প্রবণতা ছাত্রছাত্রীদের খুব বেশি। পরীক্ষা দিয়ে এসে অনেককেই বলতে শুনেছি, ছাঁকা নম্বর পাবো, কোন কথারই অর্থ লিখতে বাদ দিইনি। অথচ ফল বার হবার পর যখন সে দেখে যে অনেক কম নম্বর পেয়েছে, তখন তার মনে নানা রকম সন্দেহের উদয় হয়। প্রায়ই মনে করে শিক্ষক বুঝি তার ওপর অবিচার করেছেন। কোন কথারও অর্থ লিখতে বাদ না দেওয়াতে তার অনুবাদ যে অনুবাদই হয়নি সে কথা সে মোটেই বোঝে না। তাই অনুবাদের 'কাজ' দেওয়ার আগে, কি ধরণের অনুবাদ তাকে করতে হবে সেটা লিখিয়ে দিতে হবে। আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ এবং মর্মানুবাদের মধ্যে ভাবানুবাদই যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজন, সেটা তাদের ভাল

করে বুঝিয়ে দিতে হবে। শব্দকে একক না ধরে বাক্যকে একক ধরে অনুবাদ করতে হবে। তা নইলে অনুবাদ সরল না হয়ে আড়ষ্ট হয়ে উঠবে।

ইংরাজি অনুবাদ করার সময় দেখতে পাওয়া যায়, যাদের হয়তো বাংলা ভাষায় ভাল জ্ঞান আছে কিন্তু ইংরাজি ভাষায় নাই তাদের ইংরাজি অনুবাদ মোটেই ভাল হয় না। সেই রকম বাংলা অনুবাদের সময় দেখা যায়, ইংরাজিতে ভাল জ্ঞান থাকলেও বাংলা ভাষায় যদি ভাল জ্ঞান না থাকে, তাহলে তার বাংলা অনুবাদ হাস্যোদ্দীপক হয়ে ওঠে। সেই জন্য অনুবাদে দরকার হচ্ছে দুটো ভাষাতেই ভাল দখল থাকা। যে ভাষা থেকে অনুবাদ করতে হবে শুধু সে ভাষারই নিয়ম কানুন জানলে চলবে না, যে ভাষায় অনুবাদ করতে হবে, সে ভাষারও নিয়ম কানুন জানতে হবে। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীরই দুটো ভাষায় ভাল জ্ঞান থাকে না বলেই অনুবাদে তারা এত অকৃতকার্য হয়। ইংরাজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করার সময় তারা অনূদিত বাংলাকে ইংরাজি ভাবাপন্ন করে তোলে, আর বাংলা থেকে ইংরাজিতে অনুবাদ করার সময় অনূদিত ইংরাজি অংশকে বাংলা ভাবাপন্ন করে তোলে। এর থেকে বোঝা যায় যে, ছাত্রছাত্রীদের স্বভাবই হচ্ছে সাদৃশ্য বজায় রাখা। এই দিক দিয়ে বিচার করলে ইংরাজি ও বাংলার সাদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি বেশি না দিয়ে বরং বৈসাদৃশ্য যেগুলো আছে সেই দিকেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। বৈসাদৃশ্যকে আমরা মোটামুটি দুভাগ করে নিতে পারি—ভাব ও ভাষার বৈসাদৃশ্য।

ভাষান্তর করার সময় ভাষার প্রাণশক্তি (Spirit of the Language) যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে সবিশেষ নজর দেওয়া দরকার। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—প্রথম ভাষায় যদি বীরত্ব ব্যঞ্জক ভাব থাকে, তাহলে দ্বিতীয় ভাষায়ও যেন সেই বীরত্বব্যঞ্জক ভাবটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে। কিন্তু প্রশ্ন হোল, কি ভাবে প্রথম ভাষার ভাবটি দ্বিতীয় ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারা যায়।

অনুবাদ করার সময় প্রথম ভাষায় নিহিত ভাবটি দ্বিতীয় ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে হবে অনূদিত ভাষার বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে, যাতে অনূদিত ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা যাঁরা বোঝেন না তাঁরাও সেই ভাবের যথাযথ রূপটি হৃদয়ঙ্গম করতে কোনও রকম কষ্ট না পান। সুতরাং প্রথম ভাষার ভাবটি দ্বিতীয় ভাষার পরিচিত পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাতে ফুটে ওঠে, সেই দিকে ছাত্রছাত্রীদের সতর্ক করে তুলতে হবে।

ভাবের পর ভাষার দিকটা দেখতে হবে। ভাষার দিক দিয়ে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব ইংরাজি ও বাংলার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে পদবিন্যাস প্রকরণ, শব্দের ও পদের প্রয়োগ, কালানুবর্তিতা, বাচ্য, উক্তি, বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ, প্রবচন, অলংকার প্রভৃতিতে।

এইবার আমাদের দেখতে হবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন্ কোন্ শ্রেণীতে কোন্ কোন্ পার্থক্যগুলো শেখানো ভাল হয় এবং কিভাবে সেগুলো শেখানো যেতে পারে। শিশুর মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশের স্তর অনুযায়ী এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীগুলোতে অর্থাৎ পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে, পদবিন্যাস প্রকরণ, শব্দ ও পদের ব্যবহার, কালানুবর্তিতা, বাচ্য, উক্তি প্রভৃতি শেখানো যেতে পারে, এবং উচ্চ শ্রেণীগুলোতে অর্থাৎ অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণীতে বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ, প্রবচন, অলংকার প্রভৃতি শেখানো যেতে পারে। যদিও আজকাল পঞ্চম শ্রেণীতে ইংরাজি শেখান সুরু করা হচ্ছে, তবুও একথা বলা যেতে পারে যে, পঞ্চম শ্রেণীতে বৎসরের শেষার্ধে ইংরাজি বাক্য গঠনের দিকে কিছু ঝোঁক দেওয়া যেতে পারে, রচনার প্রথম সোপান হিসেবে। এই শ্রেণীতে বৎসরের

শেষার্ধে আশা করা যায় ছাত্রছাত্রীরা ইংরাজি পদের পরিচয় লাভ করবে। বাংলা পদের সঙ্গে এর অনেক আগেই তাদের পরিচয় ঘটেছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং বাক্যগঠনের সময় ইংরাজি ও বাংলা পদস্থাপনা অর্থাৎ কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার অবস্থিতির যে পার্থক্য তা তাদের বোঝালে বুঝতে পারবে বলে আশা করা যায়। তারপর ক্রমশ আরম্ভ করতে হবে কালানুবর্তিতা, বাচ্য, উক্তি প্রভৃতি।

অষ্টম শ্রেণীই হচ্ছে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক পরিবর্তনের ক্ষেত্র। সাধারণত দেখা যায় এই শ্রেণীতেই ছাত্রছাত্রীরা দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধিলাভ করে। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রে আর অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রে—দেহে, বুদ্ধিতে, আচার ব্যবহারে যে কত পার্থক্য তা অনেকেই নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন। তাই অষ্টম শ্রেণীকে যদি একটু উচ্চস্তরের আলোচনার প্রথম সোপান ধরা যায়, তাহলে আমার মনে হয় খুব অন্যায় করা হয় না। সুতরাং বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ, প্রবচন, অলংকার প্রভৃতিতে ইংরাজি ও বাংলায় যে পার্থক্য রয়েছে, সেগুলো এই শ্রেণী থেকে শেখান যেতে পারে।

এখন কথা হোল, কিভাবে এই শিক্ষাদান কার্য চলবে? যদিও বলা হয়েছে যে অনুবাদের প্রথম কাজ সুরু হবে বাক্য গঠনের দিক দিয়ে, তবু একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে ছাত্রছাত্রীদের বাক্য গঠন করাবার সময় স্বাভাবিকতার সীমা যেন লঙ্ঘন করা না হয় সে বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। অনুবাদের বিষয়বস্তুও ছাত্রছাত্রীদের মানসিক শক্তির বিকাশের ক্রমোন্নত স্তর অনুযায়ী মূর্ত থেকে বিমূর্তের দিকে এগিয়ে চলবে। নিম্নশ্রেণীতে অনুবাদের বিষয় হবে পরিচিত পরিবেশের মধ্যে। ছাত্রছাত্রীরা প্রতিদিন তাদের চার পাশে যা দেখছে সেইগুলোই হবে অনুবাদের বিষয়বস্তু। বাক্যের সৌন্দর্যের দিকে জোর না দিয়ে ভাবের স্পষ্টতার ওপর জোর দিতে হবে বেশি।

যেহেতু উচ্চতর শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক শক্তির বিকাশ বেশি হয় এবং বিমূর্ত জিনিসের সম্বন্ধে চিন্তা করার শক্তিও বৃদ্ধি পায়, সেইজন্য উচ্চতর শ্রেণীতে অনুবাদের বিষয়বস্তু অন্তর্পাত্মক হতে পারে। এই স্তরে শুধু ভাব প্রকাশের দিকে দৃষ্টি দিলেই চলবে না, ভাষার সৌন্দর্যের দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে।

ভাষার বিশুদ্ধতা লাভের উপায় হল অনুশীলন। অনুশীলন যদি বন্ধুধর্মী হয় তাহলে সেটি আরও হয়ে যাবে। তাই অভ্যাসটা করাতে হবে প্রতিযোগিতা ও খেলার মাধ্যমে। তবেই বিষয়বস্তু মনোজ্ঞ হবে এবং ছাত্রছাত্রীরাও একাগ্রতার সঙ্গে তাতে রত থাকবে।

অনুবাদে আমরা ভাল ভাষা শৈলী (Style) আশা করি। অন্য লোকের ভাষা শৈলী অনুকরণ করালে কিন্তু কোনও লাভ হবে না, তাতে নিজের মৌলিকত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। ভাবকে যথাযথ প্রকাশ ও ভাষাকে সুন্দর করে তোলার কাজের ভেতর দিয়েই নিজস্ব শৈলীর বীজ অংকুরিত হয়ে উঠবে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, ভাল ভাষাশৈলী আয়ত্ত করতে হলে আদর্শেরও প্রভাব থাকা চাই। তবে একথাও ঠিক যে, আদর্শ শৈলী চেষ্টার দ্বারা অনুকরণ করা যায় না, তার প্রভাব ছাত্রছাত্রীদের ওপর অজ্ঞাতসারে ও অলক্ষিত ভাবে পড়লেই ফল হয় ভাল। এই জন্য শিশুকাল থেকে শিশুদের ভাল ভাল ছড়া পড়ান শ্রেয়। যে সব শিক্ষকদের ওপর ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে তাঁদের ভাষাও যেন সুন্দর, সুমার্জিত হয় এবং উচ্চারণে কোনও রকম ত্রুটি যেন না থাকে। তা হলে তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁদের ভাষার প্রভাবে ছাত্রছাত্রীদেরও লিখন রীতি ও বাচন ভঙ্গী সুন্দর হতে থাকবে। এইরূপে তাদের লিখনরীতি

স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়ে উঠবে। তাতে অনুবাদও হবে মনোরম।

আমার মনে হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুবাদ শেখানর সময় উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখলে অনুবাদ শিক্ষাদান কাজটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়ে ক্রমশ সফলতার দিকে এগিয়ে চলবে, আর তার ফলে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমতে থাকবে।*

* বিভিন্ন প্রকার অনুবাদ সম্বন্ধেই আমার বক্তব্যগুলি প্রযোজ্য। তবে ইংরাজি ও বাংলা অনুবাদের মাধ্যমেই আলোচনা করা হয়েছে।

কমেনিয়াস

[শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দে]

কমেনিয়াসের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমেই তাঁহার ব্যাপক ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলিতে হয়। তাঁহার পূর্বে কোনও অন্য কোন শিক্ষাবিদ্ শিক্ষাকে সকল জনার গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। এ যুগে আমরা গণতান্ত্রিক ভাবধারায় পরিপুষ্ট। আমাদের পক্ষে সকলের জন্য শিক্ষার কথা ভাবা কেবল মহৎ কল্পনা নয়, বর্তমান সমাজ গঠনের ইহা এক অপরিহার্য চিন্তা ও কার্য। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় ভাবধারার পরিবেশে সকলের জন্য শিক্ষার কথা চিন্তা করা এবং সেজন্য পরিকল্পনা রচনা করা যে গভীর দূরদৃষ্টির পরিচায়ক সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই।

বর্তমান যুগে সার্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের আদি প্রেরণা প্রধানত রাজনৈতিক, কারণ জনগণের রাজনৈতিক চেতনা সম্যকরূপে বিকাশ লাভ না করিলে গণতন্ত্রের সাফল্য সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার বিকাশ দরকার, নতুবা ক্ষমতার অপচয় অথবা অপপ্রয়োগ হওয়ার সম্ভাবনা। সেজন্য এ যুগে সর্বসাধারণের শিক্ষাকে সার্থক গণতন্ত্রের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করা হয়। কিন্তু কমেনিয়াস যে সকলের জন্য শিক্ষা বিস্তারের কথা ভাবিয়াছিলেন, তাহার মূলে কোন রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল না। ঈশ্বরবিশ্বাসী একজন সাধু ও সজ্জন ব্যক্তি যেরূপ সকলের শিক্ষা চাহেন মানবত্তার সেই উদার ভূমিই ছিল কমেনিয়াসের আশ্রয়। মানুষের মধ্যে যে অপরিসীম সম্ভাবনা মানবসৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত হইতেই দেখা দিয়াছে- এবং যে সম্ভাবনা ধীরে ধীরে রূপ লইয়া সমগ্র মানবজাতিকে বৃহত্তর চেতনলোকে লইয়া যাইতেছে, তাহা কোথায় কখন কোন বিশেষ মানুষের মধ্যে স্ফুরিত হইবে তাহা কাহারও জানা নাই, সুতরাং সকলের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রচার মানবের অগ্রগতির সহায়ক। কোন একটি মানুষও যদি অজ্ঞতার অন্ধকারে থাকে, তাহাতে কেবলমাত্র তাহার ব্যক্তিগত অথবা তাহার পরিবার ও সমাজের ক্ষতি নহে, সমগ্র মানব জাতির ক্ষতি।

একালে রাজনৈতিক তাগাতোলে সার্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা নিজেদের যথেষ্ট প্রগতিশীল বলিয়া মনে করি, কিন্তু নিছক মানবত্তার ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া সকলের মঙ্গল হোক, সকলের নিকট সত্য প্রতিভাত হোক, এই উদার মন্ত্র আজও সমস্ত অন্তর দিয়া উচ্চারণ করিতে পারি কিনা সে বিষয়ে

সন্দেহের অবকাশ আছে, কিন্তু এ বিষয়ে কমেনিয়াসের দৃষ্টি ছিল বিস্ময়কররূপে স্বচ্ছ ও সংস্কারমুক্ত। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ The Great Didactic-এর প্রারম্ভে লেখা আছে—A certain inducement to found such schools in all the Parishes, Towns and Villages of every Christian kingdom that the entire youth of both sexes, none being excepted, shall quickly, pleasantly, and thoroughly become learned in the Science, pure in Morals, trained in Piety, and in this manner instructed in all things necessary for the present and for future life. কমেনিয়াসের এই উক্তির মধ্যে তাঁহার শিক্ষানীতির মূল সত্য নিহিত আছে। স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে খ্রীষ্ট জগতের সমগ্র তরুণ সমাজকে বিজ্ঞান, নীতি ও ধর্মে শিক্ষিত করিবার উদার ভাবনা তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল। এই শিক্ষা কেবল যে দ্রুত হইবে তাহা নহে, ইহা আনন্দের মধ্য দিয়া পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, তাঁহার শিক্ষানীতি বর্তমান জীবনের প্রয়োজনগুলিকে অস্বীকার করিয়া নয়, ইহাদের সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াই অগ্রসর হইবে। কিন্তু বর্তমানই ইহার শেষ কথা নয়, ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনও এই শিক্ষাকে মিটাইতে হইবে।

অর্থাৎ কমেনিয়াসের শিক্ষাতত্ত্বে মানবতার (রাজনীতি নহে) উপর দাঁড়াইয়া সকলের প্রতি উদার আহ্বান, শিক্ষার সহিত নীতি ও ধর্মের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ, এবং জীবনের বাস্তব প্রয়োজনকে স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎকে গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা দেখা যায়।

সমসাময়িক বিদ্যালয়গুলি যে নানাদিক দিয়া বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ ছিল, এ সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। বিদ্যালয়ের পরিচালনা, শিক্ষা-পদ্ধতি অথবা শিক্ষানীতি সম্বন্ধে কেবল সমালোচনা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের জন্য তিনি একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনাটির অন্তর্নিহিত নীতি অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, মানব প্রকৃতির কতকগুলি চিরন্তন সত্য তাঁহার মনে প্রতিভাত হইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, এ যুগে যাহাকে শিক্ষামনোবিজ্ঞান বলা হয়, Educational Psychology, তাহার কয়েকটি মূল্যবান তথ্য তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যেমন—

(১) একঘেয়ে ভাবে শিক্ষা না দিয়া শ্রেণীতে শিক্ষা দিলে কতকগুলি বিশেষ সুফল পাওয়া যায়।

(২) শিক্ষা অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে অগ্রসর হইবে। প্রহার, কঠোর শাসন অথবা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা—এগুলি শিশুর প্রকৃতি ও মনোধর্মবিরোধী, সুতরাং এগুলি পরিহার করিতে হইবে।

(৩) অবাস্তব ও অসার কোন কিছু শিশুর সম্মুখে উপস্থিত না করিয়া তাহাকে যতদূর সম্ভব বাস্তব জগতের খাঁটি তথ্য পরিবেশন করিতে হইবে।

(৪) শিক্ষা ব্যাপারে আপাগোড়া কঠিনের কোন কিছু থাকিবে না। দান ও গ্রহণ সম্পন্ন হইবে সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, একটি বিষয়ে কমেনিয়াস প্রয়োজনানুরূপ গুরুত্ব দেন নাই। তাহা শিক্ষা কার্যে শিক্ষকের ভূমিকা। শিক্ষাকে আমরা যতই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক সূত্রে বাঁধি না কেন, শেষ পর্যন্ত শিক্ষাদান কাজটি আসলে রসায়নের রূপদান। শিশুমনের গভীরতম গহনে প্রবেশ করা এবং তাহার ভাবনা কামনা ও স্বপ্নের সহিত পাঠ্য বিষয়কে গাঁথিয়া তোলা শিল্পীর

কাজ। শিক্ষার আয়োজন উপকরণ যতই বিজ্ঞান-সম্মত হোক, উপস্থাপন পুরাপুরি শিল্প প্রচেষ্টা। কমেনিয়াস শিক্ষার এই শিল্পের দিক সম্বন্ধে হয়ত খুব সচেতন ছিলেন না। তাই তিনি লিখিয়াছেন: As soon as we succeed in finding the proper method, it will be no harder to teach school boys, in any number desired, than with the help of the printing press to cover a thousand sheets daily with the neatest writing. কমেনিয়াস পদ্ধতির উপর এত বেশি জোর দিয়াছেন যে তাঁহার নিকট শিক্ষক যেন শিক্ষাদান কার্যের একটি যন্ত্র। সত্যই 'মেথড' বা পদ্ধতিকে শিক্ষকের উপর স্থান দেওয়া চলে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত কমেনিয়াস 'মেথড' বলিতে কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন, কারণ তাঁহার মতে প্রকৃতি শৃঙ্খলা ও পদ্ধতির আদি উৎস। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়ম আছে, শৃঙ্খলা আছে, একথা সত্য, কিন্তু মানব সত্তাকে প্রকৃতি হইতে বাদ দেওয়া চলে না।

কমেনিয়াসের সকল মতামত আমরা গ্রহণ করিতে না পারিলেও একথা ঠিক যে, তিনি তাঁহার পূর্বতন শিক্ষাবিদ্‌গণ হইতে আরও অধিক প্রগতিশীল মতামত পোষণ করিতেন। তিনি বলেন, "আমি যে শিক্ষার কথা বলি তাহা মানুষের জন্য যাহা কিছু ভাল তাহাই গ্রহণ করিবে, এবং পৃথিবীর সকল মানুষই সে শিক্ষার অংশ গ্রহণ করিবে।" আদর্শের দিক হইতে ইহা কত উদার ও ব্যাপক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষাকে আরও নিয়ম ও পদ্ধতির মধ্যে আনা, শিক্ষাদান কার্যটি ছাত্রের নিকট আরও সহজ ও আনন্দময় করিয়া তোলা, বিদ্যালয় গৃহকে একটি মনোরম পরিবেশের মধ্যে স্থাপিত করা, বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সুন্দর সুন্দর শিক্ষণীয় ছবি ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি রাখা, ছেলেদের খেলার মাঠ ও উদ্যানের ব্যবস্থা করা—ইত্যাদি তাঁহার শিক্ষাতত্ত্বে গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক।

শুধু আদর্শ ও তত্ত্বের মধ্যেই তিনি তাঁহার চিন্তা আবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহার লিখিত পাঠ্য-পুস্তক তৎকালে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল, এবং তাঁহার Orbis Pictus শিশুদের প্রথম ছবির বই।

বিদ্যালয়ের নিয়ম শৃঙ্খলা সম্বন্ধে তাঁহার মতামত আধুনিক শিক্ষামনোবিজ্ঞানের সমর্থনপুষ্ট। তিনি বলেন, শিশু যদি পাঠ গ্রহণে উন্মুখ না হয় তবে তাহাকে প্রহার করিয়া কোন লাভ নাই। শিশুর আগ্রহকে ঠিকমত জাগানো হয় না বলিয়াই শিশু পড়াশোনায় মনোযোগী হয় না। এ জন্য দায়ী শিশু নয়, শিক্ষকের ইচ্ছা ও আগ্রহের অভাব, নতুবা শিশু চরিত্র সম্বন্ধে তাহার প্রাথমিক জ্ঞানের অভাব। বেসুরা শব্দ করিলে গায়ক যেমন তাঁহার বীণাকে আঘাত করেন না অথবা তাহা ত্যাগ করেন না, বরং বেসুরো তারটিকে সুরেল করার দিকে মন দেন, তেমনি শিশুর মন-যন্ত্রটিকেও বাজাইতে হইলে প্রথমে চাই তাহার প্রতি স্নেহময় কোমল ব্যবহার এবং শিশুকে বুঝিবার আগ্রহ।

কমেনিয়াসের আজীবন চেষ্টা, শিক্ষা জগতে নূতন আলোক সন্ধানের চেষ্টা। শিক্ষার অমৃতময় প্রসাদকে সকল জনার কাছে আনিয়া দিবার জন্য, শিক্ষাকার্যকে সহজ ও সুখময় করিবার জন্য ও শিশু জীবনকে আরও উদার দৃষ্টি দিয়া দেখিবার এই সাধনা এ যুগেই বা কয়জন করিয়া থাকেন! কমেনিয়াসের চিন্তাধারা স্বীয় যুগকে অতিক্রম করিয়াছিল। তাই জীবিত কালে পূর্ণ স্বীকৃতি না পাইলেও শিক্ষার চিরন্তন অমৃতলোকে তাঁহার ভাবনা ও সাধনা অম্লান নক্ষত্রের মত জ্যোতি বিকিরণ করিবে।

চিঠি

[শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস]

শ্রীচরণেষু

মাষ্টার মশাই, আজ পেরু দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা লিখিব। সে দেশের এক মাষ্টার মশাই এখানে শিক্ষা বিষয়ে এম, এ, পড়িতে আসিয়াছেন। তিনি সেদেশের বি, এ,; ডক্টরেট ডিগ্রীও পাইয়াছেন। কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ডক্টরেট ডিগ্রী মর্যাদা পায় না। সে দেশে এম,এ, ডিগ্রীর চলন নাই। এদেশে কিন্তু বি,এ, পাশ করিয়া ডক্টরেট পড়িবার সুবিধা আছে, এম,এ, পাশ করিবার প্রয়োজন হয় না। কোনও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট পড়িতে পড়িতে এম,এ, ডিগ্রী পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত গিরিশ সাহিত্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টরেট পাইয়াছিলেন। "শনিবারের চিঠি" তাহাতে খাপ্পা হইয়া লেখেন যে তিনি এম,এ, পাশ নন; মাত্র একজন বি,এ। প্রচলিত প্রথা ব্যতিক্রম হইলেই সাধারণত লোকে তাহা অবজ্ঞার চক্ষে দেখে।

রূপার জন্য পেরুর খ্যাতি। দেশের আয়তন ১,২৪৯,০০০ কিলোমিটার; লোক সংখ্যা ৮,০০০,০০০, ভাষা স্প্যানিশ। এই পশ্চিম গোলার্ধের মেক্সিকো হইতে চিলির প্রান্ত সীমা পর্যন্ত এক ব্রাজিল ছাড়া প্রায় সব দেশের ভাষা স্প্যানিশ—তাহাদের মাতৃভাষায় এসপানিয়ল বলে। একদা জগৎ জুড়িয়া স্পেনের রাজ্য ছিল; আরব এবং তুর্কীদের মত তাহাদের পিপাসাও ছিল।

গত শতাব্দীর প্রথম হইতে পতন আরম্ভ হয়। আমাদের দেশে ইংরাজ রাজত্বের সূচনায় যেমন পেশোয়া, বাদশা, মহারাজা, রানা, ওমরাহ প্রভৃতি ইংরাজ কোম্পানির কৃপা ভিখারী হইতেন, পিতা পুত্রের বিরুদ্ধে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে রাজত্ব পাইবার আশায় অভিযোগ করিতেন, নেপোলিয়নের সময় তেমনই স্পেনে ঐ একই ঘটনা ঘটিয়াছিল। ছলে বলে কৌশলে নেপোলিয়ন স্পেন দখল করিলে পশ্চিম গোলার্ধের সব রাজ্যগুলিই স্পেনের সম্পর্ক ত্যাগ করিল।

পেরুতে শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা আছে। নার্সারী ৩+—৪ বছর বয়স পর্যন্ত; কিণ্ডারগার্টেন ৪+—৬; "Transition" সময় ৬—৭; প্রাইমারী ৭+—১১ বয়স পর্যন্ত। সব শিক্ষাই অবৈতনিক; প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক। ইহার পর "Test Madurez" পরীক্ষায় যাহারা পাশ করিতে পারে তাহারা হাইস্কুলে ভর্তি হইতে পারে; বার্ষিক মাত্র সাড়ে পাঁচ ডলারের কিছু বেশি বেতন লাগে; কিন্তু শতকরা ৬৮ জনের বেশি ছাত্র বিনা বেতনে পড়িতে পারে। ঐ "Test Madurez" পরীক্ষার ফল দেখিয়া তাহাদের বিষয় বিবেচনা করা হয়। হাই-স্কুলে পাঁচ বছর পড়িতে হয়। কলেজে দুই বছর Pre-medicine, Pre-Enginering, Pre-Science, Pre-letters (অর্থাৎ Pre-liberal arts) পড়িতে পারা যায়। তারপর ঐ সব বিষয়ে বিশেষ বিশেষ কলেজে পড়িতে হয়। যেমন মাস্টারির জন্য চার বছর পড়িতে হয়। যে ডিপ্লোমা পাওয়া যায় তাহাকে Professor de Segunda Ensenanza বলে। ডক্টরেটের জন্য আরও দুই বছর পড়িতে হয়। দেশে দশটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

নার্সারী শিক্ষায় খেলাধূলা, অভ্যাস গঠন এবং বাড়ীর আবহাওয়ার সাথে খাপখাওয়াইতে বিশেষ-ভাবে যত্ন লওয়া হয়। কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে নার্সারী স্তরের উপযোগী বিষয় বেশি করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। ট্রান্সিশান শিক্ষায় লিখিবার এবং

পড়িবার অভ্যাসের উপর এবং প্রাথমিক অঙ্ক শিখাইবার উপর জোর দেওয়া হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু সহর অঞ্চলে—গ্রাম্য অঞ্চলে নাই। নার্সারীকে পেক্ষ বলে gardio বলে।

নার্সারী হইতে প্রাইমারী শিক্ষার প্রথম তিন শ্রেণী পর্যন্ত সহশিক্ষার চলন আছে। কলেজে সহ শিক্ষা, কিন্তু মাষ্টারি শিখিবার কলেজে সহশিক্ষার চলন নাই।

প্রাথমিক শিক্ষায় স্প্যানিশ, অঙ্ক, জীবজন্তু, সূর্য, চন্দ্র, পাহাড় পর্বত, ইতিহাস, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন প্রভৃতি প্রথম তিন শ্রেণীতে পড়িতে হয়। Correlation এর উপর খুব জোর দেওয়া হয়। এই প্রথম তিন শ্রেণীকে Premier Grado বলে। পরের দুই শ্রেণীকে Segundo Grado বলে। সেখানে অঙ্ক, পশুবিদ্যা ইতিহাস, স্প্যানিশ, ভূগোল, পৌরবিদ্যা (Civics) এবং হাতের কাজ যেমন—কামার এবং ছুতোরের কাজ, এবং কৃষি কাজ শিখান হয়। গ্রাম্য অঞ্চলে অস্তর দ্বারা চাষ হয়—এখনও tractor এর বিশেষ চলন হয় নাই।

হাইস্কুলে পাঁচটি শ্রেণী আছে। যে যে বিষয় পড়ান হয় তাহাদের ইংরাজি নাম দিলাম—Mathematics, Foreign Langugage, Spanish, Social Science (Peruvian History and Geography; General History and Geography), Astronomy, Economics, Psychology, Philosophy, Logic, Ethics, Manual activity, Biology, Anatomy, Physiology, Chemistry, Physics, Trigonometry, Mineralogy এবং Correlated extra-curricular activities.

বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য কৃষি, ব্যবসা ও শিল্প বিদ্যালয় আছে; দুই হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত পড়িতে হয়।

স্কুল ১লা এপ্রিল হইতে বছর আরম্ভ হয়। ২০শে ডিসেম্বর শেষ হয়। শিক্ষকদের বেতন প্রাইমারি স্কুলে মাসে ১০০ ডলার; হাইস্কুলে ১৫০ ডলার এবং কলেজে ২০০ ডলার। মাষ্টার মহাশয়ের ঠিকানা:

Senor Victor Moya Mendez
P. Llangaenvco No. 1877
Lima, Peru.

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

নিয়ন্ত্রণী। শুকদাস। প্রকাশক—শ্রীগিরীন্দ্র কুমার দে, যোগমায়াসংঘ ক্ষীরোদাময়ী বিদ্যাপীঠ, লক্ষণপুর (মানভূম)। ১৩৫৯ মহালয়া। মূল্য ৪৲ চার টাকা।

শিক্ষা ও সেবা, বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই দুইটির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। বাস্তবে কি করিয়া এই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটাইতে পারা যায় তাহার সন্ধান করিতে শিক্ষক মাত্রেরই ব্যগ্র হওয়ার কথা। আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাও এইরূপ যোগের সম্ভাবনা উৎসুক ভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক এই সম্ভাবনাকে রূপ দিয়াছেন। যুগবাণীর অভিব্যক্তি রূপেই ইহাকে ধরিয়া লইতে পারি।

কিন্তু এই উপন্যাস বা কথাসাহিত্যের আকারে বর্ণিত আদর্শ শুধুই পটে লেখা চিত্র নয়। লক্ষণপুর বিদ্যাপীঠের অভিজ্ঞতার কথা ইহাতে বর্ণিত আছে। মূল্যের তিন চতুর্থাংশ ছাত্রনিয়ন্ত্রিত সেবা কেন্দ্র কয়টির পরিচালনায় ব্যয় করা হইবে। এই বিজ্ঞপ্তি পাঠকে বর্তমান ভারতে নব শিক্ষা দানের কোথায় কিরূপ চেষ্টা চলিতেছে স্বভাবতই তাহার প্রতি জিজ্ঞাসু করে।

মুদ্রাকর-প্রমাদ বিস্তর, এবং সেগুলি সহজে সংশোধন করা যাইত। তাহা হইলেও ছাত্রশিক্ষক সম্পর্কের চিত্রগুলি মনকে তৃপ্ত করে। লেখকের সাধনার ভিত্তি দৃঢ় হউক এবং সুধাবরের মত কৃতী শিক্ষক আমাদের ছাত্রসমাজের প্রগতি নিয়ন্ত্রিত করুন, এই কামনা করি।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | শ্রাবণ ১৩৬০ | ৯ম সংখ্যা

আলোচনা

বিদ্যালয়-গৃহ সমস্যা ও মুক্ত-অঙ্গন শিক্ষা

আগামী আগষ্ট মাসের শেষে সুইজারল্যাণ্ডে বিদ্যালয় গৃহ ও মুক্ত-অঙ্গন-শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে। অভিজ্ঞতার ফলে জানা গিয়াছে যে, বন-বিদ্যালয়, খোলা মাঠে বিদ্যালয়, দিনের বেলায় নার্সারী স্কুল এবং আরোগ্যনিকেতন বিদ্যালয়গুলি আর্ত ও পীড়িত বালক বালিকাদের শিক্ষার বিশেষ সহায়ক হইয়া উঠিয়াছে। এই পঞ্চম সম্মেলনে প্রধানত দুইটি প্রধান বিষয় নিয়া আলোচনা হইবে, গৃহ-সমস্যা ও মুক্ত-অঙ্গন-শিক্ষা-ব্যবস্থা। প্রসঙ্গ দুইটির ব্যাপক আলোচনা করিতে গেলে আনুষঙ্গিক নানা প্রশ্নেরও আলোচনা অনিবার্য। এই সম্মেলনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় যে ইহা একটি মাত্র স্থানে আবদ্ধ থাকিবে না। বর্তমান সম্মেলন জুরিখ, জেনেভা প্রভৃতি চার পাঁচটি জায়গায় অনুষ্ঠিত হইবে। জুরিখে একটি নূতন ধরণের বিদ্যালয়-ভবনের আদর্শ প্রদর্শিত হইবে।

শিশুদের বিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্বন্ধে যত আলোচনা হয়, ততই মঙ্গল। শিশুর দেহমন বিধাতার সুকুমারতম সৃষ্টি, তাহার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য যেমন চাই মানুষের চরম সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রণালী, তেমনই চাই প্রকৃতির অকৃপণ আলো হাওয়ার উদার অবদান। মাটির সঙ্গে যোগ নষ্ট হইলে যেমন গাছ বাঁচে না, নিখিল প্রকৃতির সঙ্গে যোগ খর্ব হইলে শিশুর প্রাণ স্পন্দিত হয় না, চিত্তবৃত্তি সবল হয় না, দৃষ্টি মুক্ত হয় না, প্রবৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যসাধন হয় না। এ বিষয়ে পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলন কি মীমাংসায় উপস্থিত হন তাহা দেখিবার বিষয়।

বিদ্যাসাগর স্মৃতি ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশের দুইজন শ্রেষ্ঠ পুরুষের তিরোভাবের জন্য নানা জায়গায় স্মৃতিসভার আয়োজন হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতিসভায় সাংবৎসরিক অধিবেশনে ১৩০২ সালের ১৩ই শ্রাবণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহা

হইতে কিছু উল্লেখ করিয়া আমরা বাঙলার এই মহামানবকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি।

"ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতিগোত্রের কেহ ছিল না। এদেশে তিনি সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি উপকার করিয়া কৃতজ্ঞতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা পান নাই। তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন, আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা পালন করি না, আমরা অহংকার দেখাইয়া তৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না, ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপ্রমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান।"

বিদ্যাসাগর সর্ব বিষয়েই ইহার বিপরীত ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার বিশেষ ক্ষণটিতে কবিগুরু আমাদের জাতীয় চরিত্রের যে মহৎ দোষগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, আজও কি আমরা সেই সব দোষ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি?

"দয়া নহে, বিদ্যা নহে, বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব" এই কথা যদি আমরা মনে প্রাণে উপলব্ধি করিতে পারি তবেই বাঙালীর জাতীয় জীবন উন্নত হইবে।

ছাত্র ও শিক্ষকের যোগ

পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার হার না বাড়িলেও অথবা অতি প্রকট রকমে কম না হইলেও যত ছাত্রছাত্রী ক্রমশ উচ্চশিক্ষার অভিলাষে অগ্রসর হইতেছে তাহাদের সংখ্যা বড় কম নয়। সেইজন্য বহু লোকের নিকট জ্ঞান পৌঁছাইয়া দেওয়ার আয়োজনও বিজ্ঞানের সাহায্যে অনুষ্ঠান দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা কেবল তথ্য বিকিরণ নয়, তত্ত্ব বিতরণও বটে, চক্ষু উন্মীলনের ব্যাপারও বটে, অর্থাৎ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ব্যক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন।

সম্প্রতি আমেরিকার অনেক শিক্ষাবিদ্ এদেশে আসিয়া ও এখানকার উচ্চশিক্ষার বহর ও ব্যবস্থা দেখিয়া এই কথাটিরই উপর নাকি জোর দিয়াছেন। কথাটি যে খুবই খাঁটি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে ইহা একটা নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু এখনকার যুগ জনগণের যুগ, অল্প সময়ে বেশি কাজ করার যুগ—তবে সেই বেশি কাজ করার মধ্যে যাহাতে সবটাই না ফাঁকা হয় সেজন্য উপরোক্ত শিক্ষাবিদ্ যে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্মরণীয়। আমাদের প্রাথমিক হইতে উচ্চ শিক্ষা পর্যন্ত সর্বত্র ছাত্রশিক্ষকের এই যোগ থাকাই চাই।

দশ হাজার শিক্ষাকর্মী

সংবাদ পত্রে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করিবেন। পশ্চিম বঙ্গের প্রায় ৩৫ হাজার গ্রামের মধ্যে এই দশ হাজার শিক্ষক ছড়াইয়া পড়িবেন। ইঁহারা যে কেতাবী শিক্ষাই দিবেন তাহা নয়, বরং শিক্ষা ছাড়া গ্রামের কোন না কোন সেবাকর্ম লইয়া থাকিবেন—শিক্ষা হইবে তাহার একটি অংশ মাত্র। এখানে অবশ্য সরকার প্রাথমিক শিক্ষার কথাই বলিতেছেন। এই দশ হাজার শিক্ষাকর্মী যদি সুনির্বাচিত হন, এবং কোন ভাল পরিকল্পনা অনুসারে যদি তাঁহাদের প্রস্তুত করা যায়, তবে আশা করা যায় যে পশ্চিম বঙ্গের রূপ অনেকখানি বদলাইয়া যাইবে, আর শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের যে প্রচলিত ধারণা তাহাও বদলাইয়া যাইবে। বুনিয়াদি শিক্ষায় অর্থ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা। আজ

যদি কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নাও হয় তাহা হইলেও কর্ম ও শিক্ষা একসঙ্গে যুক্ত হইলে শিক্ষার্থীর ও দেশের কল্যাণ হইবে। এ বিষয়ে সরকারি পরিকল্পনা কিভাবে রূপায়িত হইবে, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উৎসুক রহিলাম।

মার্কিন শিক্ষাব্রতী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল

বিশিষ্ট মার্কিন শিক্ষাব্রতী ডাঃ লিও মার্টিন চেম্বারলেন ভারত ও পাকিস্থান ভ্রমণে বাহির হইয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। তিনি ভারতের কয়েকটি কলেজে বক্তৃতা দিবেন এবং ভারতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিবেন। শিক্ষাসংক্রান্ত কোন কোন বিষয়ে ভারত সরকার তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবেন। ডাঃ চেম্বারলেন কৃতী অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে সুপরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য। ইঁহার বক্তৃতার মধ্যে আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা, উচ্চ শিক্ষার অবস্থা, ছাত্রজীবন ও সমাজের সঙ্গে তাহাদের যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য থাকিবে।

আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছে—শুধুই মার্কিন ছাত্র এই দলের মধ্যে নাই, ইঁহারা বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বিভিন্ন পরিবেশ হইতে আসিয়াছে। ইঁহারা যেমন মার্কিন জীবন যাত্রার প্রণালী, বিশেষ করিয়া ছাত্র জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন—তেমনই ভারতের ছাত্র-সমাজ ও ছাত্রজীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে উৎসুক।

ভারতবর্ষ চিরদিনই সমস্ত বিশ্বকে উদার আমন্ত্রণ জানাইয়াছে, আপনাকে দান করিয়াছে, বাহিরকে গ্রহণ করিয়াছে। শ্রদ্ধেয়া দেয়ন্, যাহা দিবে, শ্রদ্ধায় দাও, ভালবাসিয়া ভাল ভাবে দাও, তবেই দান সার্থক হয়, গ্রহীতাও সার্থক হয়। সকল দেশেরই কিছু বিশিষ্টতা আছে এবং বর্তমানে সব দেশেই ভাঙাগড়া, পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। এই সময় যদি পরস্পরের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া, শ্রদ্ধাভরে দেওয়া নেওয়া চলে তবে এক পক্ষ নয়—উভয় পক্ষেরই লাভ হইবে, উভয় দেশেরই কল্যাণ হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশ দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন, বাহির হইতে রস গ্রহণ করিয়া আমরা যদি দেশের সমস্ত শিক্ষার ভূমিকে সরস ও প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে পারি তবে এই মেলামেশা সার্থক হইবে।

উল্টা পিঠ

[শ্রীমহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য]

(১)

আমরা এতদিন ধরে যে শিক্ষা পেয়ে এসেছি তা যে একেবারেই 'কিস্যু না' এমন একটা কথা আমরা কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি। 'শিক্ষা' বলতে এখানে আমি অবশ্য স্কুল কলেজের শিক্ষাই বলছি। এই শিক্ষায় নাকি ইংরেজরা শুধু কেরাণীই গড়ে নিয়েছে, আর কেরাণী গড়বার জন্যই নাকি তারা এই শিক্ষার ধারা এদেশে আমদানী করেছিল—এই শিক্ষাতে শুধু যে পেট ভরে না তা নয়, চরিত্র গঠন হয় না, মন স্ফূর্তি পায় না, যার যে বিষয়ে প্রতিভা আছে তারও বিকাশ সম্যক্ হয় না, এহেন সব কথা হামেশাই শুনছি। শিক্ষার দ্বারা বহলানোর কত রকম পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা হতে পারে তাও আজকাল চোখে দেখছি। অথচ এও দেখছি যে শত চেষ্টা করেও শিব গড়তে আর পারছিনা—শুধু বানরই গড়ে চলেছি। তাই এক একবার ভাবি, সত্যিই কি আমরা ছেলেবেলায় যে শিক্ষা পেয়েছিলাম তার সবটাই মেকী ছুয়ানি?

যদি বলেন, মশাই, এই শিক্ষা পেয়েই সেকালের বঙ্কিম চাটুজ্যে থেকে সুরু করে হালফিল্ ছোট বড় লেখক সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক নেতা উপনেতার দল সব যখন মানুষ হয়েছি, তখন এই শিক্ষার আর গলদটি কোথায়? তাহলে শুনবেন, একটা বঙ্কিম, একটা মাইকেল, একটা রবিঠাকুর কি একটা আশুমুখুজ্যে দিয়ে তো সারা শিক্ষার ধারাটিকে বিচার করা চলেনা মশাই—এঁরা হচ্ছেন সব ব্যতিক্রম। প্রতিভাকে যেখানেই ফেলে রাখুন, সেখানেই সে আপনার আলোয় জগৎ উদ্ভাসিত করে ফুটে বেরুবে, তাকে কেটে পাশ গাধায় পুঁতলেও কনক চাঁপার গাছ হয়ে জেগে উঠবে। দেখতে হবে সাধারণ, এই যাকে বলেন mass—ইংরেজি ভাষাটার দেখুন মশাই কথায় কেমন যায়, কেমন সোজা জিনিসটা মগজে ঢুকিয়ে দেয়—তারা তাতে কতটা উপকার পেয়েছে। আর ঐ যে সব মহাপুরুষদের কথা উল্লেখ করলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এই শিক্ষার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে গেছেন। কাজেই—ইত্যাদি। আপনি যদি তবুও বলেন, mass-এর কথা যে বলছেন, আপনি-আমিও তো তারই অন্তর্ভুক্ত, আমরা কি কিছু শিখিনি? এই যে মশায় শিক্ষার সম্বন্ধে আলোচনা করবার জ্ঞানবুদ্ধি জন্মেছে, এও তো এই শিক্ষার প্রসাদাৎ? আর যদি বলেন যে অর্থকরী বিদ্যা, সেটও তো চালাচ্ছি মশায় এই বিদ্যার জোরেই, তা কেরাণীগিরিই করি আর আলিপুরের জজকোর্টের বটতলাতে শামলা মাথায় দিয়েই বসি। বিদ্যার অনুপাতে পয়সা, এতো মশায় কোন যুগে কোন দেশে শুনিনি; পয়সা রোজগার অন্য জিনিস, শিক্ষার সঙ্গে তার সম্পর্ক থাকলেও সবটা নয়।—তার উত্তরে এমন সব বক্তৃতা শুনবেন যে ভাবতে এখনই আমার হৃৎকম্প হচ্ছে।

অশিচ পন্থ, আবার উল্টো দলও আছেন। তাঁরা বলেন, শিক্ষাটা যাহোক সেকালেই ছিল ভাল, যত দিন যাচ্ছে, তত যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেকালে মশাই যা শিখতাম, যেটুকু শিখতাম, ভাল করেই শিখতাম। একটু অনুধাবন করলেই দেখবেন, কত ভাল ভাল ছাত্র তখন বেরিয়েছে, আর এখন কি ধাঁচের আধামণি ছাত্র সব তৈরি হচ্ছে। আমাদের আমলের একটা বুড়ো আওার-গ্র্যাজুয়েট নিয়ে আসুন, তার সাহিত্যরচনা ও ব্যাকরণের জ্ঞান পরীক্ষা করুন, আর একালের একটা এম্-এ-কে ধরুন, দেখুন তার বিদ্যার বহর তুলনা করে।

যাবতেই হবে, অনেক অবনতি হয়েছে। আর যতদিন যাচ্ছে, ততই যেন আরও নীচের দিকে নামছে। আজকাল একটা মিডল্‌মানেরও শিশুকে আপনারা কত কি সেখান পড়ান—একটা ক্লাস ফোরের ছেলেকে শিখতে হয় তিনটে ভাষা, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য, নাগরিক শিক্ষা (civics), বিজ্ঞান, আবার চিত্রাঙ্কন—মোট দশটা বিষয়। শিখছে তো ঘোড়ার ডিম। আমাদের সময়ে ইংরেজি বাংলা অঙ্ক—ব্যস্, বাড়তির মধ্যে ছিল ভূগোল ও ইতিহাস একটু, তাও মৌখিক, আর একটু স্বাস্থ্য। আমরা তাই আসল বিষয়গুলোতে মনঃসংযোগ করবার সময় পেয়েছি বেশি। আর তখন এত পাঠ্যপুস্তকের অত্যাচার ছিল না, আমার যে কখানা বই ছিল, পড়বার মত ছিল, পড়েও সুখ ছিল, পড়িয়েও সুখ ছিল। বইগুলোও ছিল ভাল, আজকালকার পয়সা রোজগারের ফিকির ছিল না। এঁদের বক্তৃতার তোড় থামিয়ে যদি বোঝাতে যান, সেকালের শিক্ষা কতকটা একদেশদর্শী ছিল, আজকালকার মত এতটা বহুমুখী ছিল না, তাহলে রোষকষায়িত লোচনের দৃষ্টিতে ভস্ম হয়ে যেতে পারেন এমনও আশঙ্কা আছে।

সব জিনিসের উল্টো পিঠ আছে। সেকালের শিক্ষাকে খারাপ বলে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। আবার একালের শিক্ষাকেও 'আহা! আহা!' করতে পারেন না। আজকাল আপনারা শিক্ষা সংস্কারের দিকে মন দিয়েছেন। তাই এখন তর্কাতর্কি ছেড়ে দিলেও ভাববার সময় সত্যসত্যই আজ এসেছে, শিক্ষার ধারাটা কেমন হবে। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞান পড়ে যতই লম্ফঝম্প করি না কেন, 'সেকেলের শিক্ষাটা কিস্যু না' বলে এক ফুৎকারে তাকে উড়িয়ে দিতে নিশ্চয়ই বুকে হাত দিয়ে পারব না, আবার 'একালের শিক্ষাটিও যে আসলে ভুয়ো' একথা বলে বিমর্ষ চিত্তে সেকালের বিলীয়মান ছবির দিকে গালে হাত দিয়ে তাকিয়ে থাকাও চলবে না। কোনটার কোথায় আর কতখানি গলদ, তা খুঁজে বার করে সময় থাকতে সাবধান হতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার সংস্কার করতে হবে। সেকালের শিক্ষার খারাপ দিকটা অনেক দেখেছেন, আজ আসুন তার উল্টো পিঠটা দেখি।

(২)

এক রোগীর কথা শুনেছিলাম, সামান্য অসুখ, একটু সাবধান হলেই হয়তো সেরে যেত, চিকিৎসারও ত্রুটি হয়নি, ডাক্তার পথ্যাপথ্যও বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু তার আত্মীয় শুশ্রূষাকারিণীর অতিরিক্ত মমতার ফলে তাকে অকালে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হয়। প্রবল জ্বর, আহা, অরুচির মুখ, বাছা কিছু খেতে চায় না, মুখপোড়া ডাক্তারও কি তেমনি ছাই ভেতো ওষুধ দেয় গো? একটু মুখ বদলাতে চাচ্ছে, দিই, একটু কাসুন্দী দিই। হাত হচ্ছে, বাছা আমার খেতে পারে না কিছু, দিই দু'খানা পরম পরম মাছ ভাজা। এই করে তাঁর স্নেহের বাহুল্যে বাছাকে আর উঠে পথ্য করতে হয়নি। গতানুগতিক শিক্ষার ধারা পাল্টাতে গিয়ে আজ আমাদের হয়েছে সেই অবস্থা। শিক্ষার গলদ যেটুকু আছে তা হয়তো একটু বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করতে পারলে ঠিক হয়ে যেতো, কিন্তু আমাদের দরদ কিনা মায়ের চেয়েও বেশি, তাই স্নেহের আতিশয্য দেখাতে গিয়ে শিক্ষা আদৌ টিকলে হয়! আমাদের যেন পরিবর্তনের একটা মোহ পেয়ে বসেছে, খালি পরিবর্তন করেই চলেছি। আজ এই পাঠ্যক্রম, কাল ওই পাঠ্যক্রম, কোন কিছুরই যেন স্থিতি নেই, মাঝখান থেকে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক, তিন দলেরই নাজেহাল অবস্থা। আচ্ছা, এই ব্যবস্থাটা অমুক সাল পর্যন্ত চলুক, তারপর অমুক ব্যবস্থাটা পরীক্ষামূলক ভাবে আড়াই বছর চলবে, ইত্যাদি—এই রকম ঘূর্ণিস্রোতের মধ্যে পড়ে ছাত্ররা বেওয়ারিশ নৌকার মত ঘুরপাক খেতে খেতে

তলিয়ে যাবার মত হচ্ছে। মানলাম, শিক্ষার ধারা আমূল পরিবর্তনের সময় এসেছে, আর যুগসন্ধির মুখে একটু ওলট পালট হয়েই থাকে। কিন্তু যে লোক সাঁতার জানে না, তাকে একেবারে মাঝ দরিয়ায় ফেলে দিলে সে যে ডুবে যাবে। তাকে অল্পজলে সাঁতার শিখিয়ে পোক্ত করে নিয়ে তবে বেশি জলে ছাড়তে হবে। যে দেশ পরিবর্তনের জন্য এখনও মনে প্রাণে প্রস্তুত হতে পারেনি তাকে একেবারে বিপ্লবের মধ্যে ছেড়ে দিলে সে যে নিশ্চেই নিশ্চিহ্ন হয়ে বানের জলে ভেসে যাবে। তাকে তো পরিবর্তনের জন্য আগে প্রস্তুত করে তুলতে হবে! বিবর্তনের ফলে সেটা হয় অমৃত, রাতারাতি বিপ্লব দিয়ে সেটাকে আনতে গেলে সেটা হয়ে উঠতে পারে গরল, তা ভুললে চলবে না। এটা নাকি গণতন্ত্রের যুগ, সব কিছুই নাকি সর্বসাধারণের মত নিয়ে হবে। গণতন্ত্র জিনিসটা কি, সে বিষয়ে আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা এখনো পর্যন্ত হয়নি বলে বোধ হয় আমরা একটু বাড়াবাড়ি করছি, নইলে শিক্ষার প্রণালীটাও ভোটের উপর ছেড়ে দিতাম না। রোগী মরতে বসেছে, সেই সময় উপযুক্ত চিকিৎসক ডেকে তাঁর ব্যবস্থামত ঔষধ দেওয়া উচিত। নিতান্ত বাতুলেও বোধ হয় কল্পনা করে না যে চিকিৎসক যে ঔষধ দিচ্ছেন, তা রোগীকে সেবন করান হবে কি না তা আগে ভোটে ঠিক করা হোক; এটা গণতন্ত্রের যুগ, যদি বেশি ভোটে বলে, না, ঐ ঔষধটা খাওয়ানো চলবে না, তা তাতে রোগী যদি টেঁসেও যায় যাক, গণতান্ত্রিক প্রথাটা চাই। কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে জাতির মুমূর্ষু অবস্থায় বৈদ্য ডেকে তার ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা না করে ভোটে ঠিক করতে বসেছি, এখন বৈদ্য ডাকা উচিত কি না, আর ডাকলেও কাকে ডাকব—ডাক্তার না বৈদ্য না হাকিম না হাতুড়ে না চাষলী, আর যাকে ডাকব, তাঁর ব্যবস্থাপত্র মাফিক খাওয়াই খাওয়ানো যাবে কি না। যদি অধিকাংশের মতে সাব্যস্ত হয় যে খাওয়ানো উচিত, তবে খাওয়াবো, নচেৎ অধিকাংশ যদি বলেন, পীরের দরগায় জল-পড়াতেই সারবে, তবে চিকিৎসক যতই হাঁ, হাঁ করে উঠুন, তাঁর ব্যবস্থাপত্র ছিঁড়ে ফেলে জলপড়াই দেব।

গণতন্ত্র দিয়ে মানুষের বস্তুতান্ত্রিক যতই উন্নতি করানো যাক, পারমার্থিক উন্নতি করানো যায় কি না সে বিষয়ে দারুণ সন্দেহ আছে। আপনি ভোটের জোরে আইন করে আমার ছেলেকে স্কুলে দিতে বাধ্য করতে পারেন, কিন্তু তাকে আসল শিক্ষা দিতে পারেন না। আইন পাশ করিয়ে কাউকে সত্যবাদী, সাধু ও ন্যায়নিষ্ঠ করা যায় না। অথচ সৎ উপদেশ, সৎ প্রসঙ্গ, সদ্দৃষ্টান্ত তাকে চরিত্রবান করে তুলতে পারে। সেই রকম শিক্ষা কি হবে বা হওয়া উচিত, তা ভোটের জোরে ঠিক করা যায় না। গণতন্ত্রের স্লোগান শিক্ষার মধ্যে অচল। কয়েকজন জনকল্যাণকামী চিন্তাশীল মনীষীর মাথা থেকে তা বেরোয়। এঁরা হচ্ছেন সমাজের ব্যাধির চিকিৎসক—এঁদের ব্যবস্থাপত্র নির্বিচারে মেনে নিলে সমাজের ব্যাধি দূর হয়।

রোগীর যদি চিকিৎসক ও ঔষধের উপর বিশ্বাস না থাকে, তবে তার রোগ সারা মুস্কিল, আমাদের যদি এই মনীষীদের এবং তাঁদের ব্যবস্থার উপর আস্থা না থাকে তবে সমাজের ব্যাধিরও প্রতিকার হওয়া মুস্কিল। আবার ঠিক সেইজন্যই আজকাল-কার শিক্ষাব্যবস্থা এমন প্রাণহীন, কারণ প্রাণের মূল উৎস—শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস দিয়ে তো তা গ্রহণ করিনি।

শিক্ষায় গণতন্ত্র বলতে যদি বলেন, না না, এর মানে শিক্ষা পেতে সর্বসাধারণের সমান অধিকার, তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের বলবার কিছু নেই। শিক্ষার মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অবস্থা কোন কিছুর কোনরকম প্রভেদ থাকা উচিত নয়; সকলের পক্ষে তার দ্বার উন্মুক্ত নিশ্চয় থাকা উচিত। এবিষয়ে

আমাদের কারুর মতদ্বৈধ নেই, থাকবার কথাও নয়। গোলমালটা শুধু ঐখানে, যখন বলেন কি শিক্ষা দেওয়া হবে, কি করে শিক্ষা দেওয়া হবে, তাও ভোটের জোরে ঠিক হবে, এমন কি আমকার প্রগতির দিনে যাদের শিক্ষা দেব, তাদেরও তাতে ভোট থাকবে। যেটা সাধনা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, অনুভূতি ও চিন্তার ফলে লভ্য, সেটাকে গণতন্ত্রের বুক থেকে ভোট আঁকশী দিয়ে কি করে পেড়ে নেওয়া যাবে, বুঝিয়ে দিতে পারেন? এ করতে গেলে শিক্ষাকেই গলা টিপে মারা হবে নাকি?

আমার, ওই দেশে মশাই এই এই হয়েছে, আমাদের দেশেও কেন হবে না, এরকম কথাও অনেক শুনতে পাই। জাতীয় জীবন, জাতীয় কৃষ্টি, জাতীয় অভাব প্রভৃতি অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে জাতীয় শিক্ষার ধারা গড়ে ওঠে। এতো আর গাছের কলম নয় যে এক গাছ থেকে তুলে এনে অন্য গাছে লাগিয়ে দেব। কাজেই শিক্ষার প্রণালীর মধ্যে অন্ধ অনুকরণের মত দুষ্ট আর কিছু নাই।

(৩)

প্রাচীনযুগে ভারতে শিক্ষা গড়ে উঠেছিল আশ্রম-কেন্দ্রিক হয়ে—তপোবনে শিষ্য-পরিবৃত গুরুই আমাদের শিক্ষকের আদর্শ। যুগ-পরিবর্তনের সঙ্গে বাইরের আচরণের পরিবর্তন ঘটলেও শিক্ষার অন্তরের সেই আদর্শ ছিল জেগে—টোল, মক্তবে সেই গুরুগৃহেরই ছায়া পাই। ইংরেজ আমলে হাল ফ্যাসানের স্কুল কলেজ এদেশে চালু হলেও সেই আদর্শ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়নি—প্রথম প্রথম—প্রথম প্রথম বলব কেন, চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেও স্কুলের সম্পর্কটাই ছিল বড়। শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে সম্পর্কটা তখনকার দিনে এতটা বাঁধাধরা ও আইন-মাফিক ওজন করা ছিল না—তাই যেটা তাঁদের কাজ থেকে পেতাম সেটা অকৃত্রিম স্নেহের সঙ্গে পেতাম বলে যেটুকু পেয়েছি সেটুকু আমাদের সমগ্র জীবনকে পবিত্র ও মধুর করে রেখেছে। আধুনিক যুগের হিসাব করে সম্পর্ক গড়ার দিনে সে বন্ধন থাকে না বলেই হয়তো বা ছেলেরা কিছু শিখতে পারছে না, আর তাদের বাঁদরামির মাত্রাও বেড়ে গেছে। শিক্ষকের সঙ্গে তাদের প্রাণের যোগ নেই বলে শ্রদ্ধার এত অভাব। শ্রদ্ধার বোধ মনে না থাকলে শিক্ষা কুশিক্ষায় পরিণত হয়। তাই শিক্ষককে প্রহার থেকে খুন করা পর্যন্ত সংবাদপত্রে পড়লে বিস্মিত হবার আর কি আছে?

(৪)

শুনেছি আমাদের দেশে বই লেখা হয় 'সুকুমার-মতি বালক-বালিকাদের বোধসৌকর্যার্থে' নতুবা 'বন্ধুবান্ধব বা গুণগ্রাহীদের অনুরোধে।' কিন্তু সুকুমারমতি বালকবালিকাদের বোধশক্তি যে কতটা, তা বোধহয় অধিকাংশ লেখক জানেন না। তাই একটু নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখব, আজকাল পাঠ্যবিষয় ও পুস্তকের চাপে খুব নিম্ন-শ্রেণীর ছেলেরাও যেন নুয়ে পড়েছে। আমার হাতের কাছে একটা প্রসিদ্ধ স্কুলের পাঠ্যতালিকা রয়েছে—এবং এই পাঠ্যতালিকা যে পাঠক্রমের উপর নির্ধারিত তা এখানকার সরকারি শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক সংকলিত, অর্থাৎ শিক্ষা-ব্যাপারে কবিৎ-কর্মা লোকের তৈরি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই পাঠক্রমের ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের কিছুমাত্র হাত নেই। উদাহরণ দিই; একটা ক্লাস ফোরের ছেলেকে, যার বয়স খুব হলে আট নয়ের বেশি হবে না, তাকে পড়তে হবে মাতৃভাষা, হিন্দী, অঙ্ক, সিভিক্স, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, ড্রয়িং। গোদের ওপরি বিস্ফোটকম্—ইংরেজি এবং স্বাস্থ্য। প্রত্যেকটি বিষয়ে একাধিক পাঠ্যপুস্তক। বুঝে দেখুন কি গুরুতর ব্যাপার। অথচ শিক্ষণীয় বস্তুকে সোজা করার উৎকট আগ্রহে তাকে করছি আরও জটিল, কিন্তু শেখাচ্ছি না আসলে কিছু, শিক্ষা হচ্ছে পরগ্রাহী, ছেলেরা না শিখছে

ভাষা, না জানে বানান, অন্যান্য বিষয়ের কিছুই ভাল জানে না, ভাসা ভাসা একটা জ্ঞানমাত্র সম্বল। জানবে কোত্থেকে? সেতো শিশু, অত জানবার মত তার বুদ্ধিবৃত্তি বা মস্তিষ্কের বিকাশই হয় নাই। অথচ এই বয়সে তাকে মাতৃভাষা, অঙ্ক আর বড় জোর অন্য একটি ভাষা ভাল করে শিখিয়ে মুখে মুখে মোটামুটি সাধারণ জ্ঞানের মত দেখানে শিখত ভাল, এবং জানত বেশি। তা করতে যাইনি বলে পাঠ্য পুস্তকের এবং পরীক্ষার পাশের জন্য "important" অংশগুলি আয়ত্ত করবার আগ্রহে অর্থপুস্তকের ভারে ছেলেটি চ্যাপ্টা হতে বসেছে, আর বিষয়গুলিতে লাভ করছে ভাল ভাল জ্ঞান। তাকে সর্ব কর্মের কর্মকার বানাচ্ছি, কিন্তু কোন কর্মই তাকে ষোল আনা শেখাচ্ছিনা। কি দুর্ভাগ্য তার, কি দুর্ভাগ্য আমাদের!

আমরা প্রায়ই আক্ষেপ করি, আজকালকার ছেলেরা কেবল নোট বই মুখস্থ করে পাশ করে, ফলে শেখেনা কিছু। কিন্তু আমরা যে পাঠ্যের বিরাট পাষাণস্তূপ তাদের উপর চাপিয়েছি, তাতে এ ছাড়া তার উপায় কি? কোন বিষয়ে পূর্ণ সংখ্যা ২৫ মাত্র; অথচ সে বিষয়ে তাকে পড়তে হবে খান তিনেক বই। এত কম পূর্ণ সংখ্যার জন্য অতটা পড়বার তার সময় নাই, ধৈর্য তো নাইই, মজুরিও পোষায় না। কাজেই সে নেয় নোট বইয়ের সাহায্য। গোড়ার এই গলদ না দূর করলে নোট বইয়ের অক্টোপাশ বাঁধনের হাত থেকে তাকে রক্ষা করব কি করে? যতদিন শিক্ষাপ্রণালী এই রকম থাকবে, ততদিন তারা পরীক্ষার সময় আগের দিন রাতারাতি নোট মুখস্থ করে পরের দিন সেগুলো উগ্‌রিয়ে পাশ হবার চেষ্টা করবে।

(৫)

আমাদের চরিত্রে কোথায় যেন একটা কি গোলমাল আছে। আমরা সোজা জিনিস সোজা ভাবে নিতে পারি না, নিতে চাইওনা। কথা উঠল, ছেলেদের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় করাতে হবে। বেশ ভাল কথা। প্রকৃতির ভিতর দিয়েই না মানুষের প্রথম পাঠ শুরু হয়? আমরা অনেক কিছু শিখছি, আফ্রিকায় কি কি জন্তু আছে, দক্ষিণ আমেরিকায় কি কি গাছ জন্মে, সাইবেরিয়ার লোকদের জীবনযাত্রা প্রণালী কি, গড় গড় করে মুখস্থ বলি, কিন্তু আমাদের ঘরের আশে পাশে যে গাছপালা জন্মায়, যে পাখীগুলি ডাকে, যে কীটপতঙ্গ উড়ে বেড়ায়, যে পশুগুলি ঘুরে বেড়ায়, তা জানি না; আমাদের প্রতিবেশী লোকগুলির জীবনযাত্রা প্রণালী যে কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। কাজেই এটা খুব ভাল প্রস্তাব বলে সকলেই মেনে নিলাম। কিন্তু মানলে কি হবে? অমনি সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড বসে গেল, পাঠ্যক্রম তৈরি হয়ে গেল, নানাপ্রকার পাঠ্যপুস্তক রচিত হল, অনেকগুলি তার মধ্যে অনুমোদিত হল আর ছেলেরা বসে বসে মুখস্থ করতে লাগল, কীটভোজী গাছপালার প্রসঙ্গ বা ওই রকম কোন প্রাকৃতিক খবর যা সে তার জীবনে কোনকালে হয়তো চোখেই দেখবার সুযোগ পাবে না এবং যার জ্ঞান তার জীবনে কোন কাজেই আসবে না। প্রকাশকদের একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে যারা ছাত্রদের উপকার করার জন্য বদ্ধপরিকর; —নোট বই প্রকাশ করে পরীক্ষা পাশের পথ সুগম করা তাদের ব্যবসা। এমন কোন পাঠ্যপুস্তক নাই, যার তারা মানের বই ছাপায় নাই। ছাত্রেরাও পরমানন্দে বই কেলে মানের বইয়ের আধার চষে পরীক্ষা তটিনী পার হতে থাকে।—প্রকৃতিবিজ্ঞান শেখাবার আসল উদ্দেশ্যটাই এভাবে ব্যর্থ হল। শিক্ষার সংস্কার যদি এভাবে হয় তো তার মূল্য কি, নিশ্চয়ই প্রশ্ন করতে পারি। এর চেয়ে পুরানো প্রথা ভাল ছিল না কি?

(৬)

ছেলেবেলায় দেখেছি, বিদ্যাদানের প্রণালী যেমন সরল ছিল, শিক্ষাদানের সাজ সরঞ্জাম তেমনই বাহুল্যবর্জিত ছিল। এদিক দিয়ে দেখি, বর্তমানকালে শিক্ষাদানের সাজসরঞ্জাম প্রচুর ও অনেক রকম। ছেলেদের শেখাবার কত সুযোগ-সুবিধা এখন! কিন্তু হলে কি হবে, শিক্ষকও আজকাল কেমন যেন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছেন, এইসব সুন্দর সুন্দর সরঞ্জামগুলি নোট বইয়ের মত কটিন-বাঁধা জিনিসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এর একটা কারণ শুনতে পাই, আজকাল তাঁদের উপর বিভাগীয় চাপ ও তাঁদের কাজে বিভাগীয় হস্তক্ষেপ একটু বেশি—আর তাঁদের কাজ-কারবারের হিসাব, ডায়েরি, খাতা মুণ্ডু এত বেশি রকম রাখতে হয় যে, সব রস তাঁদের ঐখানেই ঢেলে দিতে হয়, পড়াবার সময় আর কিছু থাকেনা। সত্য মিথ্যা জানি না—এ বিষয়ে বিচার সুধীজনে করবেন। কিন্তু সবটাই কি তাই? আমাদের তো মনে হয়, আমরা যন্ত্র সৃষ্টি করেছি বটে, কিন্তু যে যন্ত্রী সেই যন্ত্র চালাবে তাকে সৃষ্টি করি নাই—সেই জন্যই এই বিপত্তি।

(৭)

পাঠ্যপুস্তকের কথায় মনে পড়ল, ছাত্র তো শুধু পাঠ্যপুস্তকই পড়ে না, 'অপাঠ্য'ও কিছু পড়ে। আমাদের সময় অপাঠ্য সংখ্যায় অনেক কম ছিল। তখনো 'শিশু-সাহিত্য' এবং শিশু সাহিত্যিকের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই। যাঁরা এসব বই লিখতেন তাঁরা কৃতবিদ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং, যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, দক্ষিণা-রঞ্জন মিত্র, বরদাপ্রসন্ন, সত্যচরণ, সুখলতা রাও ও সুকুমার রায় প্রভৃতি যে সব সাহিত্য ছেলেপুলেদের জন্য রচনা করে গিয়েছেন তার তো আর জুড়িই পাই না। তখন লেখক ছিলেন কম, বই ছিল কম, কিন্তু বইগুলি ছিল পাকা হাতের পাকা লেখা, পড়ে শুধু আনন্দ পেতাম না, জ্ঞানও পেতাম। 'শিক্ষা'র নিয়মিত পাঠকপাঠিকারা স্মরণ করতে পারেন, কয়েক বছর আগে 'শিক্ষা'র পাতায় ছেলেদের কি কি বই পড়তে দেওয়া উচিত সে বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছিল। অনেকে বইয়ের অনেক ফর্দও পাঠিয়েছিলেন। হিসাব করে দেখলে দেখব, তার ভিতর সেকালের বা আধা-সেকালের আমলের বইই বেশি ছিল। এযুগে তো শিশু সাহিত্যের ছড়াছড়ি বন্যা এসেছে; তবে ভাল বইয়ের এত অভাব কেন? তার কারণ, অনেক বই লেখা হয় শুধু পয়সা রোজগারের কিকিরে। লিখলাম ছাইপাঁশ, খুব খানিকটা রোমাঞ্চকর ব্যাপার, ঘণ্টায় ঘণ্টায় 'থ্রিলিং এডভেঞ্চার' আর ছাপা বাঁধাই খুব চমকদার করে দেড়-দু টাকায় বাজারে ছাড়লাম, বিজ্ঞাপনের চটকে তার কাটতিও হল। কিন্তু তাতে ছেলেগুলির মাথা খাওয়া হয়ে গেল। লেখবার সময় কতখানি বেহুঁশ হয়ে এঁরা লেখেন তা টের পেলাম একটা বইয়ে, যখন পড়লাম আফ্রিকার গহন অরণ্যে রয়াল বেঙ্গল টাইগার নায়কের সঙ্গীকে আক্রমণ করেছে, আর নায়ক সেই বনবাঘাড়ের মধ্যেই এরোপ্লেন নামিয়ে তাকে উদ্ধার করছেন। গল্প সত্য নয়, মানি, আষাঢ়ে জিনিসও উত্তম সাহিত্য হয়, যেমন The Lost World বা The First Men in the Moon: কিন্তু তবু আষাঢ়ে জিনিসটা বজায় রাখবার জন্য এই বইগুলির ভিতর অসঙ্গতকে কোথাও প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। এসব বইয়ের উপজীব্য আষাঢ়ে গল্প, কাজেই যখন নায়কের প্রাগৈতিহাসিক জন্তুদের সঙ্গে লড়াইয়ের কথা পড়ি তখন অসম্ভব ভাবি না। কিন্তু যে বইয়ে কোন স্থানের সত্যকার প্রাকৃতিক বর্ণনা দিচ্ছে বলে জানায়, আর তাতে আগুবি ভুল থাকে, সেটা নিশ্চয়ই ক্ষমার অযোগ্য।

আরও একটা উদাহরণ দিই। আজকাল ভাল

ভাল বিদেশী বইয়ের অনুবাদ হচ্ছে। খুব ভাল কাজ। তবে যাঁরা অনুবাদ করবেন তাঁদের মূল ভাষা এবং মাতৃভাষায় ভাল দখল থাকা চাই, নইলে বিপত্তি ঘটে। একটা উদাহরণ নিন, Stevenson-এর Treasure Island আপনারা সকলেই পড়েছেন। জলদস্যুদের সেই গানটা মনে করুন "Fifteen men on the Dead Man's chest, Yo ho ho and a bottle of rum;" Dead Man's chest বস্তুটা কি, অনেক অনুবাদকের তা না জানা থাকায় বড় মুস্কিল হয়েছে। এটা যে একটা অজ্ঞাত দ্বীপ, জলদস্যুদের এখানে আস্তানা ছিল, না জেনে একজন অনুবাদ করেছেন, "সিন্দুকটা ভর্ত্তি ওই মৃত মানুষেতে;" বিরক্ত হয়ে অন্য বই খুলে দেখি ঠিক এই ধরণের ব্যাপার। যে জিনিস ছেলেদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, তাতে এরকম ভুল করলে কি উপেক্ষা করা যায়?

পাঠ্যপুস্তক, এবং অবসর বিনোদনের জন্য পুস্তক, এই উভয় প্রকার পুস্তকেই এখন খুব বেশিরকম ছাঁটাই প্রয়োজন। কথাটা বুঝি বা অনুভব করি আমরা সকলেই; তবে আসল প্রশ্ন, সেও ধরবে কে? যদি সরকারের হাতে ছেড়ে দিই, তাহলে কল্পনা বা সত্যের ধার ধারেন না এমন এক সম্প্রদায়ের হাতে লালফিতার নাগপাশের বাঁধনে শিশুচিত্তের খোরাক বাঁধা পড়বে; সাধারণের হাতেও ছাড়া যায় না, বলেছিতো, ভোট নিয়ে শিক্ষাদান হয় না। তারপর অনেকের রুজি-রোজগার যারা যাবে বলে হৈ হল্লা হবে, কাগজে লেখালেখি হবে। সত্যকার চিন্তাশীল যাঁরা তাঁদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার তাই আজ প্রয়োজন হয়েছে।

(৮)

আমাদের জাতীয় চরিত্রে যে ফাটল ধরতে সুরু করেছে তা কিছুকাল হল, বিশেষ করে গত দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় থেকে বেশ চোখে পড়ছে। আমরা ফাঁকি দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে, আর যেন তেন প্রকারেন কালোবাজারি করতে শিখে গেছি। আজকাল ভেজাল তো নয় কিনিসে, আটা, তৈল, ঘৃত, মসলা, আর ঔষধে পর্যন্ত। শুধু কি তাই? আমাদের কথায় ভেজাল, কাজে ভেজাল। কাজেই শিক্ষাপ্রণালীতে এবং কেতাবেও যে ভেজাল পাওয়া যাবে তা বলা বাহুল্য। তাই দেখি গলিতে গলিতে "মডার্ণ মেথডে" শিক্ষাদানের (?) কারখানা, যে-গুলো বিদ্যালয়ের নামে চলে শুধু অভিভাবকদের পকেট মারবার জন্য। তাই দেখি পাঠ্যপুস্তকের এবং তথাকথিত শিশু সাহিত্যের ছরছারি, যে-গুলোর মধ্যে শাঁসের চেয়ে ছিবড়ে ও খোলাই বেশি। যতদিন না আমাদের জাতীয় মনোভাব উন্নততর হচ্ছে, ততদিন এই আপদ দূর হবে না এবং ছেলেপিলেদের ভাল শিক্ষা কিছুতেই দিতে পারব না।

শিক্ষাকে আমরা মনের খোরাক বলে যতই ভাল ভাল কথা বলি না কেন, পেটে ক্ষুধা থাকলে মন কখনও তরতে চায় না। অন্ন চিন্তা থাকলে দার্শনিক তত্ত্ব মাথায় ঢোকেনা। সেদিক দিয়ে শিক্ষার সংস্কার খুব প্রয়োজন, কারণ আমাদের শুধু পুঁথিগত বিদ্যাই দেওয়া হয়েছে, অর্থকরী বিদ্যা দেওয়া হয়নি। কিন্তু আমরা যখন যা করি, তার চূড়ান্ত করে ছাড়ি—তাই, অর্থকরী বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বিদ্যার মধ্যে যতটুকু নিঙড়ে ফেলে দিচ্ছি, শিক্ষাটাকে শুদ্ধ করে তুলছি। কাঠ আমাদের অনেক প্রয়োজনে লাগে, কিন্তু শুধু কাঠে মানুষের চলে না। তার জীবনে পাতার দরকার আছে, ফুলের দরকার আছে, ফলের দরকার আছে, ছায়ারও দরকার আছে, সে কথা ভুললে চলবে কেন? আজকার এই বস্তুতান্ত্রিক জীবনে তাই বার বার সাবধান করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জীবনে টাকা রোজগার করা যেমন দরকার, জীবনকে মধুময় করে তোলারও তেমনি দরকার, কৃষ্টির দিকটা যেন কখনই উপেক্ষা করা না হয়।

বিদ্যাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে শ্রদ্ধার ও প্রেমের দরকার। যাঁরা বিদ্যা দেবেন, তাঁদের শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকবে যে বিদ্যা দিচ্ছেন তার উপর, আর যাদের বিদ্যা দিচ্ছেন তাদের উপর। যারা বিদ্যা নেবে, তাদের শ্রদ্ধা ও প্রেম থাকবে যে বিদ্যা তারা নিচ্ছে তার উপর এবং যাঁরা দিচ্ছেন তাঁদের উপর। শুনেছি, গুণীরা সুর সাধনা করলে রাগ-রাগিণী মূর্ত হয়ে তাঁদের কাছে দেখা দেন। তাঁদের কাছে রাগ রাগিণী প্রত্যক্ষ দেবতা—গান তাঁদের কাছে সাধনা। বিদ্যাকে যদি আমরা এই চোখে না দেখি, আমাদের হৃদয়ে যদি তাকে মূর্ত করে না তুলতে পারি, তবে আমাদের বিদ্যার্জন হবে কচের বিদ্যালাভের মত বৃথা।

আবার, বিশ্বাস ও নির্ভর না থাকলে বিদ্যা ফলপ্রসূ হয় না। যে বিদ্যাকে আমি গ্রহণ করব তার উপর, আর যিনি তা দেবেন তাঁর উপর, আমার যদি বিশ্বাস ও নির্ভর না থাকে উত্তর কালে সে বিদ্যা তপ্ত দৈকতে জলবিন্দুর মত ফলবতী হবে। আগের যুগে এই জিনিস দুটো ছিল পূর্ণ মাত্রায়। শিক্ষা-সংস্কারকদের আবার এই জিনিস দুটো আনতে হবে ফিরিয়ে।

সেকালের শিক্ষায়—সেকালের শিক্ষা বলতে আমি আমাদের ছেলেবেলায় স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা পেয়েছি, তার কথাই মূলত বলছি, ওকালতি করতে আমি বসিনি—তার মধ্যে, অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল বা আছে তা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছি। আমি শুধু এই কথা বলতে চাচ্ছি, যেন শিক্ষাসংস্কার করতে গিয়ে শিক্ষার সংহার না করা হয়। সেকালে মনের দিক দিয়ে তবু যা কিছু পেয়েছি, আমাদের পরবর্তী আমলে আমাদের উত্তরাধিকারীরা তা পাচ্ছে না—তাদের শিক্ষা কতকটা নিষ্প্রাণ হয়ে গেছে। তাদের পরে যারা শিখবে তাদের তাগে মনের দিক দিয়ে যেন শূন্য না পড়ে, তা যেন শিক্ষাসংস্কারে ব্রতীরা দেখেন এই অনুরোধ। আমাদের চোখ খুলে কাজ করতে হবে, নচেৎ আমাদের একূল ওকূল দুকূল যাবে; আগেকার ভালটাও আমরা পাব না, এবং ভবিষ্যতের খারাপটাও চোখে পড়বেনা। তা যদি না করতে পারেন, তবে শিক্ষা-সংস্কারের ফলে শিক্ষার ঘরে শূন্য পড়বে। যেটুকু আশ্রয় আমাদের আছে তা পুড়িয়ে দিয়ে ঘর ছিটার উপর বসে উর্দু কবির মত বলব—

—আমার তো তুই জ্বালিয়ে দিলি ঘর!
সারাজীবন রইল বাকী, আমার এখন কাজটা বা কী
কভু কাঁদি, কভু লুটাই, ঘর ছিটার পর॥

ভূগোল পড়ানো

[শ্রীবকুলমালা সেন]

দশম শ্রেণী, শিক্ষিকা ভূগোল পড়াইতেছেন। বোর্ডে ভূগোলক ও বায়ুমণ্ডলের প্রধান গতিগুলি অঙ্কিত করিয়া তাহাদের প্রবাহের কারণ বলিতে গিয়া পৃথিবীর আকার ও সৌরতাপের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। আলোচিত অংশটুকু ছাত্রীদের ধারণায় কতখানি দানা বাঁধিয়াছে বুঝিবার জন্য শিক্ষিকা একবার পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে ছাত্রীদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। একটি ছাত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিতভাবে সে প্রশ্ন করিল, পৃথিবীর ভূমিভাগের উপরেই যদি বায়ুমণ্ডল, তবে জল-

মণ্ডল কোথায়? বায়ুমণ্ডল যেমন পৃথিবী বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ জলমণ্ডলের একটা স্তরও তো থাকিবে? নতুবা সমুদ্রের এত যে জল ইহা আছে কোথায়?

ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগ ও জলভাগ সম্বন্ধে ছাত্রীর এরূপ অজ্ঞতার পরিচয়ে শিক্ষিকা বিস্মিতা হইলেন না। নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের নিকট হইতে এরূপ প্রশ্ন শোনার অভিজ্ঞতা তাঁহার এই প্রথম নহে। বছরের পর বছর ইহাদের নিকট হইতে যে সব অদ্ভুত প্রশ্ন তিনি শুনিয়াছেন, তাহাতে বেদনায় মন ভরিয়া যায়। কোনও মহাদেশের উপকূল বর্ণনা করিতে বলিলে তাহারা হয় তো উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যাহা কিছু আছে মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন একটি উপকূল মানচিত্রে দেখাইতে বলিলে মহাদেশের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত কম্পিত অঙ্গুলি চালনা করিয়া এক সময় বিমূঢ় হইয়া থামিয়া যায়। অর্থাৎ উপকূল—এই শব্দটিই শুধু জানা আছে। মহাদেশের কোন অংশে যে তাহা থাকিতে পারে, অথবা তাহা যে কি বস্তু সে সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। পৃথিবীর কেন্দ্র বলিতে ঠিক কোন স্থানটিকে বুঝায় তাহা বুঝাইতে গিয়া দেখিয়াছেন, পৃথিবী-পৃষ্ঠের কোন একটি বিশেষ বিন্দুকে কেন্দ্রবিন্দু বলিয়া নির্দেশ করিবার জন্যই তাহাদের অঙ্গুলি ঝুঁকিয়া পড়ে। অর্থাৎ পৃথিবী গোলাকার বা কমলা লেবুর মত গোল, ইহা তাহারা শৈশবে একদিন মুখস্থ করিয়াছে শুধু। কমলালেবুর অভ্যন্তর ভাগের মত পৃথিবীরও যে একটা অভ্যন্তর ভাগ আছে—সেখানকার বর্ণনা—নবম দশম শ্রেণীর ছাত্রীরাও নূতন শোনা কাহিনীর মত বিস্ময়ের সহিত শোনে। তাহাদের ইহা উপকথার মত অদ্ভুত মনে হয়। মনের ভাণ্ডারে পূর্ব পরিচিতির কোন সূত্র না থাকায় ধারণা করা সহজ হয় না। যদিও তাহারা পূর্বের শ্রেণী-গুলিতে আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়া ইউরোপ পড়িয়াছে, পরীক্ষা দিয়া উপরের শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু গ্রেট বেরিয়ার রীফ্, বা ভূমধ্য সাগর ভূগোলকের কোন গোলার্ধে অবস্থিত জিজ্ঞাসা করিলে—ঐ অক্ষর-সমষ্টিযুগল ভূমণ্ডলের কোনও স্থানে লিখিত আছে কি না দেখিবার জন্য সমগ্র ভূমণ্ডল আঁতিপাতি করিয়া খুঁজিতে হয়। অর্থাৎ অধিকাংশ ছাত্রীই এ যাবৎ কাল ভূগোল সম্বন্ধে যাহা কিছু পড়িয়াছে, সে সবই তাহাদের নিকট কতকগুলি অর্থহীন অক্ষরসমষ্টি মাত্র। সে সকলের আকৃতিগত, প্রকৃতিগত বা অবস্থানগত কোন ধারণাই তাহাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করিতে পারে নাই।

কিন্তু কেন এমন হয়? যাহারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিম্নতর শ্রেণীগুলি পার হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ভূগোল সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানের এরূপ অচিন্তনীয় অভাব তাহাদের মধ্যে কি করিয়া থাকিতে পারে?

ভূগোল পড়াইতে উপকরণের সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অনেক বিদ্যালয়েই উপযুক্ত উপকরণের অভাব আছে। তাহা হইতেও বেশি দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, যেটুকু উপকরণের আয়োজন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করিয়া থাকেন, অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষকশিক্ষিকাগণ তাহার সম্যক ব্যবহার করেন না। ভূগোল, মানচিত্র প্রভৃতির যথাযথ ব্যবহার করিলে এবং বোর্ডে লিখিয়া ও আঁকিয়া বিষয়গুলি ছাত্রীদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলে শিক্ষিকার অভিজ্ঞতা যে অন্তত কিছুটা সন্তোষজনক হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাথমিক স্তরের ভূগোল শিক্ষায় শুধু ভূগোলক, চিত্র বা মানচিত্র এবং বোর্ডের ব্যবহারই যথেষ্ট নয়। ভূগোল সম্বন্ধে ধারণা সুদৃঢ় ভিত্তিতে

স্থাপিত করিতে হইলে সম্ভবপর বিষয়গুলি কাদা-মাটি বা অন্য বস্তুর সাহায্যে হাতে গড়ার ব্যবস্থা করারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ যে সকল ছাত্র ছাত্রীর চিত্রে স্বাভাবিক বোধ কম, তাহারা ছবি দেখিয়া অদেখা বস্তুর সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু কাদা-মাটির সাহায্যে গড়া বস্তু সত্য বস্তুর প্রতিভূ-স্থানীয় হইয়া তাহাদের মনে বিষয়টির স্বরূপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে সাহায্য করে। বালক বালিকারা হাতে জিনিস গড়িতে বিশেষ আনন্দ পাইয়া থাকে। শিক্ষণীয় বিষয় যখন আনন্দের পরিবেশে গঠিত হয়, তাহা তাহাদের অন্তরে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। প্রাথমিক শ্রেণীতে সম্ভবপর সকলরূপ আনন্দজনক পন্থা অবলম্বন করিয়া ছাত্রছাত্রীদের ভূগোল শিক্ষার ভিত্তি যদি পাকা করিয়া গড়িয়া তোলা যায়, তবে উচ্চতর শ্রেণীতে শুধু চিত্র, মানচিত্র ও ভূগোলকের সাহায্যেই বিষয় বস্তু ছাত্রীদের হৃদয়ঙ্গম করানো অসম্ভব হয় না। কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকিলে পরবর্তীকালে তাহার নিরাকরণ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে।

নবম দশম শ্রেণীর সাপ্তাহিক পরীক্ষার ফল দেখিয়া শিক্ষিকার এ ধারণা দৃঢ় হইয়াছে। শ্রেণী পাঠনায় মানচিত্র এবং বোর্ডে রেখা চিত্রের সাহায্যে বিস্তৃত আলোচনা এবং ছাত্রীদের দ্বারা চিত্রাঙ্কনের ব্যবস্থার পর শিক্ষিকা দশম শ্রেণীতে এটলস, প্রবাল প্রাচীর এবং বেলাশৈল সম্বন্ধে এবং নবম শ্রেণীতে উত্তর আমেরিকার নদী ও গ্রন্থ উপত্যকা সম্বন্ধে প্রশ্ন দিলেন। কিন্তু পরীক্ষার খাতায় ছাত্রীদের প্রদত্ত উত্তর দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাহাদের মনে প্রবাল প্রাচীর, এটল ও বেলাশৈল মিলিয়া একটি জগা খিচুড়ি হইয়াছে, চ্যুতি ও গ্রন্থ উপত্যকার পার্থক্য তাহারা ধরিতে পারে নাই। তা ছাড়া উত্তর আমেরিকার কোন কোন নদী প্রশান্ত মহাসাগর হইতে উৎপন্ন হইয়া মেসাস্তর্বর্তী কোন হ্রদে পতিত হইয়াছে, এমন বর্ণনাও কাহারও কাহারও উত্তর পত্রে পাওয়া গেল। সমুদ্র হইতে নদীর উৎপত্তি হইতে পারে, এত আলোচনার পরেও নবম শ্রেণীর ছাত্রীর পক্ষে ভাবিতে পারা সম্ভব হইয়াছে।

ছাত্রীদের এই অকৃতকার্যতার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলেও শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে গিয়া পৌঁছাইতে হয়। ইহা প্রাথমিক স্তরের ত্রুটির অবধারিত ফল। ভূগোলের বিষয়-বস্তুকে ছাত্রছাত্রীদের শৈশবে ও বাল্যে আকর্ষণীয় করার দিকে মনোযোগ না দেওয়ায় ইহা তাহাদের নিকট নিতান্তই রূপরসহীন, বর্ণ গন্ধ-হীন একরূপ ধোঁয়াটে পদার্থের মত প্রতীয়মান হয়। যে দেশ বা নগর, যে নদী বা পর্বত, যে জাতীয় মানুষ বা জীবজন্তু, যে সকল কৃষিজ, খনজ বা খনিজ পদার্থ, ভূ-প্রকৃতি ও ভূ-গঠনের যে সকল বৈশিষ্ট্য তাহারা কখনও চোখে দেখে নাই বা চেতনায় অনুভব করে নাই, সেই সকল বিষয় ও বস্তুর নাম নানা অশ্রুতপূর্ব দেশী ও বিদেশী ভাষার উচ্চারণে তাহাদের শিখিতে হয়। বিষয়বস্তুগুলির আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা জন্মাইবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করিতে না পারিলে সমস্ত প্রয়াসে ইহার মধ্যে আনন্দের উপাদান মিশাইয়া দিতে না পারিলে ইহা তাহাদের নিকট রূপ-কথায় বর্ণিত লোহার কড়াই চিবাইবার মতই কষ্টকর মনে হয়। কষ্টদায়ক বিষয়ে মন স্বাভাবিক নিয়মেই বিমুখ হইয়া থাকে। শিক্ষণীয় বিষয়টি যদি নীরস হয় এবং যে মন শিক্ষা গ্রহণ করিবে, সেও যদি তৎবিষয়ে বিমুখ থাকে, তবে শেখা বা শেখানো যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। বছরের পর বছর শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে এইরূপ অবাঞ্ছিত

সম্পর্কের ফলে ভূগোল শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ বা রুচিই যে শুধু সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় তাহা নয়, ভূগোল সম্বন্ধে তাহাদের মনে একটা ভীতিপূর্ণ বিতৃষ্ণা জন্মে। তাই নিতান্তই পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য কুইনাইন খাওয়ার মত, কতকগুলি আকারহীন অক্ষরসমষ্টির মত যাহা যাহা কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার খাতায় চ, ধ, ব, র, ল, গোছ একটা কিছু লিখিয়া তাহারা নিষ্কৃতি পায়। ভূগোল সিলেবাসে সন্নিবিষ্ট প্রধান বিষয়গুলির অন্তর্ভুক্ত নয় বলিয়া এজন্য উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইতেও কোন বাধা ঘটে না। ইহার ফলে ছাত্রছাত্রীদের ভূগোল শিক্ষা সম্বন্ধে শৈথিল্য আরও বাড়িয়া যায়। তাহাদের বিতৃষ্ণা ও অমনোযোগিতা দূর করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাই তাহারা বোধ করে না।

এইরূপ বিতৃষ্ণা-পরাহত একান্তবিমুখ ছাত্রীদের নবম দশম শ্রেণীতে ভূগোল পড়াইতে গিয়া শিক্ষিকাকে যে বিপুল বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। দীর্ঘকালের সঞ্চিত বিতৃষ্ণা দূর করা সহজসাধ্য নহে। দীর্ঘকাল ভরিয়া তাহারা যে বিষয়কে একান্ত নীরস বলিয়া জানিয়াছে, তাহার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করাও দুরূহ। তা ছাড়া শৈশবে বা বাল্যে বিষয়বস্তুকে যত প্রকার উপায়ে, যে সকল সরল প্রণালীতে ছাত্র ছাত্রীদের নিকট উপস্থাপিত করা যায়, তাহার মধ্যে অনেকগুলিই কিশোর মনের যোগ্য নয়। সুতরাং সরল করিবার পন্থাও সঙ্কুচিত হইয়া আসে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত নীতির ফলে নবম দশম শ্রেণীতে ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ করিয়া পরীক্ষার জন্যই প্রস্তুত হয়। কত বেশি ছাটিয়া ফেলিয়া, কত কম মুখস্থ করিয়া কোনও রূপে পরীক্ষা নামক ভয়াবহ সমুদ্রটি পার হইতে পারা যাইবে, এই দিকেই তাহাদের সমগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। এইরূপ মনোভাবও ভূগোল সম্বন্ধে 'কেঁচে গণ্ডূষ' করিবার পথে প্রবল বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের ভূগোলে প্রাথমিক শিক্ষার ত্রুটি শিক্ষিকার মনে পূর্বস্মৃতি জাগাইয়া তুলিল। পারিবারিক পরিবেশে, পিতা মাতার প্রেরণায় ও যত্নে বালকবালিকাদের ভূগোল শিক্ষার যে সহজ সুন্দর প্রণালী তিনি একদা দেখিয়াছিলেন, বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণীগুলিতে কি সেরূপ বা ঐজাতীয় ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়?

অনেক দিনের কথা। কোন আত্মীয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া শিক্ষিকা দেখিলেন, ছয় হইতে দশ বারো বৎসরের কয়েকটি বালকবালিকা আপন মনে হুড়োহুড়ি করিয়া খেলা করিতেছে। খেলার মধ্যে যেন একটি বিশেষত্ব আছে। তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলেন। বালকবালিকারা কোথা হইতে রাশি রাশি মাটি আনিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে স্তূপাকারে জমা করিয়াছে। এখন সানন্দ কলরবে তাহার উপর সযত্নে এদিকে সেদিকে ঘুরাইয়া—কোথাও জোরে, কোথাও ধীরে জল ঢালা হইতেছে। জলধারার বেগে স্থানে স্থানে মাটির স্তূপ ভাঙিয়া আশিনার প্রায় সমস্তরে গিয়া মিশিতেছে। ইহা দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন ব্যস্ত হইয়া বলিল—সব ভেঙে যাচ্ছে যে। তার চেয়ে আয়, হাত দিয়ে খাল কেটে কেটে তৈরি করি। উদ্ধিষ্ট বালকটি সর্বাঙ্গে অগ্রাহ্যের ভঙ্গি করিয়া বলিল—তা হলে স্বাভাবিক ভাবে তৈরি হবে কি করে? পাহাড়, পর্বত, নদী, হ্রদ এ সব তো নিজে নিজে তৈরি হয়েছে, কোন মানুষ তৈরি করেনি। উপর থেকে জল ঢেলে দিলে দেখিস নিজে নিজেই কত কিছু গড়ে উঠবে। সুতরাং জল ঢালা চলিল। শিক্ষিকা বিস্মিত মুখে চাহিয়া দেখিলেন, মাটির স্তূপটি ছোট ছোট নানা প্রকারের প্রাকৃতিক

দৃশ্যের প্রতিভূ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বালক-বালিকারা এবার খেলার আসল অংশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাহারা মহোৎসাহে একে অপরকে বলিতেছে—এই দেখ, এটা যেন একটা বড় নদী, পর্বতের চূড়োর কাছ থেকে বেরিয়ে একেবারে শেষ পর্যন্ত এসেছে। এখানটা তাই সমুদ্র, কেমন? এটা হচ্ছে মোহানা। এইরূপে তাহারা শাখানদী, উপনদী, গিরিসঙ্কট, হ্রদ প্রভৃতি আবিষ্কারে লাগিয়া গেল। উঁচু নীচু অনুসারে মৃৎখণ্ডগুলির নামকরণও হইয়া গেল—কোনটা এভারেষ্ট, কোনটা গৌরীশঙ্কর, কোনটা কাঞ্চনজঙ্ঘা। শিক্ষিকা দেখিলেন, একটু সাহায্য করিলে ইহা হইতে আরও অনেক কিছু সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা জন্মিতে পারে। তাই দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া বলিলেন—আমিও তোমাদের সঙ্গে খেলবো, আমাকে খেলায় নেবে? বালক বালিকারা এরূপ প্রস্তাবের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। তিনি যখন বলিলেন, তোমরা তো অনেক কিছু আবিষ্কার করেছ, সে সব ছাড়াও আরও কতকগুলি জিনিষ এখানে আছে। এই দেখ—উপকূল, এটা অন্তরীপ, এ দুটো উপসাগর আর উপদ্বীপ—তখন তাহাদের সামগ্রিক বিবৃতি বিগুণ কলরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শিক্ষিকা বিস্ময়-বিহ্বল হইয়া দেখিলেন পৃথিবী ছেলেমেয়েদের এই জল মাটি লইয়া নোংরামি, চেঁচামেচি ও পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণটিকে হতশ্রী করিয়া তোলার জন্য তিরস্কার করিতেছেন না। বরঞ্চ তাঁহার মনে হইল, কাজের ফাঁকে তৃপ্তিভরা চোখে ছেলেমেয়েদের রচিত এই ক্ষুদ্র সুখটুকু দেখিয়া যেন মনে মনে আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতেছেন।

আর একদিন। সেদিন বিকালে পূর্বোক্ত বাড়িতে বেড়াইতে গিয়া বালকবালিকাদের এক অভিনব খেলার সঙ্গে শিক্ষিকার পরিচয় ঘটিল। তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইয়া গৃহস্বামী বলিলেন, এ খেলাটি তিনি পূর্বদিন উহাদের শিখাইয়াছেন। এই নূতন খেলা দেখিয়া শিক্ষিকা বুঝিতে পারিলেন খেলার ভিতর দিয়া ভূগোল শেখানো সত্যই কত সহজ।

সৌর মণ্ডলে পৃথিবীর গতিপথের অনুকরণে প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি বৃত্তাকার রেখা এবং সূর্য ও গ্রহগুলির অবস্থান চিহ্নিত করিয়া কতকগুলি বিন্দু অঙ্কিত করা হইয়াছে। বিন্দুগুলির নিকট তাহাদের পরিচয়জ্ঞাপক নাম অর্থাৎ সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি লেখা আছে। তা ছাড়া কতকগুলি ছোট ছোট কাগজের টুকরায় ঐ নামগুলি লিখিয়া খেলুড়িরা এক একটি তাহাদের জামার সঙ্গে আঁটিয়া নিয়াছে। বৃত্ত রেখাটির উপর সমান দূরত্বে চারিটি বিন্দু অঙ্কিত করিয়া সেগুলির পরিচয় গ্রীষ্ম, শরৎ, শীত ও বসন্ত লেখা আছে। সূর্য ও গ্রহগণ অর্থাৎ খেলুড়িরা এবার স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। খেলা সুরু করার নির্দেশ জ্ঞাপন করিয়া সূর্য চেঁচাইয়া বলিল—রেডি। তখন পৃথিবী ধীরে ধীরে নিজের চারিদিকে আবর্তন করিতে করিতে বৃত্তরেখার উপর দিয়া শরৎ-চিহ্নিত স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। চন্দ্র তাহাকে পরিক্রমণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল। এই সময় অন্যান্য গ্রহগণ সুর সহযোগে যে ছড়া আবৃত্তি করিতেছিল, তাহা অনেকটা এইরূপ:

রাত্রি দিনের ছোট বড় একটু করে কমলো,
গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি বাদল ধারা নামলো।
কালের সেরা শরৎরাণী, সমান দিন ও রাত্রি,
শীতাতপের ঘুচলো বিরোধ বাঁচলো জীবধাত্রী।
সোনার আলোয় যে ডুব ডুব,
মাঠ শরতে জল বিযুব।

এবার পৃথিবী ও চন্দ্র শীতকালের দিকে অগ্রসর হইতেছে:

রাত্রি ক্রমেই বড় হ'ল দিনটা ক্রমে কমছে,
শরৎ লক্ষ্মী বিদায় নিল, শীতের হাওয়া বইছে।

সোনার বরণ ধানের ক্ষেত স্বপন লাগায় চক্ষে,
কাস্তে হাতে চাষী চলে আশায় ভরা বক্ষে।
শিশির পড়ে টাপুর টুপ,
পিঠে পায়েস পাখির গুঁফ।

পৃথিবী ও চন্দ্রের গতি এবার বসন্ত কালের দিকে,

রাতের ভাগটা কমেছে,
দিবস ক্রমেই বেড়েছে।
প্রথম দিকে শীত বস্ত্র,
পঞ্চমেতে তান ধর।
স্বাগত হে বসন্ত,
শোভা তোমার অনন্ত।
সমান হ'ল দিন ও রাত,
নাইরে শীত, নাইকো তাত।
দখিন হাওয়ায় বাজলো বীণ,
মহাবিষুব তাধিন ধিন।

বসন্তকে অতিক্রম করিয়া চন্দ্র ও পৃথিবী গ্রীষ্ম-কালের দিকে অগ্রসর হইল :

দিন বেড়ে যায়, রাত্রি ছোট, ফিরে এল গরমি,
কাল বোশেখির ঝড়ের পরে আকাশ সজল
ধরণি।
কাসুন্দিতে কাঁচা আম আর পাকার ঘন চুম্ব,
তাহার সঙ্গে সবরি কলার ছেলে বুড়ো মুগ্ধ।
চার ঋতুতে ছয়টি রূপ
সঙ্গে এবার সবাই চুপ।

পৃথিবী ও চন্দ্র যেখান হইতে যাত্রা সুরু করিয়া-ছিল, সেখানে আসিয়া থামিল, ছড়া-গানও শেষ হইল। ছড়া শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য ছাড়া অন্যান্য সকলে ছুটিয়া সৌরমণ্ডলের নির্দিষ্ট গতির বাহিরে গিয়া সুর করিয়া সমস্বরে বলিল, "সকল গ্রহ ছোটে, রবির আঁখি ফোটে।" ইহা প্রস্তুতির ইঙ্গিত; তখন সূর্য ছুটিল তাহাদের সকলকে ছুঁইবার জন্য। এই ছুটাছুটির মধ্যে যে দৈবাৎ সৌরমণ্ডলের নির্দিষ্ট গতির মধ্যে আসিয়া পড়িল অথবা যাহাকে সূর্য ছুঁইতে পারিল, সে আপন পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। সকল খেলুড়ি ছোঁয়া যাইবার পর যখন একজন মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, খেলার জয়মাল্য তাহারই প্রাপ্য। পরবর্তী খেলায় সেই হইবে সূর্য এবং সূর্য তাহার পদ গ্রহণ করিবে।

কোন সুপরিকল্পিত শিক্ষানীতির সন্ধান অনুসরণ ইহা নহে। ইহা নিতান্তই খেলা। অথচ ভূগোল শেখানোর কি আনন্দজনক আয়োজনই না ইহাতে রহিয়াছে। উপরের শ্রেণীগুলিতে ঋতু পরিবর্তনের কারণ বুঝাইতে গিয়া শিক্ষিকাকে প্রায় প্রতিবারই ছাত্রীদের নূতন বিষয়ের সহিত সংযোগ স্থাপনার দায়িত্ব লইতে হইয়াছে। কিন্তু যাহারা এই ভাবে খেলার মধ্য দিয়া সৌরমণ্ডলে গ্রহ উপগ্রহের অবস্থান ও গতিবিধি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করিবে, ইহার সঙ্গে ঋতু পরিবর্তনের সম্পর্ক যে নিবিড়, তাহা অনুভব করিবে, পরবর্তীকালে ঋতু পরিবর্তনের ভৌগোলিক কারণ সমূহ তাহারা যে সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভূগোল পাঠনার শ্রেণীতে ছাত্রীদের এ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানের অভাবের যে রূপ শিক্ষিকার নজরে পড়িয়াছে, তাহা নৈরাশ্যজনক। তাই পূর্ব কথা মনে পড়িয়াছে। সেদিন পিতামাতার যত্নে যে বালক-বালিকারা ভূগোল শিক্ষার ভিত্তিভূমি পাকা করিয়া গড়িয়া তোলার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহারা আজিকার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র হইবার যোগ্য বটে, কিন্তু যাহারা শৈশবে ও বাল্যে বিদ্যালয়ে ও গৃহে সমভাবে উপেক্ষিত হইয়া তাহাদের অপরিমিত অজ্ঞতা লইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের এই ভিত্তিভূমিগত ত্রুটি সংশোধনের কোনও পথ কি এখনও খোলা আছে? শিক্ষিকা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ছাত্রীদের সংস্কৃতি-সংঘের আগামী সম্মিলনীতে ভৌগোলিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিলেন।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ	ভাদ্র ১৩৬০	১০ম সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষক রাজনারায়ণ বসু

প্রায় সওয়া শ' বৎসর আগে ২৪শে ভাদ্র ঋষি রাজনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙলার মাটিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ঐ সময়টা বাঙলার এক মহা জাগরণের যুগ। পাশ্চাত্যের চোখ-ঝলসানো শিক্ষার মোহে বাঙালী যখন আত্মবিস্মৃত হইতে বসিয়াছিল সেই সময়ে দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি ও অনুভূতিকে যাঁহারা ঘা মারিয়া নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন রাজনারায়ণ বসু তাঁহাদের অন্যতম। দেশের সভ্যতার সত্য সুন্দর ও কল্যাণময় রূপটিকে পুনরায় বাঙালীর জীবনে মূর্ত করিয়া তুলিতে, অন্ধ কুসংস্কারের অচলায়তনকে ভাঙিয়া ফেলিতে, ইঁহারা একরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। দেশের ও দেশবাসীর দীনতা, খর্বতাকে দূর করিয়া নূতন আলোক জ্বালিবার জন্য ইঁহাদের প্রয়াসের অন্ত ছিল না।

দেশপ্রেম যেমন রাজনারায়ণকে বিদেশী পণ্য বর্জনের ও দেশীয় শিল্পপ্রচলনের জন্য চেষ্টায় উদ্বোধিত করিত, তেমনই স্বদেশের সমাজ-সংস্কারে, শিক্ষাপ্রচারেও প্রেরণা দিত। মেদিনীপুর জেলার শিক্ষকতার কাজে ইঁহার জীবনের অনেকখানি কাটিয়াছিল। এই কাজ তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, অনেক বড় পদ পাইয়াও তিনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। শিক্ষক-জীবনে তিনি অনাড়ম্বর নিষ্ঠায় যে নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌গণও তাহাই অনুসরণ করিতে বলেন। "ভাল বাসিয়া মিষ্ট কথা বলিয়া শিশুর মনস্তত্ত্ব বিচার করিয়া" শিক্ষা দেওয়ার রীতি তো সে যুগে বিরল ছিল, অথচ ইহাই ছিল রাজনারায়ণের শিক্ষার মূল নীতি। বাহির হইতে চাপানো শাসনে ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণ করা তিনি পছন্দ করিতেন না। শিক্ষকের আন্তরিকতা ও প্রীতিই ছাত্রকে শিক্ষকের অনুগত করিবে, শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধাবান ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহশীল করিবে এই ছিল তাঁহার দৃঢ় ধারণা, আর এই নীতিতে চলিয়া তিনি কতদূর সফলকাম

হইয়াছিলেন তাহা আলোচনা করিলে বর্তমান বাঙলার শিক্ষক সম্প্রদায় উপকৃত হইবেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বিস্তারিত রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, কমিশন বিচার বিবেচনা করিয়া কতকগুলি মূল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। সমগ্র রিপোর্টটি শিক্ষাবিদ্‌গণের আলোচনা ও পরীক্ষা করা প্রয়োজন; আমরা প্রধান যে কয়েকটি বিষয়ে কমিশন পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার উল্লেখমাত্র করিতেছি। এবিষয়ে শিক্ষার বর্তমান সংখ্যায় সামান্য আলোচনা হইল, আশাকরি ভবিষ্যতে বিস্তারিত আলোচনা শিক্ষার পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত করা সম্ভব হইবে।

কমিশন প্রধানত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক শিক্ষাকাল ৭ বৎসর হইবে। ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও হাতের কাজ সকলের অবশ্যপাঠ্য হইবে; কারিগরি পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীর রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী।

মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম থাকিবে। তবে মাধ্যমিক পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা ও একটি বিদেশী ভাষা শিখিতে হইবে।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি থাকিবে। বিদ্যালয়গুলি বৎসরে দুইশত দিন খোলা থাকিবে।

শিক্ষকদের বেতন ও চাকুরির সর্তগুলির উন্নতিবিধান ও পেন্সন-প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সুবিধা দিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক আকর্ষণ করিবার জন্য শিক্ষকদের সন্তানসন্ততিকে কিছু কিছু সুবিধা দিতে হইবে। শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সরকারি চাকুরিতে শিক্ষকনিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থা আর চলিতে পারে না, ইহার সুবিবেচনার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করিতে হইবে।

শিক্ষার জন্য মূলত রাজ্যের দায়িত্ব স্বীকার করিলেও কেন্দ্রীয় সরকারকে মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন করিতে গেলে যে সব সরকারি বিভাগের সুবিধা হইবে তাহারা কারিগরি শিক্ষার জন্য অর্থ-সাহায্য করিবে।

শিল্পের উপর কারিগরি শিক্ষাকর আদায় করিতে হইবে ও শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থভাণ্ডারকে আয়কর হইতে রেহাই দিতে হইবে।

সমাজের সহিত বিদ্যালয়ের যোগসূত্র নিবিড়তর করিবার উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যালয়ের কার্য-প্রণালী নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে ও সাধারণ লোককে সেই গ্রন্থাগারের সুযোগ দিতে হইবে, বিদ্যালয়গুলিকেও সমাজের কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হইবে।

পরীক্ষায় নম্বর দিবার বর্তমান ব্যবস্থাকে কমিশন ছাত্রের যোগ্যতা নির্ণয়ে যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন না—তাঁহারা grading system বা পর্যায় প্রথা অনুমোদন করিয়াছেন।

কমিশন বিদ্যালয়-ভবন, খেলার মাঠ, ছাত্রদের ব্যায়াম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যচর্চার দিকে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য-সরকার, জনসাধারণ ও শিক্ষকশ্রেণী সকলের সহযোগিতা ও চেষ্টার জন্য কমিশন আবেদন জানাইয়াছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

ভারতীয় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি নানা রকম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। অবস্থা সুবিধার নয়, পরিষ্কার বোঝা যায়, ছাত্রগণ পরিচালন ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়, কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের আচরণে বিরক্ত। কেন এমন হয়? ছাত্রছাত্রী বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে; বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে তাহাদের শিক্ষার গোড়া-পত্তন হইয়াছে, এখন কর্মজীবনে প্রবেশের প্রস্তুতি

সময়, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্র নানা দিকে তাহাদের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিতেছে ; এখন দুই হাত মেলিয়া গ্রহণ করিবার, দুই চক্ষু মেলিয়া দেখিবার সময়। এখন তাহাদের চোখের দৃষ্টি বিচার বিশ্লেষণ করিতে ব্যগ্র, কর্মশক্তি আপনার পথ কাটিয়া বাহির হইতে উৎসুক, এই সময়টিতে পথপ্রদর্শক হিসাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ তাহাদের পরম বন্ধুর স্থানে আসীন। কিন্তু কেন তেমন সম্পর্ক হয় না ? যেখানে সহযোগিতা, একপ্রাণতা, আন্তরিকতা থাকিবার কথা, সেখানে কেন এই বিরূপ মনোভাব, কেন এই বিক্ষোভ ? সকলেরই ভাবিবার বিষয়, শিক্ষকদের, পরিচালক, অভিভাবক, এবং ভবিষ্যৎ সমাজের আশাস্থল, বর্তমানের ছাত্রছাত্রীদের।

এই প্রসঙ্গে আমরা পণ্ডিত নেহরুর একটি সময়োচিত উক্তির প্রতি পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। লক্ষ্ণৌ ও এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তিনি বলেন যে শুধু ছাত্রগণকে বা শিক্ষকগণকে দোষী করিয়া কোন লাভ নাই। এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী আমরা সকলেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয়-ইউনিয়নগুলি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান হওয়া উচিত, কর্মকর্তা নির্বাচনে এবং পরিচালনকর্মে ইউনিয়নগুলির পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা দরকার,—তবে কোন কোন বিষয়ে সীমারেখা টানিতে হইবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গুলিকে যদি আমরা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলিতে না চাই, এবং আনুষঙ্গিক অকল্যাণ হইতে যদি তাহাদের বাঁচাইতে চাই, তবে আমাদের সকল শক্তি সংহত করিয়া এখন চেষ্টা করিতে হইবে। যদি প্রয়োজন হয়, তবে বর্তমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিতে হইবে।"

"অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনায় সরকারি হস্তক্ষেপ যত কম হয়, ততই ভাল। আমি সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না, কিন্তু বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালন ব্যবস্থায় কোন স্থানে এক বিরাট ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। যে সকল মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, সেই সব আজ বিফল হইতে চলিয়াছে। এই ব্যাপারে আমরা কি নির্লিপ্ত ও নিষ্ক্রিয় দর্শক-মাত্র হইয়া থাকিতে পারি ? তাহাতে যে চরিত্র, শৃঙ্খলা, সমবেত চেষ্টা ও ভ্রূণোদর্শনের শিক্ষাভূমি এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমূহ ক্ষতি হইবে। আজ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীগণকে এই অবস্থার প্রতিকারের উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ানের সভ্যপদ নির্বাচন সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন যে, আমার সময়ে ইউনিয়ানে থাকা না থাকা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছামূলক ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিয়ানগুলি ছাত্রদের পরস্পর বিরোধের বা রাজনৈতিক দলবিশেষের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র নয়, অথবা পরিচালক বা শিক্ষকদের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাজে হস্তক্ষেপ করা এই সকল সংস্থার অনুচিত। আজিকার ছাত্রসমাজই আগামী কালে দেশের নেতা হইবে ; গোড়াতেই যদি এই ভাবে শিক্ষা, শৃঙ্খলা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে দেশের ভাবী নেতৃত্ব কিরকম হইবে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিতেছি ?

নয়ী তালিম সম্মেলন

অখিল ভারত নয়ী তালিম সংঘের নবম বার্ষিক সম্মেলন এবার নভেম্বরের মাঝামাঝি আসামে অনুষ্ঠিত হইবে। ইষ্টার্ণ রেলওয়ের উপরে গৌহাটি হইতে দুইশত মাইল দূরে টিটাবর নামক স্থানে সম্মেলনের অধিবেশন হইবে ; টিটাবর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র এখানে অবস্থিত। সুদূর আসামের এক নিভৃত কোণে এই কেন্দ্র বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রচারের কাজে ব্যাপৃত আছে। সম্মেলন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এই শিক্ষায় অনুরাগী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এখানে মিলিত

হইবেন—তাহাদের কাছে চিটাগংএর কর্মীরা শুধু নয়, সকলেই পরস্পরের নিকট হইতে অনেক জানিতে ও শিখিতে পারিবেন। আমরা এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করি।

অতিথিদের থাকিবার ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাঁহারা এই সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সম্পাদক, হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ, সেবাগ্রাম (ওয়ার্ধা) এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে বিস্তারিত জানিতে পারিবেন।

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবিশ

অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতায় নিজ গৃহে পরলোক গমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন. পরেও বহু বৎসর এমেরিটাস অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনা ইহার জীবনের ব্রত ছিল, অনেক সুচিন্তিত, গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। অমায়িকতা, স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ ও আত্মমর্যাদা-জ্ঞানে ইনি সকলের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। এই গম্ভীর প্রকৃতির লোকটি কিন্তু শিশুদের একান্ত আপনার জন ছিলেন। বাৎসরিক বালা সমাজের উৎসবে সুবোধ বাবুর গল্প বলা শিশুদের একটি বিশেষ আকর্ষণের বস্তু ছিল। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে ইহার আজীবন যোগ ছিল। ইনি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। দুই জনেরই মেয়েদের শিক্ষা ও কল্যাণের জন্য মনে গভীর দরদ ছিল। ইহাদের সমবেত চেষ্টায় ৮৩নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে কলেজের মেয়েদের থাকিবার জন্য যে হোষ্টেল খোলা হয় তাহা মেয়েদের একটি বিশেষ অভাব পূর্ণ করিয়াছিল। স্থানাভাবে তখন অনেকের কলেজে পড়াই অসম্ভব হইত। সেই হোষ্টেলটিকে মেয়েদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র করিবার জন্য তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল। জনকল্যাণে নিয়োজিত-প্রাণ এই শিক্ষাবিদের মৃত্যুতে আমরা গভীর দুঃখ বোধ করিতেছি।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির কয়েকটি অসুবিধা

[শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বক্সী]

শিক্ষণ বিদ্যালয়ের কাজে লিপ্ত থাকলেও বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল না। সম্প্রতি ঐরূপ অভিজ্ঞতা কিছু হয়েছে। কিছু কিছু অসুবিধার কথা এখানে আলোচনা করছি।

(১) বিদ্যালয়গৃহ :—পরিবেশের তুলনায় গৃহগুলি মনোরমভাবে নির্মিত হয়েছে। কিন্তু শ্রেণী গঠনের দিক থেকে অসুবিধা অনেক আছে। সাধারণতঃ টিন বা এসবেস্টসের ছাউনি, এজন্য শীত গ্রীষ্ম উভয় ঋতুতেই কক্ষগুলি চরম ভাবাপন্ন। এক শ্রেণীর গোলমাল অন্য শ্রেণীর কাজে ব্যাঘাত ঘটায়। দেওয়াল সিমেন্ট নির্মিত—প্রদীপন পত্র আটকানো সমস্যার ব্যাপার। প্রতি শ্রেণীর জন্য এক একটি খুটির হলে ভাল হয়। পশ্চিম বঙ্গের অনেক জেলায় মাটি বেশ পোক্ত—এজন্য মাটির দেওয়াল বা কাঁচা ইটের দেওয়াল টেকসই হবে। মেঝে বাঁধানো ভাল, তবে অন্তত উচ্চতর শ্রেণীগুলির জন্য work-shop ধরণের চালা রাখা উচিত—নইলে অনেক হস্তশিল্প অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ছাউনি খড়ের হলে কক্ষগুলি আরামদায়ক হয়। না হলে সিলিঙ

দেবার ব্যবস্থা রাখা উচিত। পৃথক কুটির না হলে অন্তত দুটি শ্রেণীর জন্য একটি কুটির করা যায়। Nature-Corner ও সংগ্রহালয় রাখার ব্যবস্থা নাই, অথচ ঐ দুটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে থাকার কথা।

পাকা বাড়ীতে চলতি খরচের দায়িত্ব কমে—কিন্তু কর্মকেন্দ্রী শিক্ষাতে তার উপযোগিতা বোধ হয় কম। এবিষয়ে নূতনভাবে চিন্তার প্রয়োজন হয়েছে।

(২) বাগান :—সাধারণত বিদ্যালয়ের জন্য প্রাপ্ত জমি পতিত ও কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত জমি। গৃহনির্মাণ কালে তা আরো অকেজো হয়ে পড়েছে। গৃহনির্মাণের সঙ্গে জমির সংস্কার সাধনের ব্যবস্থাও রাখা উচিত, নতুবা শিশুদের দ্বারা বাগান তৈরী সম্ভব হবে না। বাগানের জন্য মজবুত বেড়ার ব্যবস্থা রাখা উচিত। বাগানের দেখাশুনা করার জন্য একজন মালী নিয়োগ অথবা একজন শিক্ষককে বিশেষ ভার দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। বাগানের কাজ শিশুদের শিক্ষার পক্ষে খুবই উপযোগী—এজন্য এর দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। বাগানের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক অথবা মালী বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বাসগৃহে থাকবেন, এরূপ নিয়ম করা উচিত। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে টিউবওয়েল বা কূয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। মাটির ঘর তৈরী করলে ঐ সঙ্গে একটি পুকুর তৈরী হয়ে যায়—এবং কৃষির কাজে ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কাজে প্রচুর সহায়ক হয়।

৩। খেলাধূলা :—ছোটদের খেলাধূলার জন্য কিছু সরঞ্জাম রাখা ভাল—যথা দোলনা, পিছলকাটার সিঁড়ি, ও গড়ানে পাটা প্রভৃতি। এগুলি দামী সরঞ্জাম সন্দেহ নাই, কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির পিছনে বেশ মোটা খরচ যখন হচ্ছে, তখন খেলাধূলার ব্যাপারে এরূপ ব্যবস্থা না রাখাই বেমানান হবে।

৪। আনুষঙ্গিক খরচ :—অনেক স্কুলবোর্ড মাসিক মাত্র পাঁচ টাকা কটিগ্রেণী বাবদ বরাদ্দ করেছেন। অনেক বোর্ড শিক্ষকদিগেই ঐ বাবদ খরচ করে বিল দিয়ে টাকা নেবার দায়িত্ব দিয়েছেন। এই দুই ব্যবস্থাই অকেজো। কোনও কোনও বোর্ড আগামের ব্যবস্থা রেখেছেন। মনে হয় এই ব্যবস্থাই ভাল। বলা বাহুল্য, যদি উৎপাদনের পরিমাণ ও উপযোগিতা সম্বন্ধে একেবারে শিথিল হওয়া যায়, তবে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা বেশ ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। এবিষয়ে সরকার ও বোর্ড তাঁদের নীতি নির্ধারণ করবেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাবে যদি কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা অসম্ভব হয়ে ওঠে তবে এবিষয়ে তাঁদের এত প্রচেষ্টা সবই ব্যর্থ হবে। তাঁরা এবিষয়ে অবহিত হবেন, এ অনুরোধ নিষ্প্রয়োজন।

৫। শিক্ষা-সরঞ্জাম ও পুস্তকাগার :—

এদুটির অভাব সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নাই—কিন্তু অনেক বোর্ডের বিদ্যালয়ে এদুটির অত্যন্ত অভাব। অবশ্য সরঞ্জাম প্রদান ব্যাপারে অনেক বোর্ড প্রশংসনীয় উদ্যম দেখিয়েছেন। যাতে সকল বোর্ডই এব্যাপারে অগ্রণী হবার চেষ্টা পান ও একটি সুপরিকল্পিত সূচী অনুসরণ করেন, তার ব্যবস্থা রাখা উচিত। সরকার কর্তৃক পরিকল্পিত প্রদীপন-পত্রাদি নির্মাণ ও সরবরাহ করার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

৬। বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা উচিত। এজন্য স্থানীয় স্বাস্থ্যবিভাগের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়। বিদ্যালয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা অবশ্য বিধেয়।

৭। শিক্ষকদের বেতন বিষয়ে আলোচনা করার কিছু নাই, কারণ তাদের বেতনের স্বল্পতা সর্বজন স্বীকৃত, এবং অর্থনৈতিক অসুবিধা হেতুই তাদের দাবী অপূর্ণ রয়েছে। কিন্তু একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। যেহেতু সাধারণ বিদ্যালয় অপেক্ষা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেশি

সচেতনতা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম প্রয়োজন, সেজন্য তাঁদের বেতন সাধারণ বিদ্যালয়ের অনুরূপ যোগ্যতার শিক্ষকগণের বেতন অপেক্ষা কম হওয়া অত্যন্ত যুক্তিবিরোধী। বর্তমানে তাই ঘটেছে—এর তৎপর সমাধান বিশেষ। বুনিয়াদী শিক্ষাকে যাঁরা রূপ দেবার কাজে ব্রতী, তাঁদিগকে অসন্তুষ্ট রাখলে কোনও পরিবর্তনই আশা করা যায় না।

আর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম থাকলেও সরকারের এই নূতন প্রচেষ্টার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি পড়েছে; তারা এর প্রসারে সম্ভব ঘরবাড়ী লক্ষ্য করে অনেক কিছু আশা করছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের পঠনব্যাপারে কিছু উন্নতি বা পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। বলা বাহুল্য এইভাবে চলতে দিলে জনসাধারণ এই শিক্ষার প্রতি বিমুখ হ'য়ে উঠবেন, তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

[ডক্টর ললিতকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক লক্ষ্ণৌ, বিশ্ববিদ্যালয়]

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ২৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ও ১৬ পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই রিপোর্টের সম্যক আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে, শুধু কয়েকটি বিষয়েরই আলোচনার চেষ্টা করিব।

মাধ্যমিক শিক্ষার মান কোথাও পঞ্চম কোথাও ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে আরম্ভ হয়, ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দশম শ্রেণীতে শেষ হইলেও উত্তরপ্রদেশে ইণ্টারমিডিয়েট ও মিশ্রীতে একাদশ শ্রেণী ইহার অন্তর্গত। সমগ্র মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্রেরা পাঁচ হইতে সাত বৎসর অতিবাহিত করে। কমিশন সর্বত্র সাত বৎসর কাল মাধ্যমিক শিক্ষাকালের মেয়াদ ধরিয়াছেন ও ইণ্টারমিডিয়েটকে ইহার উচ্চতম সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন। সমগ্র ভারতের জন্য এ সমতা কাম্য।

পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে কমিশন যে গুরুতর ত্রুটি দেখিয়াছেন একজন বিচারপতির অধীনে নির্বাচন কমিটির দ্বারাই তাহার সমাধান সম্ভব নহে। আমাদের প্রধান সমস্যা, মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রচিত পাঠ্য পুস্তকের অভাব। অর্থশাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে। যদি বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার অভিজ্ঞ শিক্ষক ও ভাষা, বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ দ্বারা গঠিত একটি বোর্ডকে এক একটি বিষয়ের বর্তমান পাঠ্যপুস্তক সংশোধন ও আবশ্যক হইলে নূতন পাঠ্যপুস্তক রচনার অধিকার প্রদত্ত হয়, তবেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব, নচেৎ নহে। পাঠ্যক্রমের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞানের সহিত ইতিহাস, ও আঞ্চলিক ভাষার সহিত রাষ্ট্রভাষা ও একটি বিদেশী ভাষার স্থান প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে, কিন্তু যে স্থানে রাষ্ট্রভাষাই আঞ্চলিক ভাষা, সেখানকার ছাত্রদের যাহাতে একটি বিষয় কম পড়িতে না হয় তজ্জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার। যদি ঐ সকল অঞ্চলে একটি দ্বিতীয় তৃতীয় ভাষা অথবা সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য করা হয় তবে সমস্যার অনেকটা সমাধান হইতে পারে ও প্রবাসী বাঙালী ছেলেরা বাংলা ভাষার

সহিত সংযোগ রক্ষা করিতে পারেন সেইরূপেই সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় আপনাদের উর্দু সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখিবেন।

পরীক্ষার মধ্যে দৈনিক কার্যের ফলাফলের রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা ভালই, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় ইহাতে পাঠের মানও হ্রাস হইবার আশঙ্কা আছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই-তৃতীয়াংশ হইতে তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় ছাত্রদের ফি হইতে নির্বাহ হয়। ছাত্রসংখ্যা যাহাতে হ্রাস না পায় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা তাই অবশ্য প্রয়োজনীয়। যদি কোন স্কুল দৈনিক কার্যের রেকর্ড কঠোর বা ন্যায়সঙ্গত ভাবে রাখে তবে তাহার প্রভাবে পাশের হার কম হইবে ও অন্যত্র যেখানে এই রেকর্ডে শিথিল ভাবে নম্বর প্রদত্ত হইবে সেই স্কুলেই ছাত্রেরা ভর্তি হইবে। ফলে সকল স্থানেই এই রেকর্ডের নম্বর একটা ছেলে-খেলার বিষয় হইয়া উঠিবে। ইংলণ্ড বা আমেরিকার দৃষ্টান্ত এ অবস্থায় কার্যকরী হইতে পারে না, কারণ ঐ দুই দেশে বিদ্যালয়সমূহ ছাত্রের ফির উপর ততটা নির্ভর করে না যতটা এ দেশে বিদ্যালয়ের করিতে হয়। ইংলণ্ডে বিদ্যালয়ের ফি মাত্র সমস্ত আয়ের শতকরা ১২½ ভাগ, অবশিষ্ট অর্থ হয় সরকার নয় বহুৎ স্থানীয় শিক্ষাবোর্ড (Local Education Authorties) বৃত্তিরূপে ছাত্রদের দিয়া থাকেন। আমেরিকায় তো মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক। ঐ দুই দেশে রেকর্ড রাখা যেরূপ নিরপেক্ষ হইবার সম্ভাবনা, আমাদের দেশে সেরূপ নিরপেক্ষতা তখনই সম্ভব যখন সরকারি সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যালয়গুলির ফির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা হইবে। কমিশন সমস্যাটার এদিকে চিন্তা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

কমিশন কারিগরি শিক্ষার প্রসার বাড়াইবার সুপারিশ করিয়াছেন। অনেক ছাত্রকে কারিগরি শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করিলে দেশের বেকার গ্র্যাজুয়েট সমস্যার সমাধান হইবে, কমিশন মনে করেন। কিন্তু আমাদের বেকার সমস্যা আসলে বে-পেশা সমস্যা। টেকনিকাল স্কুলে যেরূপ শিক্ষা প্রদত্ত হয় তাহাতে যে জটিল যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাহা মাত্র মুষ্টিমেয় কারখানাতেই পাওয়া যায়। শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া বিত্তহীন ছাত্র নিজে স্বাবলম্বী হইতে পারে না, তাহাকে কারখানার চাকুরির দিকেই ঝুঁকিতে হয় ও টেকনিকাল স্কুলের সংখ্যা বাড়াইলে আমরা বেকার গ্র্যাজুয়েটের স্থলে বেকার শিল্পীই পাইব মাত্র। দেশের মধ্যে পেশা বাড়াইতে হইলে দেশের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইতে হইবে, আমাদের অর্থকরী শিক্ষা এরূপ ভাবে দিতে হইবে যাহাতে পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রেরা স্বাবলম্বী হইয়া ব্যবসায়ে বা শিল্পে প্রবৃত্ত হইতে পারে। যদি টেকনিকাল স্কুলের স্থানে ছোট ছোট ওয়ার্কশপ খুলিয়া ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তাহাতে ছাত্রদের কর্মের সুযোগ দেওয়া যায়, ও প্লেটুন প্রথার উদ্ভবে ছাত্রদের অর্ধ সময় বিদ্যালয়ে পাঠ ও অন্য সময় ওয়ার্কশপে কার্যের সুযোগ প্রদত্ত হয়, তবেই সমস্যার সমাধান সম্ভব। ঐ অবস্থায় ওয়ার্কশপগুলির আয় বিদ্যালয়ের আংশিক ব্যয়ভার বহন করিতে পারে। ইহার ফলে আমাদের ছাত্রেরা পাঠের সময়েই কিছু অর্থোপার্জন করিতে পারে ও ঐ অর্থ তাহাকে সে সময়ে প্রদান না করিয়া পাঠশেষে প্রদান করিলে হয়তো তাহার যে মূলধন হইবে তাহাতে সে স্বাবলম্বী হইয়া ব্যবসায় খুলিতে পারে। এইখানে পরিকল্পনার ইঙ্গিত মাত্র প্রদত্ত হইল। ইহার বিশদ আলোচনা স্থানাপেক্ষ। ইহার জন্য পূর্বে আমাদের সুদক্ষ কারিগর তৈয়ারী করিতে হইবে ও তাহাদের শিক্ষাদান আমেরিকা বা ইংলণ্ডে না হইয়া জাপান বা সুইজারল্যাণ্ড, যেখানে ঐরূপ ক্ষুদ্রশিল্প প্রসার লাভ করিয়াছে সেখানেই হওয়া উচিত।

আমাদের সর্বপ্রথম অভাব অর্থের। শিক্ষার জন্য

আমরা রাজস্বের যে অংশ ব্যয় করি তাহা অন্য দেশের তুলনায় লজ্জাকর। দেশে বহু অর্থ নানা ভাবে অপব্যয় হইয়াছে, সর্বপ্রথম তাই অন্য বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষার ব্যয় বরাদ্দ বাড়াইতে হইবে, নচেৎ দেশের শিক্ষাসমস্যার সমাধান সম্ভব নহে।

অনগ্রসর শিশুর লেখাপড়া

[শ্রীগৌরী সেনগুপ্ত]

শ্রেণীতে পাঠদান কালে অনেক ছেলেকে শ্রেণীর কাজের সঙ্গে সমতা রেখে চলতে দেখা যায়, অনেক ছেলেকে দেখা যায় তারা নির্দিষ্ট পাঠ সমাপন করে আরও কাজের জন্য চাহিয়া জানায়। আবার দু একজন ছেলে বা মেয়েকে দেখা যায় তারা ঠিক শ্রেণীর চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পেরে পেছনে পড়ে আছে। শ্রেণীতে পড়াতে গিয়ে শিক্ষক এরূপ তৃতীয় প্রকারের সাক্ষাৎ পান এবং সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে শেখাবার কিছুটা চেষ্টাও করেন, কিন্তু সফলকাম হন না।

কিছুদিন এরূপভাবে চলার পর শিক্ষক স্থির নিশ্চিত হন যে শিশুটি শ্রেণীর ঠিক উপযুক্ত নয়, সে পিছিয়ে-পড়া ছেলে। এ অবস্থায় তার বুদ্ধাঙ্ক এবং সে লেখাপড়ায় ঠিক কোন অবস্থায় আছে তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। শিশুর মানসিক বয়স বের করে বুদ্ধির কোন পর্যায়ে শিশু আছে, তা বের করতে হবে, আর তার লেখাপড়ার প্রকৃত অবস্থা বের করতে হবে, সে কতটা শিখেছে জানতে হবে। সে খবর পূর্বেই প্রায় জানা ছিল, এখন তার সঠিক অবস্থা জানা গেল। শুধু পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে অপারগ শিশুর বুদ্ধাঙ্ক ৭০ থেকে ৮৫র মধ্যেই হবে তার কোন মানে নেই, তার অনেক বেশিও হতে পারে। ঐ জাতীয় শিশুর কথা আমরা পরে আলোচনা করব। আমরা শুধু এখন দেখব, বুদ্ধাঙ্ক যাদের কম তারা কি ভাবে শিখবে এবং তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে। প্রথমত কথা হচ্ছে, প্রথম শ্রেণীর ঐরূপ শিশুকে কিভাবে শেখাতে হবে। শিশু প্রথম শ্রেণীতেই প্রথম এসেছে, স্কুলে তার অভিজ্ঞতা হয়তো দুই তিন মাসের। কিন্তু সাধারণ পদ্ধতিতে পড়াশোনার ফলে সে হয়তো কিছুই শিখতে পারে নাই কিংবা খুবই অল্প শিখেছে, যার সঙ্গে সাধারণ শিশুর গতির কিছুমাত্র সমতা নেই। তাহলে শিশুর অবস্থা দুরকমের হতে পারে—

১। সম্পূর্ণ অক্ষমতা অর্থাৎ শিশু কিছুই লিখতে পড়তে পারে না।

২। আংশিক অক্ষমতা অর্থাৎ কিছু কিছু লিখতে পড়তে পারে, কিন্তু শ্রেণীর উপযুক্ত নয়।

সম্পূর্ণ অক্ষমতা স্থলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ অপারগ শিশুকে কি ভাবে পড়া ও লেখা শেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে? প্রায় চল্লিশ পঁচিশটি কার্ডে চিত্র-সম্বলিত শিশুর জানা বস্তুর নাম লিখে তার কাছে ধরতে হবে—সে কোনটা শিখতে চায়। জানা শব্দ-গুলির সঙ্গে পরিচয় হবে ছবির সাহায্যে। শিশু শব্দ দেখে ও শুনে একটি শব্দকে পছন্দ করল। শিশুকে তখন সিরিষ কাগজে শব্দটিকে কেটে দিতে হবে এবং শিক্ষক শব্দটির উপর আঙুল ঘোরাবার ধরণ দেখিয়ে দেবেন। আঙুল ঘোরানোর অনুভূতি পেন্সিল বা কলম দিয়ে হাত ঘোরানোর অনুভূতি হতে অনেক বেশি। শিক্ষক মহাশয় হাত ঘোরাবার

কারণ কেন দেখিয়ে দেবেন ? কারণ ঘরণটা দেখিয়ে না দিলে এবং শিশুর নিজের উপর হাত ঘোরাবার ভার ছেড়ে দিলে শিশু হয়তো ভুল কারণার শব্দটা লিখতে শিখবে। এই অবস্থা যাতে না ঘটে সেইজন্য শিশুকে হাত ঘোরানোর সময় শব্দের আকারটা দেখিয়ে দিতে হবে এবং বার বার পড়ে দিয়ে শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। কিছুক্ষণ হাত ঘোরাবার পর শিশু শব্দটিকে দেখে লিখতে পারবে, তারপর সে শব্দটি না দেখেও লিখতে পারবে। একটি শব্দ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার পর আর একটি শব্দ একই ভাবে শেখানো হবে, কিন্তু এবারে শিশুর কাছে শব্দগুলি দিয়ে তাকে বেছে নিতে দেওয়া হবে না। কারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে বাক্য শেখান, সে অবস্থায় যদি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ শেখান হয় তবে শিশুর পূর্ণ বাক্যে পৌঁছতে মুস্কিল হবে। এ অবস্থায় তাহলে শিক্ষককে প্রথম শব্দের দিকে লক্ষ্য রেখে দ্বিতীয় শব্দটি বেছে দিতে হবে। শিশু প্রথমবার নিজের কৃতিত্বের আনন্দে হয়তো বেছে দেওয়া শব্দ লিখতে আপত্তি করবে না। বারে বারে তাকে ঘুরিয়ে শব্দটিকে শেখার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে। এ শব্দটিও শেখা হয়ে গেলে তারপর আর একটি শব্দ লিখিয়ে একটি পূর্ণবাক্য শেখাতে হবে। পূর্ণবাক্যকেও লিখিয়ে পড়িয়ে শিশুকে আয়ত্ত করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এখানে একটা খটকা অনেকের মনে আসতে পারে। এতটা যান্ত্রিকভাবে শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হল কেন ? শিশুর আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের উপর এ অবস্থায় কেন জোর দেওয়া হল না, তা ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। শিশুকে সাধারণ নিয়মে নানারকম কাজের সাহায্যে পড়া ও লেখা শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু শিশু তা অনুসরণ করতে পারে নি। ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল কারণ কর্মকে অনুসরণ করে শিক্ষা দিতে গেলে প্রায় সকল সময়েই ব্যক্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়, সেদিক থেকেও সে কম সাহায্য পায় নাই, তবু কেন সে শিখতে পারে নি ? পারে নি, তার কারণ সে সাধারণ নিয়মে শিখতে পারবে না, তার বুদ্ধি সেদিকে কম। অতএব যান্ত্রিক উপায়ে তাকে শেখাবার জন্য অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার।

এইতো গেল সম্পূর্ণ অক্ষমতার কথা। এখন আংশিক অক্ষমতার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। আংশিকভাবে অক্ষম শিশু কিছু কিছু লিখতে পড়তে পারে। সাধারণ কর্ম হতে উদ্ভূত শব্দ ও বাক্য সে শিখেছে, কিন্তু ভালভাবে শেখে নি। এখন শিশুর দ্বারা লিখিত একটি ভুল লেখাকে সংশোধন করে বড় বড় করে লিখে যদি শিশুকে দিয়ে বার বার পড়ানো ও লেখানো যায় তবে সে ভালভাবে পড়তে ও লিখতে শিখবে। অবশ্য সে কতটা শিখবে তা হবে তার বুদ্ধির ক্রম অনুযায়ী।

প্রথম শ্রেণীতে যে দু প্রকার অক্ষমতা দেখা যায় সে রকম অক্ষমতা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে দেখা যাবে না, তার কারণ শিশু প্রথম শ্রেণী হতে প্রমোশন পেয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে, অথবা সে যদি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই প্রথম ভর্তি হয়ে থাকে তবু ভর্তির সময় তাকে যাচাই করা হয়েছে, অতএব সে কিছু আয়ত্ত করেছে বলেই ধরে নেওয়া যায়। যে কোন কারণেই হোক, দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুর কিছুতেই সম্পূর্ণ অক্ষমতার ব্যাপার নয়। সে রকম তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদেরও সম্পূর্ণ অক্ষমতার ব্যাপার নয়। সবগুলোই আংশিক অক্ষমতার ব্যাপার। শিশু ভাল করে পড়তে পারে না, ঠেকে ঠেকে পড়ে, কিংবা স্পষ্ট করে লিখতে পারে না ইত্যাদি, কিন্তু পড়তে বা লিখতে অল্প হলেও সে পারে। এ অবস্থায় শিক্ষক শিশুকে সাধারণভাবে পড়তে বা লিখতে কি করে সাহায্য করতে পারেন তা আলোচনা করা যাচ্ছে।

শিশু কিছু কিছু সৃজনাত্মক কাজ বা শিল্পকাজ করেছে। এখন শ্রেণীর অন্যান্য শিশুদের মত পেছনে-পড়া শিশুকে কিছু সৃজনাত্মক লেখার কাজ দেওয়া যেতে পারে। শিশু নিজের খাতায় লিখবে। যা লিখবে তাতে হয়তো প্রচুর ভুল হয়েছে, কিংবা সে যদি সেটা পড়ে তখনও দেখা যাবে যে সে ভুল লেখা আরও ভুল করে পড়ছে। তা ছাড়া তাকে যদি অন্য কিছু থেকে পড়তে দেওয়া যায়, তবে তখনও দেখা যাবে সে পড়তে কয়েকরকম ভুল করছে যেমন—

(১) সম্পূর্ণ উল্টো।

(২) আংশিক উল্টো।

(৩) শব্দ ফেলে যাওয়া

(৪) থেমে থেমে পড়া

(৫) মৃদু গতিতে পড়া

শিশুর সৃজনাত্মক লেখার কথা বলা হয়েছে। শিশুর সৃজনাত্মক লেখা যদি ভাল করে দেখে শুদ্ধ করে পুনরায় আর একটি বড় কাগজে বড় বড় হরফে লিখে দেওয়া যায় এবং তাকে যদি শুদ্ধ পড়ার ধারা কিরূপ হবে তা নিজে পড়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সে বার বার পড়ে কতটা আয়ত্ত করবে দেখা যেতে পারে। অভিজ্ঞতা হতে দেখা গেছে শিশুর

(১) বাক্য-দৃষ্টি-সীমা বেড়েছে

(২) পড়ার গতি বেড়েছে

(৩) থেমে থেমে পড়া আর নেই

(৪) শব্দ ফেলে যাওয়ার অভ্যাস কমেছে বা সেরে গেছে

(৫) আংশিক উল্টো পড়ার অভ্যাস আর নেই

(৬) সম্পূর্ণ উল্টো পড়ার অভ্যাস আর নেই।

যা পঠিত হয়েছে তা শিশুর নিজেরই সৃজনাত্মক লেখা, অতএব বুঝতে পারার দিক থেকে কোন কিছু বলার নেই বা চিন্তার কারণ নেই। অতএব পড়ার সমস্ত দিক থেকে বলা যেতে পারে যে ঐ সৃজনাত্মক লেখাটুকু পড়ার দিক থেকে শিশুর কাছে এসে গিয়েছে। তাছাড়া এই জানা জিনিস যদি শিশুকে বারবার লিখতে দেওয়া হয় তাহলে তার হাতের লেখা ভাল হবে, একটা লেখার ধারা দেখা দেবে, আকার, দূরত্ব, হেলান, শ্রেণীবদ্ধতা, শব্দের ঘনত্ব ইত্যাদি ঠিক হবে, আর সব চেয়ে বড় কথা, লেখায় কোন ভুল থাকবে না। এরকমভাবে যদি শিশুকে দিয়ে আরও খানিকটা সৃজনাত্মক লেখা এরকম যান্ত্রিকভাবে লেখানোর বন্দোবস্ত করা যায় তবে পড়া ও লেখার যে যে দোষ-ত্রুটিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো ধীরে ধীরে তার বুদ্ধির মান অনুযায়ী চলে যাবে।

উপরে যাদের কথা আলোচনা করা হল তারা সকলেই বুদ্ধির সাধারণ মানের নীচে। কিন্তু যাদের বুদ্ধির মান উঁচু অথচ পড়তে চায় না বলে পিছিয়ে পড়ে আছে তাদের সম্বন্ধে কি করা হবে? তাদের বেলায় অনগ্রসরতার কারণ খুঁজতে হবে, কেন শিশু লেখা ও পড়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। পিতামাতা, গৃহ, আবেষ্টনী, শ্রেণীর শিক্ষক, বিষয়ের সঙ্গে বেমানান কোন স্মৃতি, প্রক্ষোভ, ভুল বদলানো, অসুস্থতা ইত্যাদি অনেক কারণেই শিশু লেখাপড়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে পারে। এ অবস্থায় শিক্ষক শিশুর বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কারণগুলি অনুসন্ধান করবেন এবং সেই কারণ শিশুর মন থেকে অপসারণ করবার চেষ্টা করবেন, তাহলে শিশুর লেখা ও পড়ার মন বসবে। এইসব প্রক্ষোভজনিত কারণ শিশুমনের সৃষ্টি। শিক্ষক সন্ধেহে সেগুলোর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারলে শিশুর পিছিয়ে পড়ে থাকার আর কোন ভয় থাকে না।

ফ্রান্সে শিক্ষাব্যবস্থা

[শ্রীদিলীপ কুমার বিশ্বাস]

শ্রীচরণেষু,

মাষ্টারমশাই, আজ ফ্রান্সের শিক্ষাব্যবস্থার কথা লিখিতেছি। ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধের ফলে ফ্রান্স যে আলসেস লোরেন হারাইয়াছিল, যাহা সে ১৯১৮ সালে ফিরিয়া পাইল, যাহা হিটলার ১৯৪০ সালে জোরপূর্বক দখল করিলেন এবং যাহা আবার ফ্রান্স ১৯৪৫ সালে ফিরিয়া পাইল, সেই আলসেস লোরেন হইতে কুমারী মেরী অক্টয়নেট উনটারাইনা নামে এক মহিলা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখাইতে ও ইংরাজীতে এম্. এ. পড়িতে আসিয়াছেন। সে দেশে চার বছর শিক্ষকতা করিয়াছেন; তাঁহার নিকট হইতে ফ্রান্সের শিক্ষাব্যবস্থার কথা শুনিয়া লিখিলাম। ১৮৭১ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত জার্মানীর দখলে থাকায় সেখানকার বেশি বয়সের লোক কিন্তু ফরাসী ভাষা জানেন না।

ফ্রান্সে স্কুলের বছর ১লা অক্টোবর হইতে আরম্ভ হয়; ১৪ই জুলাই শেষ হয়। আড়াই মাস গরমের বন্ধ। ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সকল প্রকার শিক্ষা অবৈতনিক; ১৫ বছর পর্যন্ত স্কুলে পড়া বাধ্যতামূলক। Bachelor degree পড়িবার জন্য কলেজে বেতন দিতে হয় মাত্র ৩,০০০ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ ৯ ডলারেরও কম। ইহা আজকালকার বাজারে বিনা বেতনে পড়িবার সমান। প্রতি পরিবারে প্রথম সন্তানের পর আর যতজন সন্তান হইবে তাহাদের জন্য মাসিক অল্প ভাতা দিবার ব্যবস্থা আছে। কারণ, ফ্রান্সে গত যুদ্ধ পর্যন্ত জন্মের হারের চাইতে মৃত্যুর হার বেশি ছিল। আমার মনে পড়ে, আত্মসমর্পণ করিয়া প্রেসিডেন্ট পেতাঁ ১৯৪০ সালের জুন মাসে বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্স বড় বেশি নগ্নীন হইয়া পড়িয়াছিল। পরলোকগত বিনয় সরকার মহাশয়ের লেখায় পড়িয়াছিলাম, প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিনি যখন এক জাহাজে ভ্রমণ করিতেছিলেন তখন অনেক ইউরোপীয় যাত্রী নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতেছিলেন যে ফরাসী জাতি বাঁচিয়া পড়িয়াছে, পতন অনিবার্য। যাক সে কথা। যে ভাতার কথা লিখিয়াছি, তাহা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত পড়িলেও পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি, স্কুল ছাড়িয়া কলেজের যে শিক্ষা তাহাকে প্রায় সব দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বলে। এদেশে অনেক কলেজকে স্কুল বলে। আমার যে কলেজে Master's Degree বা Doctor's Degree পড়িবার ব্যবস্থা থাকে, তাহার সর্বত্র তাহার নাম Graduate School এবং তাহা Bulletin বা Announcement-এর উপর ছাপানো থাকে।

স্কুলের শিক্ষা কিণ্ডারগার্টেন (Ecole Maternelle), প্রাথমিক (Ecole Primaire), ও মাধ্যমিক (Lycee) পর্যায়ে বিভক্ত।

কিণ্ডারগার্টেনে ২+ হইতে ৬, প্রাথমিকে ৬+ হইতে ১৫, এবং মাধ্যমিকে ১০+ হইতে ১৮ বছরের ছেলেমেয়েরা পড়ে। প্রাথমিক পর্যায় পড়িবার সময় ১০+ বয়সে একটা পরীক্ষা লওয়া হয়, তাহাতে যাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহাদিগকে হাইস্কুলে ভর্তি হইবার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। তখন টেকনিকাল স্কুলে

(Centre d'apprentissage) ভর্ত্তি হইয়া তিন হইতে পাঁচ বছর পর্য্যন্ত ছুতারের কাজ, হাতুড়ি পেটার কাজ, হিসাব নিকাশ রাখা, স্টেনোগ্রাফি ইত্যাদি কাজ শিখিতে পারা যায়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০+ বয়সে যে পরীক্ষা লওয়া হয় তাহাতে পাশ করিলে যাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহারা যেমন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (Lycee) ভর্ত্তি হয়, তেমনই যাহারা ঐ পরীক্ষায় উচ্চতর টেকনিকাল স্কুলে (College Technique) ভর্ত্তি হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হয় তাহারা ঐ বিদ্যেই তাহাতে ভর্ত্তি হইতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আট শ্রেণী এবং মাধ্যমিকে সাত শ্রেণী আছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়িবার সময় কিণ্ডারগার্টেন এবং প্রাথমিক পর্য্যায়ের নীচের শ্রেণীতে পড়াইবার উদ্দেশ্য থাকিলে ১৫+ বয়সে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। ঐ পরীক্ষায় পাশ করিলে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে (Ecole Normale) ভর্ত্তি হওয়া যায়; তবে পাঁচ বছর পড়িতে হয়। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া ভর্ত্তি হইতে পারিলে মাত্র দুই বছর পড়িতে হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পরীক্ষা আমাদের দেশের মতন। তবে প্রতি মাসে পরীক্ষা লওয়া হয়। বার্ষিক শেষ পরীক্ষায় ফেল করিলে পরবর্ত্তী ছুটির পর যখন স্কুল প্রথম খুলিবে তখন আবার সেই বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে; না পারিলে উপরের শ্রেণীতে উঠিতে পারিবে না। কোন ছাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় কি গ্রেড পাইবে তাহা পরীক্ষার পর শিক্ষকগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিবেন। আমাদের দেশের মতন নম্বর দেওয়ার প্রথা অধিকাংশ দেশেই নাই। ফ্রান্সে private tuition বলিতে গেলে নাই; এদেশে গান শিখাইবার জন্য তাহার প্রচলন আছে। কারণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গানশিক্ষা বাধ্যতামূলক। আবাল বৃদ্ধ বনিতা গান জানেন।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়া শেষ হইলে আমাদের দেশের মতই Public Examination আছে, পরীক্ষা নাকি বড়ই কঠিন। বছরে দুইবার পরীক্ষা লওয়া হয়; যাহারা ফেল করে, তাহারা ছয় মাস পরে আবার পরীক্ষা দিবার সুযোগ পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এই সব বাধ্যতামূলক বিষয় পড়ান হয়: ফরাসী ভাষা, অঙ্ক (Cosmology, Geometry, Algebra, Logarithm), জীববিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ও ব্যায়াম। গ্রীক, ল্যাটিন, জার্ম্মান, ইংরাজি, ইত্যাদি যে কোনও দুইটি বিদেশী ভাষা পড়িতে হইবে। ইহা ছাড়া রেখাঙ্কন, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত এবং 'হোম ইকনমিক্স' ইচ্ছাধীন বিষয়। জঁ ক্রীস্তফ্‌ এর নায়িকার মুখচোরা লাজুক ভাই কেন যে শুধু ফেল করিত, তাহা এতদিনে বুঝিলাম। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এক জায়গায় লিখিয়াছেন যে ইংলণ্ডে যে ছাত্র খেলাধূলায় পারদর্শী তাহার আদর, আর ফ্রান্সে যে ছাত্র পড়াশুনায় ভাল তাহার সম্মান। তিনি যেন একথা লিখিয়াছিলেন তাহা এখন বুঝিতেছি। ফ্রান্সে পদে পদে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা।

হাইস্কুলের পরীক্ষা শেষ করিয়া আইন (কমপক্ষে ৪ বছর), ডাক্তারি (৭ বছর), দাঁতের ডাক্তারি (৫ বছর) প্রভৃতি পড়া যায়। মাতৃভাষার মাধ্যমে সব পড়ান হয়।

হাই স্কুলে পড়াইবার জন্য Bachelor degree-র প্রয়োজন হয়। যিনি ইংরাজি পড়াইবেন তাঁহার জন্য Syllabus ও curriculum এক প্রকার, যিনি অঙ্ক পড়াইবেন তাঁহার জন্য আবার অন্য প্রকার; যিনি ইতিহাস পড়াইবেন তাঁহার জন্য অন্য প্রকার। কিন্তু প্রত্যেককেই মোট পাঁচটি পরীক্ষায় পাশ করিতে হইবে। তবে পরপরই পরীক্ষা দিয়া যে পাশ করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। একটা পরীক্ষা দিয়া পাশ করিয়া দু পাঁচ বছর দেরি করিয়া আবার পড়া আরম্ভ করা যায়; তাহাতে

প্রথম পার্টটা নষ্ট হয় না। এই একই নিয়ম আমেরিকায়ও প্রচলিত।

শিক্ষকতা বিষয়ে শিক্ষয়িত্রী মহোদয়া ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইংরাজি পড়াইবার জন্য Bachelor degree পাইয়াছেন। সেজন্য কি কি বিষয় পড়িতে হইয়াছে এবং কি কি পরীক্ষা দিয়াছেন তাহা লিখিতেছি। যেখানে মৌখিক পরীক্ষা তাহার উল্লেখ করিব।

১। সাহিত্য পরীক্ষা; লিখিত। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত:

(ক) ফরাসী সাহিত্য।

(খ) জার্মান হইতে ফরাসীতে অনুবাদ।

(খ) ফরাসী হইতে জার্মান ভাষায় অনুবাদ।

এই পরীক্ষার পর যে সব অনুবাদের পরীক্ষা থাকে তাহা ক্রমশ বেশ কঠিন।

২। ব্যবহারিক (Practical) পরীক্ষা; লিখিত ও মৌখিক।

(ক) ইংরাজি হইতে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ।

(খ) ইংরাজি ব্যতীত অন্য এক বিদেশী ভাষা ব্যাখ্যা করিয়া পরে তাহার ফরাসী ভাষায় অনুবাদ। সেই ভাষায় পরীক্ষকের সাথে কথাবার্তা বলিতে হইবে।

(গ) ইংলণ্ডের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আইন-কানুন, প্রতিষ্ঠান এবং উপনিবেশ সংক্রান্ত মৌখিক প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর।

(ঘ) ইংলণ্ড সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া পরীক্ষককে দিবার পর সেই বিষয়ে মৌখিক একটা বক্তৃতা।

৩। ভাষা তত্ত্ব: লিখিত ও মৌখিক।

(ক) ফরাসী হইতে ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ।

(খ) প্রাচীন বা মধ্যযুগের ইংরাজি বই হইতে ভাষার ব্যাকরণের মৌখিক ব্যাখ্যা।

(গ) ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন: যেমন, "Give the history of the development of the old English verb 'beon' (to be) from Indo-European to Middle English" "give mutation of vowel sounds or consonants."

৪। ইংরাজি সাহিত্য।

(ক) সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্ন; যেমন, The influence of renaissance pastoral on Shakespeare's Winter's Tale."

(খ) একখানা ইংরাজি বইয়ের মৌখিক ব্যাখ্যা ও তাহার মৌখিক ফরাসী অনুবাদ।

(গ) ইংরাজি সাহিত্য বিষয়ে মৌখিক প্রশ্ন।

৫। আমেরিকান সাহিত্য ও সভ্যতা।

(ক) আমেরিকার ইতিহাসে বা সাহিত্য বিষয়ে পরীক্ষা।

(খ) আমেরিকান সাহিত্য পুস্তক হইতে মৌখিক ব্যাখ্যা ও ইংরাজিতে তাহার লিখিত ব্যাখ্যা।

(গ) আমেরিকান সাহিত্য বিষয়ে মৌখিক প্রশ্ন ও তাহার উত্তর।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা। কারণ, দেশটা ক্যাথলিক প্রধান। পৃথিবীর প্রায় সব ক্যাথলিক দেশেই এই নিয়ম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ফ্রান্সের মেয়েরা ভোট দিতে পারিত না। ক্যাথলিক সম্প্রদায় অনেক বিষয়ে বিশেষ রক্ষণশীল। ফ্রান্স ১৭৬৩ সালের সন্ধিতে উত্তর আমেরিকা (কানাডা) হারাইল, তাহার প্রধান কারণ, আমেরিকায় ফরাসীদের চাইতে ইংরাজদের সংখ্যা বহুগুণ ছিল, যদিও বীর্যে ও কৌশলে ফরাসীরা ছিল শ্রেষ্ঠ। সংখ্যায় কম থাকিবার কারণ এই যে, চতুর্দশ দুই এক শত বছর আগেকার Edict of Nantes প্রত্যাহার করার জন্য কুশলী ও উদ্যমশীল প্রোটেস্টাণ্টগণ ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। যাহারা ফ্রান্সে থাকিয়া গেল তাহাদিগকে কোনও

উপনিবেশে যাইতে দেওয়া হইত না। অথচ, ১৬৩৮ সাল হইতে ফ্রান্স প্রায় সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ বা আভ্যন্তরিক গোলযোগে লিপ্ত ছিল; সেজন্য যথেষ্ট পরিমাণ ক্যাথলিক উপনিবেশিক পাওয়া যাইত না। স্পেনও প্রোটেস্টাণ্টদিগকে নিজের উপনিবেশে যাইতে দিত না। সংখ্যার কম থাকিবার জন্য করাসীরা বেড ইণ্ডিয়ান মেয়েদের বিবাহ করিত; কিন্তু ঐ বিবাহে যে সকল সন্তান জন্মিত তাহারা করাসীদিগের কোনও গুণ পাইত না। আমাদের দেশেও এরূপ হইয়াছে।

Bachelor degree যাহারা পাইয়াছেন তাঁহারা দুই বছর পরে Master's degree-র জন্য একটা thesis লিখিতে পারেন। Master's degreeর জন্য নাকি নির্দিষ্ট syllabus নাই। সাধারণত Doctorate না পাইলে কেহই কলেজে পড়াইতে পারে না।

উমটারাইনা মহোদয়া ঠিকানা দিয়া হাসিয়া কহিলেন যে, তিনি কুমারী থাকুন, বা সধবা হন, নীচের ঠিকানায় চিঠি দিলে সব সময় তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে:

Marie Antoinette Untereiner.
2610 Rue de Bale.
Mulhouse; Haut—Rhin
France.

———

চিঠি

প্রাপ্তের সম্পাদক মহাশয় (শিক্ষা)

আপনার ১৩৬০ সালের বৈশাখ সংখ্যা শিক্ষা পত্রিকায় শ্রীযুত শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার লিখিত "বাস্তু ও শিক্ষা" নামক প্রবন্ধটি পড়লাম। তাতে এক জায়গায় লেখা আছে,—"আমার অভিমত এই যে, যত ছেলে মিডল্ পরীক্ষা দেয়, তাহার এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্রের হাইস্কুলে প্রবেশাধিকার থাকে।"

"বাকি ছেলেদের যদি শিক্ষা দিতেই হয় তবে তাহাদের জন্য এরূপ প্রতিষ্ঠান খুলিতে হইবে যেখানে তাহারা শ্রমের কাজ শিখিতে পারে অর্থাৎ অধিক সংখ্যায় Post-Basic ও Technical Institutes খুলিতে হইবে। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে গ্রামের প্রয়োজনগুলিই আগে দেখিতে হইবে। প্রত্যেক স্কুলে অন্তত একজন আধুনিক কৃষিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকিবেন। যদিও এখানে প্রায় তিন চতুর্থাংশ সময় শ্রমের জন্যই ব্যয়িত হইবে। তথাপি যাহাতে ছেলেরা লেখাপড়া একেবারে ভুলিয়া না যায় সেজন্য কিছুকাল সাহিত্য, অঙ্ক, পত্র দলিলাদি লেখা, সংবাদপত্র পাঠ ও নাগরিক অধিকার প্রভৃতি শিখান হইবে। মিডল্ পরীক্ষায় বা হাইস্কুলের কোন ক্লাসের পরীক্ষায় একবার ফেল করিলে দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়বার ফেল করিলে তাহাদের এই সকল উত্তর বুনিয়াদী স্কুলে যাইতে হইবে।"

কথাটার মধ্যে কতখানি যুক্তিযুক্ততা রয়েছে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না কারণ, আমরা প্রায় ৩০।৩৫ জন ভাইবোন সুদূর বাংলা দেশ থেকে এই মধ্য প্রদেশের ওয়ার্ধায় Post-Basic এ পড়ছি। ম্যাট্রিকুলেশনে ফেল করে নয় বরং বুনিয়াদী পাশ করেই এখানে এসেছি। Pre-Basic, Basic, Post Basic এর পাঠক্রম রচনা ক্ষেত্রে ওয়ার্ধায় এসেও সুধীর বাবুর কথাটা আমরা কোথাও দেখলাম না। তিনি কি করে নিঃসংশয়ে এই কথাটা বলে দিলেন যে উত্তর বুনিয়াদী ম্যাট্রিকুলেশন ফেল ছাত্রদের বিদ্যাপীঠ? অবশ্য কথাটা ঘুরিয়েই ব্যবহার করা হয়েছে।

আমার মনে হয় তিনি অষ্টম অখিল ভারত বুনিয়াদী শিক্ষক সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জাকির হোসেনের বক্তব্যটা শোনেন নি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই বলেছেন যে, উত্তর বুনিয়াদীতে প্রবেশ করতে হলে তাকে বুনিয়াদী পাশ করতেই হবে নচেৎ তার জন্য উত্তর বুনিয়াদীর দ্বার রুদ্ধ, অতএব লেখক যে কথাটা রাষ্ট্রের সামনে রেখেছেন সে সম্বন্ধে আর কিছু অন্তত চিন্তা করলে ভাল হয়।

আর একটা কথা তিনি Post Basic ও Technical Institutes কে একই পর্যায়ে ফেলতে চেয়েছেন, কিন্তু তা কি সত্যই এক? উত্তর বুনিয়াদীতে কাজকর্ম হয় ঠিক কিন্তু সেটা কিসের মাধ্যমে? ইহার মাধ্যম স্বাবলম্বন। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য যত রকম এবং যত প্রকার কাজ করবার প্রয়োজন হবে সব রকমই চলবে। সুধীরবাবু যে বলেছেন, নিজের জীবিকা অর্জন, প্রকৃত পক্ষে বুনিয়াদী শিক্ষা তা নয়। বুনিয়াদী শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী সত্যিকারের সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী, এবং প্রকৃত নাগরিক হয়ে এখান থেকে বেরোবে।

জীবিকা অর্জন তো একটা সাধারণ কুলিও করে, ভিক্ষা করেও জীবিকা অর্জন করা যায়। ব্ল্যাক মার্কেটিকেও জীবিকা অর্জনের একটা পন্থা

হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মানবতার পর্যায়ে ফেললে সেটাকে আমরা জীবিকা অর্জন বলব না।

সেইজন্য আমার মনে হয় বুনিয়াদী শিক্ষা শুধু জীবিকা অর্জনের একটা সর্টকাট রাস্তা নয়। বুনিয়াদী শিক্ষা মনুষ্যত্ব অর্জনের দুর্গম সরণপথ।

বশংবদ

শ্রীস্ফটিকচন্দ্র কর্মকার

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

আমাদের লেখা। পাঠভবন পুস্তক প্রকাশ সমিতি, শান্তিনিকেতন। ১লা বৈশাখ, ১২৬০। মূল্য এক টাকা।

পাঁচ বৎসরেরও অধিক হইল 'আমাদের লেখা' বার্ষিকী রূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। বস্তুত ইহা শিশু ও কিশোর চিত্তের বিকাশের একটা পরিচয়। লেখার মধ্যে চিত্রকেও অবশ্য ধরিয়া লইতে হইবে। আলোচ্য পুস্তিকায় লেখা বা চিত্রের সংখ্যা তেরটি। হয়তো পূর্ব পূর্ব প্রকাশন অপেক্ষা লেখার মাত্রা একটু বেশি। ইহা অনুযোগ-অভিযোগের কথা নয়, বরং আনন্দেরই কথা যে, শিশুর অনুরাগ আমাদের শিক্ষাজগতের প্রাথমিক স্তরে বিস্তৃত হইতেছে।

'আমাদের লেখা' অবশ্য চয়ন, নির্বাচিত সংগ্রহ। কিন্তু এ লেখারও উৎকর্ষ দেখিয়া মনে হয়, যদি আমরা ভাল করিয়া পড়িতে পারি, তবে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নাই। আমাদের শক্তি লইয়া আমরা জগতের সামনে সোজা হইয়াই দাঁড়াইতে পারি।

পরিমাণের কথা বিচার করিলে মিটুনী রায়ের লেখা দেখিয়া স্থির করা যায়, পূর্বতন লেখা হইতে এখনকার লেখা পরিণতির দিকেই চলিয়াছে। সুপর্ণা সেনের 'বলাকা কাব্যের নাম' বিচারশক্তির ও কাব্যচর্চার পরিচয় দিতেছে। কল্পনা ও চিন্তা—এবং তাহাদের প্রকাশ ভঙ্গী—তিন দিক দিয়াই আমরা এই পুস্তিকা পড়িয়া আশান্বিত হইয়াছি।

শিক্ষা

ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি

১১শ বর্ষ | আশ্বিন ১৩৬০ | ১১শ সংখ্যা

আলোচনা

প্রাথমিক শিক্ষার নূতন পরিকল্পনা

মাদ্রাজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে ঢালিয়া সাজিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরাজাগোপাল আচারি এই বয়সেও দেশের কল্যাণ-চিন্তায় রত। তিনি দৃঢ় ভাবে বুঝিয়াছেন যে শিক্ষার একেবারে গোড়ার কথা না ভাবিলে, দেশের গ্রামাঞ্চলগুলির শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশের উপযোগী না করিলে আমাদের কল্যাণ নাই। শিক্ষার অন্নতন্ত্রিকনে দেশবাসীর চিত্তভূমিকে যদি সরস ও সজীব করিতে হয় তবে শিক্ষাবিধি তাহাদের গ্রহণ-যোগ্য করা প্রয়োজন, কেবল আপাতরমণীয় হইলে চলিবে না, যাহাতে পরিণামেও কল্যাণপ্রসূ হয় তাহাও দেখিতে হইবে। এদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি যে নূতন পরিকল্পনাটি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা ঐ প্রদেশের শিক্ষা-অধিকর্তা শিক্ষাব্রতীদের বিবেচনার জন্য সকলকে পাঠাইয়াছেন। আমরা 'শিক্ষা'র পাঠকদিগকে বিচার বিবেচনার জন্য নীচে তাহা সবিস্তরে দিলাম। এই পরিকল্পনা আমরাও কতদূর গ্রহণ করিতে পারি, তাহার বিচার আজ সময়োপযোগী। এই পরিকল্পনার জন্য অর্থ কি ভাবে সংগৃহীত হইবে তাহাও বিবেচ্য।

মাদ্রাজ সরকারের মতে, গ্রাম অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আগামী ১৯৫৩-৫৪ সনে পাঠক্রমের কিছু পরিবর্তন সাধন করার কথা হইয়াছে; উদ্দেশ্য, বাপমায়ের কাজের ধারার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যোগ অক্ষুণ্ণ রাখা। ইস্কুলে পড়ে বলিয়াই তাহারা যেন শরীরে মনে পৈতৃক বৃত্তির অনুপযুক্ত না হইয়া পড়ে—তাহাতে নিজেদেরও ক্ষতি, দেশেরও ক্ষতি। বিদ্যালয়ের কঠিন অনুশাসী দীর্ঘ সময় যাপন করা স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর। এই সময়ের পরিমাণ কম করিয়া সমাজ ও গ্রামের উন্নতিকর এবং ব্যবহারিক শিক্ষামূলক কাজের জন্য সময় দেওয়া দরকার। সমাজের কল্যাণকর কাজে বালক-বালিকাদেরও নির্দিষ্ট অংশ থাকা উচিত। এই পরিবর্তিত ব্যবস্থা সম্প্রতি বুনিয়াদী ভিন্ন অন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সম্বন্ধে অবলম্বন করা হইবে—বুনিয়াদী বিদ্যালয় তো এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছে।

ইস্কুলের সময় কম করিয়া দিনে তিন ঘণ্টা মোট ক্লাস হইবে। ছাত্রছাত্রীদের দুই দলে ভাগ করা হইবে, একদল মধ্যাহ্নে তিন ঘণ্টা, অপর দল অপরাহ্নে তিন ঘণ্টা ইস্কুলে পড়িবে। ছাত্রছাত্রীর ভীড়ের জন্য আজকাল যে দুই বেলা কাজের ব্যবস্থা করা হয়, ইহা কিন্তু তাহা হইতে পৃথক, এখানে একই শিক্ষক দুই বেলার ছেলেমেয়েদের পড়াইবেন।

এই পরিকল্পনায় দিনের অর্ধেকটা ছেলে-মেয়েদের যে অবকাশ থাকিবে, সে সময়টা তাহারা বাপমায়ের সঙ্গে তাঁহাদের সাধারণ কাজকর্মে সাহায্য করিবে, তা সে কাজ চাষেরই হউক, আর কামার ছুতারেরই হউক। এই নিয়মে মেয়েরা সাংসারিক কাজকর্ম মায়ের কাছেই শিখিতে পারিবে।

অবশ্য এমন অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে যাহাদের পিতামাতার এই ধরনের পৈতৃক বৃত্তি নাই, তাহাদের জন্য কোন বৃত্তি শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের পাঠের পর তাহাদের গ্রামের কোন শিল্পীর নিকট পাঠাইতে হইবে। সেখানে ঐ শিল্পীর কাছে তাহারা কাজ শিখিবে, অপর শিক্ষক বা পরিদর্শক দরকার হইবে না। ঐ শিল্পীই এই শিক্ষানবিশদের হাজিরা বই রাখিবে। সকলেই যে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে, তাহা নয়, তবে আসা যাওয়া করিতে করিতে, পরিবেশের প্রভাবে, আজ না হইলেও কাল তাহাদের ঐ বৃত্তি আয়ত্ত হইবে। এই শ্রেণীর বালক এক গ্রামে সম্ভবত পাঁচটি কি দশটির বেশি থাকিবে না। কাজেই এই ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়।

তবে যদি কোনও গ্রামে স্থানীয় কারিগর না থাকে, তবে উৎসাহ দিয়া বাহির হইতে লোক আনাইতে হইবে। ইস্কুলের কাছাকাছি তাহার বাসস্থানের জন্য জমি দেওয়া ও কাজের উপযোগী গৃহ নির্মাণের ব্যবস্থা করা দরকার। ইস্কুল বাড়ীতেই যদি জায়গা থাকে, তবে সেখানেই শিল্পীর থাকিবার জন্য ঘর তৈয়ারি করিয়া দেওয়া ভালো। ক্রমে ক্রমে গ্রামের উপযোগী একাধিক শিল্পের জন্য ঐ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আরেক রকম কাজের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহা হইল চাষবাস। এই কাজের জন্য কাছাকাছি কৃষকের সঙ্গে ব্যবস্থা করা দরকার। শিল্পের জন্য কারিগরের সঙ্গে যে ব্যবস্থা, এক্ষেত্রে কৃষকের সঙ্গেও সেই ব্যবস্থা চলিবে। হয়তো দেখা যাইবে, বৎসরের কয়েক মাস ছেলেদের চাষবাসের জন্য কৃষকের কাছে পাঠান সুবিধা, অপর সময়ে কারিগরের কাছে।

এই ভাবে কৃষিকার্য ও বৃত্তি শিক্ষার সঙ্গে ছেলেদের গ্রামের হিতকর কাজে নিয়োজিত করিতে হইবে। ইট পোড়ান, ঘর তোলা, জঙ্গল সাফ করা, কূয়া খোঁড়া, রাস্তা পরিষ্কার ও মেরামত করা ইত্যাদি কাজে তাহাদের উৎসাহিত করিতে হইবে। শিক্ষক যে পরিমাণে ছাত্রদের এই সকল সংগঠনের কাজে প্রেরণা দিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন, সেই পরিমাণে গ্রামের লোকের কাছে তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি পাইবে।

গ্রামের লোকের মধ্য হইতেই বাছিয়া একটি পরামর্শ কমিটি গঠন করিলে গ্রামের লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি হয় ও তাহাদের সহযোগিতা পাওয়া যায়।

বর্তমানে ছেলেমেয়েরা ৩৫ ঘণ্টা ইস্কুলে পড়ে। সেই স্থলে এই নূতন পরিকল্পনায় তাহারা ২০ থেকে ২৪ ঘণ্টা পড়িবে, কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, তাহাতে সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস ভূগোল, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কোনও বিষয়েই শিক্ষার মান নামিয়া যাইবে না, এই বিষয়গুলির জন্য বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী সময়ই দেওয়া চলিবে। কেবল প্রকৃতি-পাঠ, হাতের কাজ, ড্রয়িং, গান ইত্যাদি বিষয়গুলি বর্তমানে ইস্কুলে যে রকম অকেজো ভাবে শিক্ষা

দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পরিবর্তে বাস্তব পরিবেশে, জীবনের উপযোগী ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে।

পরলোকে প্রবীণ শিক্ষক

গত সেপ্টেম্বর মাসে বরিশাল জেলার গৈলাগ্রামের সুসন্তান বিপিন বিহারী গুপ্ত মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। পূর্বিয়া জেলার আয়ারিয়া গ্রাম ইঁহার কর্মস্থল ছিল। ইনি সাত-চল্লিশ বৎসর কাল শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, এবং নিজের বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্র বলে প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন। শিক্ষকতার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও অনেক বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। বিপুলবর্ম সুন্দর ভাল করিতেন এবং নিজের হাতে বাগান করিতেন ও তাহাতে কৃতিত্বও দেখাইতেন। বিপিনবাবু কখনও বসিয়া থাকিতেন না। ছাত্রদের হাতের লেখার দিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইঁহার শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে কখনও নিজে কিছু করিতেন না, ছাত্রের পাশে বসিয়া দেখাইয়া দিতেন, তাহাকে দিয়াই করাইয়া লইতেন। বিপিনবাবুর আর একটি গুণ ছিল। ইংরেজী অঙ্ক ইতিহাস ভূগোল সবই পড়াইতে পারিতেন, এবং ছাত্রেরাও যাহাতে সব বিষয়ে পাকা হইয়া ওঠে, তাহার জন্য যত্ন করিতেন। ছাত্রদের বুদ্ধির স্বল্পতা বা বিনয়ের অভাব, কিছুতেই তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিত না। তিনি বলিতেন, শিক্ষকের মেজাজ বিগড়াইলে তিনি আর শিক্ষা দিতে পারেন না। হিন্দী তাঁহার মাতৃভাষা ছিল না, তথাপি বিহারে হিন্দী প্রবর্তনের প্রবল প্রবাহ এবং প্রধান-শিক্ষককে হিন্দী ভাষাভাষী করিবার তাগিদ তাঁহাকে বিহারের এক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ হইতে চ্যুত করিতে পারে নাই।

এরূপ শিক্ষকের অভাব সহজে পূরণ হইবার নয়। ইঁহাদের ছাত্রমণ্ডলী বহুদিন পর্যন্ত ইঁহাদের স্মৃতিকে মনের মধ্যে পুষ্ট করিয়া রাখিবে, সন্দেহ নাই। সমগ্র দেশেরও এরূপ শিক্ষকের জীবনকথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা কর্তব্য।

শারদীয় উৎসব

শারদীয় উৎসব সমাগতপ্রায়; আমাদের লেখক, গ্রাহক, পাঠক এবং অনুগ্রাহকবর্গকে উৎসবের যথাযোগ্য সম্ভাষণ এবং শুভকামনা জানাইতেছি।

প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার আদর্শ

[ডক্টর রমা চৌধুরী (অধ্যক্ষ, লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজ)]

স্বাধীন ভারতে যে সমস্যা আজ আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুতর রূপে দেখা দিয়েছে, তা হল শিক্ষা-সমস্যা। পুনরায়, এই শিক্ষা-সমস্যা আলোচনাকালে, নারী শিক্ষার কথাই উত্থাপিত হচ্ছে সর্বপ্রথম, কারণ আজও আমাদের মেয়েরা শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় বহু পশ্চাতেই পড়ে রয়েছেন। বস্তুতঃ নারী শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ বা রূপটি কি হওয়া উচিত—সে সম্বন্ধেও আমরা আজ পর্যন্ত একটি স্থির, সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারিনি—সে আদর্শকে কাজে পরিণত করা তো দূরে থাকুক। একদল বলেন যে, শিক্ষার উদার, সার্বজনীন ক্ষেত্রে স্ত্রী পুরুষের ভেদের প্রশ্ন উত্থাপন করাই অনুচিত, কারণ শিক্ষা হল মনের জিনিস, সংস্কৃতির পরিপোষক, এবং দৈহিক দিক থেকে

বিভিন্ন হলেও মনের দিক থেকে নরনারী একই স্বতাধারায়। অতএব বলেন যে, দৈহিক দিক থেকে বিভিন্ন বলে মেয়েদের জননীরূপে পরিবারে যে বিশেষ কার্যে রত হতে হয় তার উপযুক্ত শিক্ষা তাঁদের প্রথম থেকেই অত্যাবশ্যক ; সেজন্য স্ত্রীপুরুষের শিক্ষা বিভিন্ন ধারানুযায়ী হওয়াই কর্তব্য।

এই মূলীভূত সমস্যা সমাধানকালে, আমাদের প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার কি আদর্শ ছিল, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ, নারী-প্রগতির সেই উন্নততম যুগের লক্ষ্য ও পন্থা আজও কালোপযোগীভাবে অনুসৃত হলে জাতির মঙ্গল সুনিশ্চিত। পূর্ব অভ্যাসানুযায়ী প্রগতিশীল পশ্চিমের নিকট ভিক্ষাপাত্র হস্তে দণ্ডায়মান হবার পূর্বে আমাদেরই অতি নিকট বস্তুভাণ্ডারে কি অমূল্য নিধি না অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের দিন আজ এসেছে।

প্রাচীনযুগে শিক্ষাক্ষেত্রে স্ত্রীপুরুষে কোনরূপ প্রভেদ করা হত না। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধিকার ছিল উভয়েরই সমান ; এবং উপনয়ন সংস্কার বেদাধ্যয়নের অত্যাবশ্যক পূর্ববর্তী অঙ্গ বলে, পুরুষদের মত মেয়েরাও উপনয়নে পূর্ণ অধিকারিণী ছিলেন। এমন কি, ছাত্রদের মত ছাত্রীরাও গুরুগৃহে বাস করে, মৃগচর্ম ও জটাধারণ, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন প্রমুখ ব্রহ্মচর্য বা শিক্ষাবস্থার বাহ্যিক চিহ্নগ্রহণ ও আচার পরিপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। কালক্রমে অবশ্য এই প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়, এবং কন্যা পিতৃগৃহেই শিক্ষালাভ করেন। দুঃখের বিষয় পরবর্তী স্মৃতির যুগে পিতৃগৃহে শিক্ষালাভের এই সুযোগও নারীদের পক্ষে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রাচীন ভারতের অপর একটি সুবুদ্ধিপ্রসূত প্রথাও আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। সেটি হল এই যে, সেযুগে বিবাহ বা সংসার ধর্ম পালন নারীদের পক্ষেও বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক বলে পরিগণিত হতনা। পুরুষদের ক্ষেত্রে যেমন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ তাঁদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করত এবং যেমন তাঁরা ইচ্ছানুসারে আজন্ম ব্রহ্মচারীর জীবনযাপনও করতে পারতেন, নারীরাও ঠিক তেমনিই পারতেন অনায়াসে, সসম্মানে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতির একটী বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বিভিন্ন ব্যক্তির শক্তি ও আকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ব্যবস্থার বিধান করা হত সর্বাগ্রে। সেজন্য সুবিখ্যাত স্মৃতিকার যাজ্ঞবল্ক্য প্রাচীন যুগের পুণ্যশ্লোক ঋষিদের মতানুসারে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন—

"দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ঃ ব্রহ্মবাদিন্যো সদ্যোবধূশ্চ।"

নারীরা দুই শ্রেণীর : ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ। ব্রহ্মবাদিনীগণ শিক্ষালাভের পরে তপস্বিনী জীবন বরণ করেন ; সদ্যোবধূগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রমের পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করেন।

প্রাচীন ভারতের শিক্ষণীয় বিষয় বা পাঠ্য-তালিকার মধ্যেও আমরা এই উদার মনোভাব ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় লাভ করি। স্ত্রীপুরুষের পাঠ্যতালিকা ছিল একই। বিশেষ করে, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে, নারীরাও শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ সমন্বিত ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়নে ছিলেন পূর্ণ অধিকারিণী। মুণ্ডক উপনিষদে অবশ্য পাঠ্য চতুর্বেদের জ্ঞানকে "অপরা বিদ্যা" এবং অক্ষর বিদ্যা বা আত্মজ্ঞানকে "পরা বিদ্যা" বলে অভিহিত করা হয়েছে। সন্দেহের অবকাশ নেই যে পুরুষদের মত মেয়েরাও পরা ও অপরা উভয় প্রকার বিদ্যা-লাভের সমান সুযোগসুবিধা লাভ করতেন।

সেযুগে নানাবিধ জাগতিক বিদ্যালাভের সুযোগও ছিল মেয়েদের প্রচুর। কথা, সাহিত্য-চর্চায় তাঁরা উৎসাহ পেতেন সর্বদিক থেকেই ; এবং সেজন্য প্রাচীনতম ঋগ্বেদের সাতাশজন নারীঋষি থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগের অগণ্য নারী কবি ও গ্রন্থপ্রণেত্রীদের গৌরবময় দানে সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ। নৃত্য, গীত ও বাদ্যও ছিল নারীদের অতি প্রিয়

শিক্ষণীয় বিষয়। শ্রৌতসূত্রাদিতে নারীদের যাগ-যজ্ঞের সুদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। এই সব কঠিন যজ্ঞ তাঁরা অতি নিপুণভাবে যাজনাতেন। সে যুগের আরেকটি প্রশংসনীয়, উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা ছিল নারীদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষাব্যবস্থা। বর্তমানে পাশ্চাত্য জগতেও এরূপ ব্যবস্থা নেই। বস্তুত, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত বাৎস্যায়নের সুবিখ্যাত "কামসূত্রে" উল্লিখিত নারীদের অবশ্য শিক্ষণীয় চৌষট্টি কলা প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট সাক্ষিরূপে বিরাজ করছে।

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই পূর্ণ প্রতীয়মান হবে যে, প্রাচীন ভারতে নারীদের কেবলমাত্র নারীত্বের অজুহাতেই সাধারণ শিক্ষার কোনো অংশ থেকে বঞ্চিত করা হত না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, বর্তমান বিজ্ঞানের যুগেও, ব্যক্তি স্বাধীনতার যুগে, সাম্যবাদের যুগেও আমাদের দেশে আজ ছাত্রছাত্রীদের পাঠক্রম বিদ্যালয়ে পর্যন্ত বিভিন্ন করা হয়েছে। যেমন মেয়েদের পক্ষে অঙ্ক ও বিভিন্ন বিজ্ঞান ঐচ্ছিক করে দিয়ে সেস্থলে শিশুপালন বিদ্যা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান আবশ্যিক করা হোক—এমন কথাও, এমন কি মেয়েরা নিজেরাও কেউ কেউ বলেছেন—যেন ভবিষ্য মাতাদের কেবল মেয়ে বলেই অঙ্ক ও বিজ্ঞানের প্রয়োজন নেই। নারী অবশ্য চিরদিনই নারী—পুরুষ নয়, পুরুষের সঙ্গে অর্থহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হবার ইচ্ছা বা প্রয়োজনও তার নেই; স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে পরিবার পরিচালনা ও শিশুপালন যে তারই বিশেষ ধর্ম-তাও স্বীকার্য, কিন্তু সেজন্য শিক্ষাদীক্ষার সার্বজনীন ক্ষেত্রেও যে তাকে শিশুকাল থেকেই পদে পদে স্মরণ করান হবে যে, সে 'নারী' এবং সেজন্য সাধারণ শিক্ষায় পরিপূর্ণ অধিকারিণী নয়—সেও আমাদের মনে হয় অন্যায্য কথা। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে নারীর প্রকৃত পরিচয় কেবলমাত্র "নারী" রূপেই নয়, কিন্তু প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ "মানুষ" রূপেই। শিক্ষার্থিনী, জ্ঞানবিজ্ঞানলাভেচ্ছুকা রূপেই শিশুপালন, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে মেয়েদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সন্দেহ নেই। কিন্তু সেজন্য অন্যান্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্র তাদের পক্ষে সঙ্কুচিত করা অন্যায় অন্যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস। সম্ভব হলে, সাধারণ এবং নারীজনোচিত উভয় বিদ্যাতেই নারীরা পারদর্শিনী হোক্—এ সকলেরই কাম্য। কিন্তু তা সম্ভবপর না হলে, বরং তাকে সাধারণ বিদ্যার্জনেরই সুযোগ প্রদান করা কর্তব্য এই আমাদের অভিমত। কারণ, যাই বলা হোক্ না কেন, শিশুপালন, সেবাশুশ্রূষা, রান্না, সেলাই প্রভৃতি অঙ্ক, বিজ্ঞান প্রভৃতির মত বিদ্যালয়ে শিক্ষণীয় বিষয় নয়; বরং এই সব দিকে নৈপুণ্য সহজাত শক্তি ও প্রবৃত্তিরই ফল। আমাদের প্রত্যেক মাতাময়ী, পিতাময়ী প্রভৃতি এই কথারই প্রোজ্জ্বল সাক্ষিস্বরূপা। তাছাড়া, অন্যান্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি থেকেও ঐসব বিষয়ের সঙ্গেই সাধারণ জ্ঞান আহরণ করা যায়। সেজন্য এই সব নারীজনোচিত বিদ্যার উপর অনাবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করে সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্র নারীদের পক্ষে সঙ্কুচিত করলে নারী প্রগতির দিক থেকে তা বাধাস্বরূপই হবে মাত্র, সন্দেহ নেই। সমাজপতিরা অবশ্য মেয়েদের অনেক আদর করে বলেছেন: "গৃহলিঙ্গয়-কোকিলাঃ।" কিন্তু আজ তারা যখন গার্হস্থ্যজীবনকে অবহেলা না করেও বাইরের বৃহত্তর জীবনের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, তখন তাদের গান কেবল গৃহলিঙ্গয়েই আবদ্ধ হয়ে থাকলে চলবে না, সমস্ত জগৎকেও তা আজ মোহিত, অনুপ্রাণিত করবে। এই সার্বজনীন শিক্ষার দাবীই মেয়েরা আজ করছে।

———

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন পাঠন

[সুমন বাৎস্যায়ন]

তক্ষশিলার পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ই ভারতের প্রাচীনতম আন্তর্রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। আর্যরা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে ভারতে এসেছিলেন। এজন্য সর্বপ্রথম ও সকলের চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলা ঐদিকেই স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মগধের স্থানই ছিল সবার ওপরে। সেজন্য স্বভাবতই মগধে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এক আন্তর্রাষ্ট্রীয় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কবে, কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সঠিক বলা আজ শক্ত। কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি একশ বছরের মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল, এ অনুমানে কোন ভুল নেই। ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং অনেকবার নালন্দার আশে-পাশে আম্রবনে থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ধর্মোপদেশ দিয়েছেন। তাঁর অন্যতম প্রধান শিষ্য সারিপুত্র এই নালন্দারই কাছে নালক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেখা যায় যে বুদ্ধের সময়েই নালন্দাকে একটি বিশেষ স্থান বলে গণ্য করা হত।

ইতিহাসবিদ তারানাথের মতে সম্রাট অশোক সর্ব প্রথমে ওখানে একটি সংঘারাম বা ভিক্ষুনিবাস নির্মান করেন। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙের মতে মগধসম্রাট শক্রাদিত্য (প্রথমে কুমার-গুপ্ত) একটি এবং তাঁর ছেলে তথাগত গুপ্ত সেখানে আর দুটি সংঘারাম নির্মান করান। বালাদিত্য উত্তর পূর্ব দিকে আরেকটি সংঘারাম তৈরি করিয়ে দেন। সপ্তম শতাব্দীতে সম্রাট হর্ষবর্ধন এখানে অনেক বাড়ী তৈরি করিয়ে দেন আর বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চলার একটা ব্যবস্থা করে দেন। পাল রাজবংশের সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম উন্নতি সাধিত হয়। দেশ দেশান্তরে এর কীর্তি ছড়িয়ে পড়ে। সারা এশিয়া থেকে বিদ্যার্থীরা পড়ার জন্য এখানে আসতে থাকেন। ভারতের শাসক নন এমন অনেক দেশের রাজারা নালন্দায় আপন আপন দেশের তরফ থেকে সংঘারাম আর বিহার নির্মান করেন। নালন্দায় পাওয়া এক তাম্রলিপি থেকে দেখা যায় যে নবম শতাব্দীর মাঝামাঝি সুবর্ণদ্বীপের (জাভা-ইন্দোনেশিয়া) রাজা সমরাগ্রবীরের ছেলে বালপুত্রদেব নালন্দাবাসী শুদ্ধবুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবান বুদ্ধের ভক্ত হন। আর বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত জাগতিক সম্পত্তির নশ্বরতা হৃদয়ঙ্গম করে নিজে বিস্তর অর্থ দিয়ে নালন্দায় এক বিশাল বিহার নির্মাণ করিয়ে দেন।

পৃথিবীর অন্য অনেক প্রাচীন বিদ্যালয়ের মত নালন্দায়ও বিকাশ হয়েছিল ধর্ম সংস্থার আদর্শে।

কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষণসংস্থাগুলির মত নালন্দায় এমন কঠোরতা ছিল না। বাস্তবিক দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান-গুলিই এক হিসাবে সার্বজনীন শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম আলোচনা করলেই এই মতের সত্যতা বোঝা যাবে। নালন্দায় যার সম্প্রদায় বা শ্রেণী নির্বিশেষে সকল যোগ্য শিক্ষার্থীর জন্য খোলা ছিল। গৃহী ও সন্ন্যাসী দুই রকম ছাত্র ছিল। ইৎসিংয়ের মতে, 'পরে সন্ন্যাসী হয়ে যাব' এই বাসনা নিয়েও অনেক শুভ্রবস্ত্র-পরিহিত গৃহী বিদ্যার্থী ভিক্ষুদের কাছে পড়তে আসতেন। আবার এমন ছাত্রও আসতেন যাঁরা শুধু

লৌকিক সাহিত্য পড়তে চাইতেন, সংসার ত্যাগ করার কোন অভিপ্রায় তাঁদের থাকত না।

এই উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধার্মিক আর লৌকিক দুই রকম শিক্ষারই সমুচিত ব্যবস্থা ছিল। গৃহস্থ আর ভিক্ষু দুই রকম ছাত্রই সেখানে ছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। এজন্য এখানে প্রবেশার্থীর পক্ষে সংস্কৃত ভাষা জানা অত্যাবশ্যক ছিল। ব্যাকরণকে 'শব্দ-বিদ্যা' বলা হয়েছে। শব্দবিদ্যায় পারদর্শী না হলে সংস্কৃত ভাষার পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব বলে মনে করা হয়। এজন্য ব্যাকরণের ওপর স্বভাবতই বেশি জোর দেওয়া হতো। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে আঠারো বিদ্যা শেখানো হতো তা হচ্ছে, বেদ (ঋক, যজুঃ, আর সাম), স্মৃতি, ব্যাকরণ, ছন্দো-বিচিতি, নিরুক্ত, জ্যোতিষ, শিক্ষা, মোক্ষজ্ঞান, ক্রিয়াবিধি, ধনুর্বেদ, হস্তিশিক্ষা, কাম-তন্ত্র, লক্ষণ, পুরাণ, ইতিহাস, নীতি, তর্ক আর বৈদক।

এদের কোন কোনটি যেমন ধরুন ধনুর্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা—এসব কখনো সকলের জন্য ছিল না। সরাসরি নিয়মে ক্ষত্রিয় বিদ্যার্থী ধনুর্বিদ্যা শিখতো। কেউ যদি আয়ুর্বেদ বা অপর কোন বিশেষ বিদ্যা শিখতে চাইতো তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তাও শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। হুয়েন সাং এক জায়গায় বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল হতে চাইলে প্রাচীন আর অর্বাচীন গ্রন্থসকলের গভীর অধ্যয়ন আবশ্যক। এখানে প্রাচীন বলতে স্পষ্টই বোঝায় বেদ বেদাঙ্গ সাংখ্য ন্যায় আর অর্বাচীন বা নবীন বলতে বোঝাচ্ছে বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রভৃতিকে। ইৎ সিং এক জায়গায় বলেছেন, বিদ্যার্থী বিনয়, সূত্র, আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁর কথা থেকেও প্রাচীন আর অর্বাচীন দুইয়ের কথা প্রমাণিত হয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। ছোট বড় বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে তবে ছাত্র ওখানে যেত। কিন্তু তাতেও পরীক্ষা না করে তাকে নেওয়া হতো না। প্রকৃতপক্ষে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়েরও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নালন্দায় অধ্যয়ন না করলে তখনকার দিনে জ্ঞান অসম্পূর্ণ মনে করা হতো। দেশের বিভিন্ন নগর থেকে পণ্ডিতেরা আপন সন্দেহ নিরসনের জন্য যেতেন নালন্দায়। এখানকার খ্যাতজনের যশ দেখতে দেখতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এ জন্যই কোন কোন দূত লোকে নালন্দার নাম জাল করে প্রচার করেছে, এমনও প্রমাণ আছে।

দেশ বিদেশে নালন্দার নাম ছড়িয়ে পড়ার ফলে হাজার হাজার ছাত্র এখানে প্রবেশের জন্য আসতো। এজন্য প্রবেশ-পরীক্ষা বেশ শক্ত আর একটু বিচিত্র রকমের ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে দ্বার-পণ্ডিত থাকতেন। ইনি প্রবেশার্থীকে গুটিকয়েক কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। কেউ কেউ সেসব কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম হয়ে ওখান থেকেই ফিরে যেত। নবাগত ছাত্রকে শাস্ত্রার্থ দিয়ে আপন আপন যোগ্যতার পরিচয় দিতে হতো। দশজনের মধ্যে সাত আট জন এই পরীক্ষায় উৎরে যেত।

যতদূর জানা যায়, নালন্দায় পড়ানোর তিনটি পদ্ধতি ছিল। প্রথম, ছাত্রকে মৌখিক বা বই থেকে অর্থ আর ব্যাখ্যাসহ পাঠ দেওয়া হতো। বিদ্যার্থী পাঠটি অভ্যাস করে অধ্যাপককে শোনাতো, আর অধ্যাপক যে প্রশ্ন করতেন তার জবাব দিত। দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল, ব্যাখ্যান বা লেক্‌চার দেওয়া। এক বিষয়ের ছাত্ররা সবাই এক জায়গায় এসে জড়ো হতো, আর বিদ্বান অধ্যাপক ঐ বিষয়ের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা করতেন। ব্যাখ্যানের পর ছাত্র অধ্যাপকের কাছে নিজের প্রশ্ন ও সন্দেহের সমাধান করে নিত। তৃতীয় আর সব চেয়ে প্রিয় পদ্ধতি ছিল শাস্ত্রার্থ। হুয়েন সাং আর ইৎসিং এই শেষের পদ্ধতির খুব প্রশংসা করে গিয়েছেন।

হুয়েন সানের মতে, "নালন্দায় কয়েক হাজার প্রতিভাবান বড় পণ্ডিত ভিক্ষু থাকতেন—তাঁদের মধ্যে কয়েক শতের খ্যাতি তো দূর দূরান্তরে বিস্তৃত হয়েছিল। তাঁদের চরিত্র ছিল নির্মল, নিষ্কলঙ্ক। ভারতবর্ষ ইঁহাদের সম্মান করে, অনুসরণ করে। গভীর সব বিষয়ের প্রশ্নের জিজ্ঞাসা ও তাদের উত্তর দেবার পক্ষে দিনের বেলা যথেষ্ট সময় পাওয়া যেত না। সকাল থেকে আরম্ভ করে রাত্রি পর্যন্ত শাস্ত্র ব্যাখ্যা চলতো।" বাস্তবিক শাস্ত্রব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে জটিল বিষয়ের সমাধান যেন সহজ হয়ে যায়। আজকাল তো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অত উঁচু পর্যন্ত পৌঁছনো সম্ভবই নয়। পরিস্থিতিও বদলেছে। কিন্তু বিতর্ক সভা আজকালও হয়। "আমাদের বর্তমান স্কুল কলেজের ছাত্রদের চেয়ে নালন্দা, বিক্রমশিলা আর বলভী বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা প্রবেশ করতে চাইতো তাদের অনেক বেশি শিক্ষিত হতে হতো।"

শাস্ত্রব্যাখ্যার প্রতি খুবই গুরুত্ব দেওয়া হতো, কিন্তু নিয়মিত পাঠ অভ্যাস আর ব্যাখ্যানেরও মূল্য কম ছিল না। হুয়েন সান আচার্য শীলভদ্রের কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। আচার্য জয়সেনের কাছেও অনেক অনেক গ্রন্থ পড়েছিলেন। নালন্দার সমগ্র আবহাওয়া থেকে বেশ বোঝা যায় যে প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াবারও সেখানে উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। "বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং প্রবেশিকা পরীক্ষার পরিচালনা করতেন। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই ঐ দ্বারপণ্ডিতের নিয়োগ।"

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার অবস্থা বেশ ভাল ছিল। তখনকার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা থেকেই এর পরিচয় পাওয়া যায়। আগেকার বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির মধ্যে তক্ষশিলার উল্লেখই সব চেয়ে বেশি। জাতকের গল্পে আর অন্যকথায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা অসংখ্য বার উল্লেখ করা আছে। যদিও নালন্দার মত এটি হয়তো সুপরিচিত ছিল না, তবু এখানেও এক এক আচার্যের কাছে পাঁচ পাঁচ শ' ছাত্র পড়তো। ফাহিয়ানের যাত্রা বিবরণীতে দেখি, "পাটলিপুত্রে হীনযান সম্প্রদায়েরও এক বিহার আছে, যেখানে অন্তত ছয় সাত শ' ভিক্ষু থাকে। তাদের মধ্যে সারা পৃথিবীর লোক দেখা যায়। শ্রমণ আর ব্রাহ্মণ যে কেউ অধ্যয়ন করতে চায়, এখানে এসে মিলিত হয়। এখানকার এক ব্রাহ্মণ অধ্যাপকের নাম মঞ্জুশ্রী।" নালন্দা থেকে তিন যোজন পশ্চিমে তিলাড়ক সংঘারাম। তার চারটি খুব বড় বড় প্রকোষ্ঠ। রাজা বিম্বিসারের শেষ বংশধর এটি নির্মান করেন। দেশ দেশান্তর থেকে বহু বড় বড় পণ্ডিত এখানে এসে মিলিত হন। এক হাজার ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন অধ্যাপনা করেন। হুয়েন সানের জীবনী-লেখক শ্রমণ লীর মতে নালন্দার আবাসিক ও নবাগন্তুক ছাত্রের সংখ্যা সর্বদাই হাজার দশেক থাকতো।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিপুল ছাত্রসংখ্যা থেকেই সেখানকার অধ্যাপকের সংখ্যা আর যোগ্যতা সহজে অনুমান করা যায়। নালন্দার আন্দাজ ১৫০০ অধ্যাপক ছিলেন। এঁদের আবার তিনটি শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীতে খালি দশজন বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন। এঁরা পঞ্চাশ রকম সূত্র ও বহু শাস্ত্রগ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে শত শত এমন পণ্ডিত ছিলেন যাঁদের খ্যাতি দেশে দেশে বিস্তৃত ছিল। জিনমিত্র, চন্দ্রপাল, জ্ঞানচন্দ্র, স্থিরমতি, প্রভাকরমিত্র, ধর্মপাল, গুণসেন, নাগার্জুন, জ্ঞানমিত্র, শীলভদ্র প্রভৃতি অধ্যাপককে তো আজও পর্যন্ত প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা হয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারও ছিল অতি বিপুল। রত্নসাগর, রত্নোদধি, আর রত্নরঞ্জ নামে গ্রন্থাগারের তিনটি ভাগ ছিল। এই পুস্তকালয়ে বৈদিক সাহিত্য থেকে আরম্ভ করে তন্ত্রযান পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থ সংগৃহীত ছিল। দেশ-বিদেশের ছাত্রদল অধ্যয়নের জন্য অথবা পুথি নকল

করে নিজের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্ত এখানে এসে জুটতো। যদ্য এশিয়া, তিব্বত, চীন দেশে এখান থেকেই নকল করে নিয়ে যাওয়া হাজার হাজার সংস্কৃত গ্রন্থ এখনো দেখা যায়।

ভারতীয় সংস্কৃতি আর জ্ঞানের প্রদীপে নালন্দার জ্ঞানের যে আলোকস্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল তার জ্যোতি সেই সময় সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েছিল। নালন্দাকে বাদ দিলে ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস নিতান্তই ছোট হয়ে দাঁড়ায়। পাঠক শুনে সুখী হবেন যে বিহারের রাজ্য সরকার নালন্দার দিকে নজর দিয়েছেন আর ওখানে নালন্দা-পালি-ইন্‌স্টিটিউট নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছেন। আশা আছে, অদূর ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি এক আন্তর্জাতিক সংস্থা রূপে গড়ে উঠবে।

[নয়া ভারত থেকে—অনুবাদ]

শিক্ষকের দায়িত্ব

[শ্রীবকুলমালা সেন]

শিশুরা প্রায় জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই "সর্বদা সত্য কথা বলিবে," এই মূল্যবান উপদেশটি শুনিতে সুরু করে। কিন্তু তাহাদের অন্তঃকরণে ইহার প্রভাব যে ব্যাপকভাবে কার্যকর হইয়া উঠে, তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পরবর্তীকালে পাওয়া যায় না। অবিরাম উপদেশের ধারা বর্ষণের পর যখন দেখা যায় তাহাদের চিত্ত-ক্ষেত্র যে শস্তে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা সত্য নয়—মিথ্যা, তখন বিদ্যুৎ-চমকের মত একবার মনে হয় গোলমালটি ঘটিয়া গিয়াছে হয় তো বীজ বপনকালে। কিন্তু মূলের ভুল সংশোধনের উপায় পরবর্তীকালে প্রায় থাকে না বলিয়াই তখন আমরা উপদেশের ধারা বন্ধ করিয়া শাসন-তর্জনের কটিকা তুলি। নানা দৃষ্টান্তের স্থরধারে—এবার আর সত্য প্রতিষ্ঠা নয়, মিথ্যা উৎপাটনেই প্রয়াস পাই। শিক্ষকের দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া হয় তো বা সাদৃশ্য বশতই এই একান্ত সাধারণ কথাটি মনে পড়িয়াছে। জাতি গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব যে কত বেশি, এ বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু বিমুগ্ধ শিশুচিত্তের মতই ইহা আমাদের মর্ম স্পর্শ করে না বলিয়াই যেন মনে হয়। চেতনা-উদ্বোধক সারগর্ভ বচনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু পুথির শোভাই বর্ধন করিতেছে দেখিয়া সহসা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি সজাগ হইয়া উঠে। মনে হয়—সার সংযোগে ক্ষেত্র উর্বর করিবে যে—সেই শিক্ষক কৈ? কিন্তু ঠগ্ বাছিতে গাঁ উজাড় হইয়া গেলে গ্রামের অস্তিত্বই লোপ পায়।

'নিশির ডাকে' মানুষ অনেক কিছু করে সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায়। তখনকার কার্যকলাপ দেখিয়া অপর কাহারও পক্ষে বুঝিতে পারা সম্ভব নহে যে সে কাজগুলি স্বভাবচালিত নয়। একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া জনৈকা শিক্ষিকা কয়েকটি বিষয়ে এইরূপ 'নিশির ডাকের' প্রভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, নিম্নোদ্ধৃত ঘটনাবলী তাহারই নমুনা।

দশম শ্রেণী। শিক্ষিকা রচনা লিখিবার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, কি করিয়া বিষয়বস্তুর সূত্র

'অবতারণা' ও 'সমাপ্তি' করা যায়, তাহা ছাত্রীদের অধিকাংশেরই কল্পনা শক্তির বড়া ছোঁয়ার মধ্যে আসে না। তাই তাহারা প্রথম পংক্তি হইতেই বিষয়ালোচনা সুরু করিয়া অকস্মাৎ এক সময় সমাপ্তির রেখা টানিয়া নিষ্কৃতি পায়। কিছুদিন বিষয়বস্তু বাদ দিয়া শুধু অবতারণা ও সমাপ্তি লেখানো অভ্যাস করাইলে হয় তো বা তাহারা ইহার বিশেষত্বটুকু ধারণা করিতে পারিবে, এইরূপ অনুমান করিয়া শিক্ষিকা এ বিষয়ে প্রধানা শিক্ষিকার অভিমত জানিতে চাহিলেন। তিনি অনুমোদন করায় এই পথেই একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন স্থির করিয়াছেন। সুতরাং সেদিন বাড়ীর কাজের নির্দেশ দিবার সময় ছাত্রীদের 'বাংলার কৃষক' সম্বন্ধে রচনার শুধু সূচনা ও সমাপ্তি লিখিয়া আনিতে বলিলেন। তাহারা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল —বিষয় বস্তু সম্বন্ধে কিছু লিখিব না? শিক্ষিকা বলিলেন—না।

দুইদিন পরের কথা। প্রধানা শিক্ষিকা আগামী কাল হইতে ছাত্রীদের বাড়ীর কাজের খাতা দেখিবেন জানাইয়াছেন। কোন দিন কোন শ্রেণীর কোন বিষয়ের খাতা দেখিবেন, তাহাও সুনির্দিষ্টরূপে জানা গিয়াছে।

দ্বিতীয় ঘণ্টা—নবম শ্রেণী। পাঠনীয় বিষয়ের আলোচনা শেষ হইবার পর শিক্ষিকা যখন বাড়ীর কাজের ব্যবস্থা দিতেছিলেন, তখন ছাত্রীদের মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন— তোমাদের কি কিছু বলবার আছে? একটি বালিকা সসঙ্কোচে বলিল আগামী কালের জন্য বাড়ীতে লেখার কাজ না দিলেই ভাল হয়। শিক্ষিকা বিস্মিতা হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? ছাত্রীরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। শিক্ষিকার মনে হইল, তাহাদের নীরব মুখে যেন একটা চাপা হাসির ঝিলিক ক্ষণেকের জন্য রেখা দিয়াই মিলাইয়া গেল। পুনরায় জিজ্ঞাসার উত্তরে তাহারা টুকরা টুকরা কথায় যাহা বলিল, তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, প্রথম ঘণ্টায় শিক্ষক মহাশয় তাহাদের নূতন খাতা কিনিয়া তাহাতে গত মাসের প্রতি সপ্তাহের একটি তারিখ দিয়া চারিটি ইংরাজি অনুচ্ছেদের সন্ধিসমাস ও শুদ্ধি করিয়া বাক্য ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া আনিতে বলিয়াছেন। এরূপ নির্দেশের কারণ ও উদ্দেশ্য যে ছাত্রীদের নিকট গোপন নাই, চাপা হাসি ও স্খলিত বাক্যই তাহার প্রমাণ।

তৃতীয় ঘণ্টা—অষ্টম শ্রেণী। অসম্মানের কাঁটা মনের মধ্যে বিঁধিয়াছিল, তাই একটু বিষণ্ণ চিত্তেই শিক্ষিকা বাড়ীর কাজের ব্যবস্থা দিতেছিলেন। কিন্তু অবাঞ্ছনীয়কে ঠেকানো গেল না। ইহারা চাপা হাসি হাসিল না, কোন সঙ্কোচও করিল না, আবদারের সুরে শুধু আপত্তি জানাইল। কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজেরাই যে কৈফিয়ৎ দিল, নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের বক্তব্যের সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। একজন অসন্তুষ্ট সুরে বলিল—একদিনে এত সব করবো কি করে? অপর একজন সহজ সমাধান করিয়া বলিল—দাদার খাতা দেখে নকল করে আনবো।

কোন রহস্যপ্রিয় দেবতা যেন দিনের আলোকে কালো করিয়া দিবার উদ্ভট রসিকতায় মাতিয়াছেন। কিন্তু শিক্ষিকার অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণতা আসিল কয়েক মিনিট পরে। এখন টিফিন, নিভৃতে বসিয়া একবার বিষয়টির গার্হস্থ্যিক রূপ অনুধাবন করিয়া দেখার চেষ্টা করা যাইতে পারে। বিশ্রাম কক্ষের দরজা ভেজান ছিল। বাহির হইতে কে জিজ্ঞাসা করিল—ভিতরে আসবো?—এসো, শিক্ষিকা সচেতন হইয়া বলিলেন। দশম শ্রেণীর দুটি ছাত্রী প্রবেশ করিল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল— কাল যে রচনার শুধু সূচনা আর সমাপ্তি লিখে আনতে বলেছেন, তাই কি লিখে আনবো, না বিষয়বস্তু শুদ্ধ পুরোপুরি রচনা লিখে আনবো?

শিক্ষিকার মাথা হইতে পা পর্যন্ত অব্যক্ত যন্ত্রণার অনুভবে ক্ষণেকের জন্য যেন বিমূঢ় হইয়া গেল। পরক্ষণেই গম্ভীরভাবে শুধু বলিলেন—না; যেমন বলেছি সেই রকম করেই লিখে আনবে। ছাত্রীরা চলিয়া গেল।

প্রধানা শিক্ষিকার খাতা তলব করা অষ্টম ও নবম শ্রেণীতে যে প্রতিক্রিয়া আনিয়াছে, শিক্ষিকা ইতিপূর্বে তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন। দশম শ্রেণীও যে এ বিষয়ে অনবহিত নহে, তাহা বুঝা গেল। তাহারা বুঝিয়াছে যে শিক্ষকগণ শুধু যে তাঁহাদের কর্তব্যে অবহেলা করেন তাই নয়। অবহেলিত ছাত্রীদের সাহায্যেই আবার চুপকামের ব্যবস্থা করিতেও লজ্জা বোধ করেন না। শিক্ষিকার নিকট হইতে এই জাতীয় কোন সাড়া পায় নাই বলিয়াই হয় তো তাহাদের কিশোর মন তাঁহার প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধান্বিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু খটকা লাগাইয়াছে বিষয়বস্তু বাদ দিয়া রচনার শুধু সূচনা ও সমাপ্তি লিখিবার নির্দেশ। পঞ্চদশ অভিজ্ঞতা তাহাদের বুঝাইয়াছে যে ইহা কাঁকিরই নামান্তর, ধরা পড়িয়া গেলে কর্তৃপক্ষের নিকট অপরাধী বলিয়া গণ্য হইতে হইবে। তাই তাহারা উপযাচক হইয়া আসিয়াছে তাঁহাকে রক্ষা করিতে।

ষান্মাসিক পরীক্ষা। ছাত্রীরা যাহাতে পরস্পরের সাহায্য লইতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রীদের পাশাপাশি বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তদুপরি সর্বক্ষণের জন্য গার্ড ও আকস্মিক গার্ডের ব্যবস্থাও আছে।

দুটি কক্ষ মুখোমুখি, তৃতীয়টি একটু ভিতরের দিকে। শিক্ষিকা যে গৃহের গার্ড ছিলেন, তথা হইতে প্রথম গৃহের অভ্যন্তর ভাগের অধিকাংশ এবং অপর গৃহের একাংশ দেখা যায়। শিক্ষিকা লক্ষ্য করিলেন প্রথম গৃহের ছাত্রীরা অবাধে পরস্পর প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছে এবং একে অপরের খাতা দেখিতেছে। যে শিক্ষক মহাশয় গার্ড ছিলেন, তিনি সম্ভবত এই অমূল্য সময়টুকু বৃথা যাইতে না দিয়া নিজের অব্যক্ত পরমব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন।

দ্বিতীয় কক্ষের কার্যকলাপ যে ইহা হইতে বেশি আকর্ষণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এ গৃহের গার্ড মহাশয় পরার্থে আত্মোৎসর্গকারী কর্মযোগী ধ্যানী বুদ্ধ নহেন। কিন্তু সংকাজে বাধা অনেক। শিক্ষিকা যে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছেন, একটি ছাত্রী তাহা কাহাকেও জানাইয়া যাহা বলিল, অনুচ্চ কণ্ঠ হইলেও এ গৃহ হইতে তাহা স্পষ্টই শোনা গেল। সুতরাং ইহা যে গৃহাভ্যন্তরের গার্ডের শ্রুতিগোচর হয় নাই, এ রূপ অনুমান করিবার কোন পথ নাই। অর্থাৎ তাঁহার অনুমোদনক্রমেই এমন একটা কিছু তথায় হইতেছে, যাহা অপর গৃহের গার্ডের নজরে না পড়াই ভাল। শিক্ষিকার কৌতূহল উদগ্র হইয়া উঠিল। ক্রমশ তিনি বুঝিতে পারিলেন উক্ত গৃহের গার্ড ছাত্রীদের যথেচ্ছচারিতা শুধু অনুমোদন করিয়াই কর্তব্য সমাপন করেন নাই, যথাসাধ্য সহায়তাও করিতেছেন। ইহার চরম রূপ প্রকাশ পাইল তৃতীয় দিনের পরীক্ষায়। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহার বাহিরের কোন প্রশ্নের উত্তর বলিয়া দিবার জন্য ছাত্রীরা অপর একজন শিক্ষককে ডাকিয়া দিবার অনুরোধ জানাইলে আকাঙ্ক্ষিত গার্ড মহাশয় যখন এবার আকস্মিক গার্ডরূপে আবির্ভূত হইলেন, তখন কল্পতরু গার্ড মহাশয় সবিনয়ে তাঁহাকে ছাত্রীদের আবেদন জানাইলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য তাঁহাকে গৃহটির একাধিপত্য দিয়া নিজে বারান্দায় পায়চারি করিয়া কাটাইবার কষ্ট স্বীকার করিয়া লইলেন। যে দাতার ডান হাতের দান বাম হাত পর্যন্ত জানিতে পারে না, তিনিই প্রকৃত দানবীর। কল্পতরু মহাশয় তাহা জানিতেন, তাই হয় তো তথায় উপস্থিত থাকিয়া দাতার পুণ্যফল খণ্ডিত করিতে চাহেন নাই।

সপ্তাহব্যাপী পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। এবার খাতা দেখার পালা। শিক্ষিকা দশম শ্রেণীর বাংলা দ্বিতীয় পত্রে নম্বর দিতে গিয়া দেখিলেন, দ্বিতীয় গৃহে যে সকল ছাত্রীর পরীক্ষার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল, ভালমন্দ নির্বিশেষে তাহারা সকলেই ব্যাকরণে ও রচনানুবাদে প্রায় পূর্ণ নম্বর পাইয়াছে। সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে জনান্তিকে গুঞ্জরণ শোনা গেল, দ্বিতীয় গৃহের সার্ড মহাশয় বোর্ডে অঙ্ক করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তাহারা তো বেশি নম্বর পাইবেই।

• • • •

পরীক্ষার সময় যাহার নিকট হইতে সাহায্য পায়, ছাত্রীরা স্বভাবতই তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হয় এবং যে সকল শিক্ষকশিক্ষিকার তত্ত্বাবধান থাকার জন্য তাহারা এরূপ সাহায্য হইতে বঞ্চিত হয় তাহাদের প্রতি রুষ্ট হইয়া মনে করে অন্যায়রূপে অতিরিক্ত কড়াকড়ির মধ্যে তাহাদের পরীক্ষা দিতে হইয়াছে। ইহার অবধারিত ফল স্বরূপ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি ঘোলাটে হইয়া যায় এবং পরীক্ষার অশ্রদ্ধা জন্মে। তা ছাড়া শিক্ষা প্রচেষ্টায় শৈথিল্যের ইহা যে প্রধান কারণগুলির অন্যতম, এরূপ অনুমান করিলে আশাকরি ভুল হইবে না।

শিক্ষিকার অভিজ্ঞতার খাতায় এরূপ অনেক চিত্রই সঞ্চিত আছে। কিন্তু দায়িত্বহীনতার পরিচয় পাইবার জন্য বা ফলাফল বিচারের জন্য সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। মাতা পিতা এবং শিক্ষক—প্রধানত ইহাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেই যে বালক-বালিকার চরিত্র গড়িয়া উঠে, ইহা অস্বীকার করা চলে না। মাতাপিতার দায়িত্বের প্রকৃতি ও পরিমাণ আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। শিক্ষকের দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যত্রতত্র যে ভাবে পালন করিয়া থাকেন, সেইদিকে শুধু অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব। ইহার ফল সুদূরপ্রসারী। শিক্ষকগণের মিথ্যাচার ও কর্তব্য কর্মে অবহেলা, তাঁহাদের নীতিবিরুদ্ধ কাজ ও অন্যায়ের প্রশ্রয় দান প্রভৃতি দেখিয়া ছাত্রছাত্রীরাও মিথ্যাচারী, কর্তব্য-বিমুখ ও ন্যায়নীতিবোধশূন্য উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে। পরীক্ষায় অশ্রদ্ধা শিক্ষায় গুরুত্ববোধে হানি ঘটায়। বিদ্যার পরিচয় দিয়া নয়, অনুপায় অবলম্বন করিয়া পরীক্ষা-সরণী পার হইবার শিক্ষা তাহারা এমনি করিয়াই অর্জন করে। ইহার পর যখন তাহারা শিক্ষিতের শিলমোহর লইয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুয়ার পার হইয়া সংসারে প্রবেশ করে, তখন পুঁথির বিদ্যা পুঁথিতেই আবদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু হাতে কলমে যে বিদ্যা তাহারা শিখিয়াছে, প্রত্যক্ষ পরিচয়ের মধ্য দিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে তাহাদের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হয় না। সত্য মিথ্যা ন্যায় অন্যায়ে সমদর্শী, কর্তব্যে অনাসক্ত, সকল শ্রদ্ধাভাজনের প্রতি বিতৃষ্ণায় বিরাগী হইয়া ও চালাকিতে অতিসিদ্ধি লাভ করিয়া তাহারা তখন পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন সমাজদেহের প্রতি রোমকূপ ইহাদের সাত্ত্বিক স্পর্শে, আনন্দে নয়—আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠে।

শিক্ষকগণের দায়িত্বহীনতার মূলে যে বহুতর দুর্লঙ্ঘ্য কারণ বিদ্যমান, তাহা অস্বীকার করা যায় না বটে, তবু মনে হয় এইরূপ হীনতা ও হীনতার পথে চালিত হইবার বিরুদ্ধে সমবেত শক্তিতে দণ্ডায়মান হইবার প্রয়োজনীয়তা অপর সকল প্রয়োজন হইতে বেশি। যাঁহাদের আদর্শে সমাজ গড়িয়া উঠিবে, তাঁহারা যদি এ বিষয়ে সচেতন না হন, সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয় তো কোন মানবীয় শাস্ত্রেই মিলিবে না।

ভাষা-সমস্যা—হ্রস্ব উচ্চারণ

[শ্রীআদিনাথ সেন]

সকালে ঘুম হইতে উঠিয়াই মাষ্টার মহাশয়ের কর্ষণত 8 A.M.এ পড়িতে বসিতে হয় এবং 4 P.M. পর্যন্ত স্কুলে পড়ার জের চলে। ইহাদের অর্থ কি, বোধ হয় বলা হইয়াছিল, মনে নাই। এই হ্রস্ব চিহ্নের কি দরকার ছিল, জানি না। স্কুলে অ্যামিতি পাঠের সময়, শেষকথা Q.E.F. বা Q.E.D. না লিখিলে কেন সমস্ত ভুল হইয়া যাইবে, এখনও তাহাদের অর্থ না জানায়, বুঝিতে পারি না। ইতিহাসে A.D.,B.C. কিছু বুঝিতে পারি। কিন্তু প্রথমে A.B.C.D. ভুল করিয়া এ ভাবে লেখা হইয়াছে, মনে হইত। অঙ্কে L.C.M., G.C.M. কোনটি কি, তাহা হঠাৎ বলিতে পারি না। তবে ক্লাসে কালিদাস মিশ্রকে কেলো বলিয়া ডাকিতে সুবিধা হয়। 'সিপু', 'ঘিশু', মিঠু পুড়িয়া যাইতেছে, ফিরিয়া শোও, ইহা অলসের সংক্ষিপ্ত ভাষা। কিন্তু আজকাল দেখা যায় যে সংক্ষেপে সারিবার চেষ্টায়, অনেক বিষয় বোধের অতীত হইয়া গিয়াছে। আগে হাওড়া স্টেশনে থ্রি আপ; টু ডাউন; এই সব কথা শুনিয়া মনে হইত যে স্টেশন কর্তৃপক্ষের যাহা মর্মগত, তাহা কেন সাধারণের বুঝিতে মুস্কিল হয়, তাহা তাহাদের ধারণাতেই আসে না। ট্রেনে উঠিয়া প্রায়ই শোনা যায় D.V.O, আজকাল খবরের কাগজ, প্রাচ্যে সেপ্ট, P.T.I; E.M.T., এবং পাশ্চাত্যে U.N., NATO., ইত্যাদিতে ভর্তি। কতক লোক এই সকল বোঝে, অথবা সকল লোক ইহার কতক কতক বোঝে। U.K, USSR, USA ইত্যাদি দেশের নাম বরং ভূগোল পড়ার কালে পরিচিত ছিল, তবু এখন সংখ্যার আধিক্যে সময় সময় গুলাইয়া যায়। ইদানীং W.H.O. নাকি অনেক ভাল কাজ করিতেছে। যাহারা সৎকাজে ব্যস্ত তাহাদের পক্ষে আত্ম-গোপনের চেষ্টায়, নাম সংক্ষেপ করিবার কোন কারণ ছিল না। D.D.T. কিনিতে গিয়া অনেক খুঁজিয়া না পাইয়া, নিশ্চিই আপিসকে Department of Dirty Tricks বলিয়া গালাগাল করিতে শুনিয়াছি। দেশী নাম হ্রস্ব করিয়া ইংরাজী লিখিতে গেলে ভাষাপ্রসাদের মাদ্রাজী নাম শামু হইয়া যায়। কিছুনি আর একজন প্রসিদ্ধ লোকের নামের হ্রস্ব উচ্চারণ। একজন তাহার বাড়িতে পাওনাদারের বিজ্ঞপ্তির জন্য NAT., Nothing left after taxes, দরজায় টাঙাইয়া দিয়াছিল। 'হ্রস্ব করার শেষ কথা, D.I.A., D—n it all.

———

পুস্তক পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা। শ্রীচিত্তরঞ্জন গুহ ও শ্রীমতী শান্তি দত্ত প্রণীত। নলেজ হোম, ৫৯ বর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ৪৮০ পৃষ্ঠা। আট টাকা। আষাঢ় ১৩৬০

গ্রন্থকারদ্বয় কৃতী ছাত্র, অভিজ্ঞ শিক্ষক, এবং মধুরী লেখক। ইঁহাদের রচনা যে সরল, সহজবোধ্য এবং শিক্ষার্থীদের উপযোগী হইবে, সে কথা বলা বাহুল্য, বিশেষ করিয়া যখন অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা পরিচিতি, সুপরিচিত অধ্যক্ষ দিজেন্দ্র মোহন সেন মহাশয়ের ভূমিকা এবং বিষজ্জনের অনুকূল অভিমত অগ্রে বহন করিয়া এই পুস্তক পাঠকসমাজের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

আমরা সে প্রশংসার পুনরুক্তি করিব না, শুধু এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে সে প্রশংসা ইঁহাদের অবশ্যপ্রাপ্য।

আলোচনাপ্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলা ভাল। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান নামই তো সুন্দর ছিল। 'কয়েক পাতা' নামে বিষয়ের প্রকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু ৪৮০ পৃষ্ঠাকে 'কয়েক পাতা' বলা চলে কি? গ্রন্থকারেরা অবশ্য যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত নামই পরে বজায় রাখিয়াছেন। ভাষা সম্বন্ধে বলি যে, বিজ্ঞানের ভাষা সহজ ও সরল তো অবশ্যই হইবে, কিন্তু বুদ্ধিপ্রধান চিন্তাপ্রধান ভাষা না হইয়া যদি ভাবাপ্রধান ভাষা হয় তাহা হইলে বিষয়ের অনুপযোগী হইবে, ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিত বলিয়া মনে করি। আর একটি কথা: এরূপ গ্রন্থে এবং আমাদের পরিচয়ের দিক দিয়া ইংরেজী উদ্ধৃতি ও ইংরেজী শব্দের প্রাচুর্য অবশ্যই থাকিবে, তথাপি দুই এক স্থলে লেখকেরা আর একটু অবহিত হইলে ভাল ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি। ২২৯ পৃষ্ঠায় আছে 'জিনিষটা মনোযোগের উপর ঘা দেয় (striking)।' মনোযোগের উপর ঘা দেয়, না, মনের উপর ঘা দেয়?—কয়েক পংক্তি পরেই আছে, 'আকস্মিকতা (suddenness)।' ইংরেজী শব্দটি দেওয়ার কি বিশেষ প্রয়োজন ছিল? তার তিন পংক্তি পূর্বে আছে, 'নতুনত্ব (novelty)'—এখানেও ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে।

পরিভাষা সম্বন্ধেও দুই একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। ৯ পৃষ্ঠায় অন্তর্গত (Instinctive) —'সহজ' বলিলে কি ঠিক হইত না? Hereditary শব্দে যাহা বোঝা যায়, Instinctive কথাটিতে তাহা বোঝায় না। ২৮৫ পৃষ্ঠায় 'একটু বড় হলে' ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (Pre-school stage) দিয়া; ৩০৮ পৃষ্ঠায় অবসাদকে boredom বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, কোথাও অবসাদকে fatigue বলা হইয়াছে।

পুস্তকখানিতে আর দুইটি বিষয়ের প্রতি লেখকদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই—ইংরেজী উদ্ধৃতির প্রাচুর্য যেন মনে হয় মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, আর মুদ্রাকর প্রমাদও সেইমত।

মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সরল রচনাপ্রণালী অবশ্যই আমাদের প্রশংসনীয়, এবং আলোচ্য পুস্তকখানির উপযোগিতা সর্ববিষয়ে, সুতরাং অধিকতর উপযোগিতার জন্য কতকগুলি বিষয়ে লেখকদ্বয়কে অবহিত হইতে বলি।

সমাজ ও শিশুশিক্ষা। শ্রীমতী প্রতিভা গুপ্ত। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা-১২। ২২৮ পৃষ্ঠা। দাম পাঁচ টাকা। ১৯৫২।

অধ্যাপিকা এই পুস্তকখানিতে বিশেষ করিয়া শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শিশু শিক্ষার ধারা, সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রগতি, অবাধ খেলাধূলা, স্বাস্থ্য-নীতি শিক্ষা, ছড়া, সঙ্গীত, গল্প -ও অভিনয়ের দ্বারা এবং চিত্রাঙ্কন ও সৃজনাত্মক কাজের দ্বারা শিশুর বিকাশ, শিশুর লিখন, পঠন ও গণনা শিক্ষা এবং ধর্মশিক্ষা—নানা দিক দিয়া সুন্দরভাবে সু-সমঞ্জস আলোচনা করা হইয়াছে। ভাষা সুন্দর ও সহজ, এবং রবীন্দ্রনাথের রচনা হইতে নানা উদ্ধৃতি বিষয়োপযোগী হইয়াছে।

দুই একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। ১৩৪ পৃষ্ঠায় পাশ্চাত্য দেশের প্রগতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও আকাশবাণী (A.I.R.) যে এদিকে অবহিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত। ব্রতচারী ও মন্টিসেরী সম্বন্ধে উল্লেখের অভাবও অনুভব করিয়াছি। বিশেষ করিয়া পঞ্চম অধ্যায় সম্বন্ধেই এসব বলি।

যাঁহারা শিশুবিদ্যালয় পরিচালনা করেন অথবা নিজেদের বাড়ীতে শিশুদের দেখাশোনা বৈজ্ঞানিক মতে করিতে চান তাঁহাদের পক্ষে এই বইখানি বিশেষ উপযোগী হইবে।

দি

ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—২ রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন ৮ কোটী টাকা

গৃহীত মূলধন ৪ কোটী টাকা

আদায়কৃত মূলধন ২ কোটী টাকা

সংরক্ষিত তহবিল ৭৫ লক্ষ টাকা

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান এবং মালয় দেশের বড় বড় সহরে এবং হংকংএ ও লণ্ডনে এই ব্যাঙ্কের শাখা আছে এবং পৃথিবীর সর্বত্রই এজেন্সীর ব্যবস্থা রহিয়াছে। ভারত ও ভারতের বাহিরে সর্বত্র ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের সুব্যবস্থা আছে।

জি, ডি, বিড়লা
চেয়ারম্যান

বি, টি, ঠাকুর
জেনারেল ম্যানেজার

পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক (শিল্প বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যরূপে অনুমোদিত (বিজ্ঞপ্তি নং ২২ টি. বি. ২৯:১১।৫০ দ্রষ্টব্য)

ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দমোহন গুপ্ত প্রণীত

কথা-শেখা

দেখা যায় বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দিতে যথেষ্ট সময় অপব্যয় হয়। অথচ বাক্যানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসারে ছবি ও বস্তুর সাহায্যে অতি অল্প সময়েই বর্ণপরিচয় ও বাক্যগঠন প্রণালী শেখানো যাইতে পারে।

'কথা-শেখা' বইখানিতে তিনরঙা চিত্রের সাহায্যে বর্ণপরিচয় ও বাক্য গঠনের জন্য অক্ষরের পরস্পর সাদৃশ্যকে ভিত্তি করিয়া সুললিত ছন্দে বর্ণযোজনা করা হইয়াছে। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিশুরা অক্ষর চিনিয়া সহজ বই পড়িতে পারিবে। গতানুগতিক ভাবে যেখানে ছয় মাসেও শিশুদের কিছু শেখানো যায় না সেখানে দুই মাসেই শিশু নিজে নিজে সহজ বই পড়িতে পারিবে।

যুক্তাক্ষর বর্জিত মধুর গল্প, মন ভোলান ছড়া ও পাতায় পাতায় রঙিন ছবি বইখানির বৈশিষ্ট্য। দাম মাত্র চৌদ্দ আনা।

দি সিটি বুক কোম্পানী

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-১২

অশ্বান

তেজস্কর ও বলবর্ধক

দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্যে পরম রসায়ন

অশ্বানের নিয়মিত সেবনে
দৈনন্দিন ক্ষয় পূর্ণ হইয়া
দেহ ও মন তেজোদৃপ্ত হয়

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

ডায়াপেপ্‌সিন্

হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ করান উচিত নহে।
যাহাতে পাকস্থলী কিছু বিশ্রাম পায় সেরূপ কার্য্যই করা উচিত।
ডায়াপেপ্‌সিন্ সেই কার্য্যই করিবে। পাকস্থলীর কার্য্য কতক
পরিমাণে ডায়াপেপ্‌সিন্ বহন করিবে এবং খাদ্যের সারাংশ
লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলেই
পাকস্থলীও বল লাভ করিবে ও তখন খাদ্য
হজম করা আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য
হইবে না। ডায়াপেপ্‌সিন্ ঠিক
ঔষধ নহে, দুর্ব্বল পাকস্থলীর
একটী প্রধান সহায়ক
মাত্র।

ইউনিয়ন ড্রাগ
কলিকাতা—১২

শিক্ষা

১১শ বর্ষ | কার্তিক ১৩৬০ | ১২শ সংখ্যা

আলোচনা

শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা বিস্তার ও বেকার সমস্যার সমাধান

কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিয়াছেন ৮০,০০০ শিক্ষক নিয়োগ করিয়া দেশের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিবেন, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্তের বেকারসমস্যার ও কিছু পরিমাণে সমাধান হইবে। এই শিক্ষকদের বেতনের শতকরা ৭৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন, বাকি রাজ্যসরকারকে চালাইতে হইবে। এই সব বিদ্যালয় গ্রামে বা সহরের উপকণ্ঠে খোলা হইবে।

এই পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫৪ সনের প্রথমেই ১০,০০০ দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করিবেন। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনায় কলিকাতায় ও বিভিন্ন জেলার মিউনিসিপাল এলাকায় ১০০০টি নূতন সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র খুলিবার কথা আছে। চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতার জন্য ৪০০ ও অন্যান্য জেলায় ৫০০ সমাজ শিক্ষা-কেন্দ্র (বয়স্কদের জন্য) এই মোট ১,০০০ কেন্দ্রের জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন। এই পরিকল্পনা কতটা কার্যকরী হয় তাহা দেখিবার বিষয়।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা অতি উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, আমরা আশা করি এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর দুর্দশার সাময়িক লাঘব হইবে। শিক্ষকগণ প্রথমে তিন বৎসরের জন্য কাজ পাইবেন; তিন বৎসর পরে অবস্থা বুঝিয়া হয় এই পরিকল্পনারই আনুবৃত্তি করা হইবে, না হইলেও যাঁহাদের কাজ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে, তাঁহারা কোন স্থায়ী কাজে বাহাল হইবেন। এই স্কীমে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ শিক্ষক ৫৫৲ টাকা; আই-এ, আই-এস্ সি পাশ ৭০৲ টাকা; বি-এ, বি-এসসি ৮৪৲ টাকা; এম-এ, এম-এস্ সি অথবা বি. এ অনার্স ১০০৲ টাকা বেতন পাইবেন।

এই শিক্ষকদের জন্য প্রথম দুই বৎসর ৬ সপ্তাহ করিয়া ট্রেনিং দিবার ব্যবস্থা হইবে। অবশ্য ট্রেনিং কালেও পুরা বেতন পাইবেন। মোটামুটি হিসাবে দেখা যায়, এই দশ হাজার শিক্ষক যদি তিন বৎসর উপযুক্ত যত্নসহকারে কাজ করেন, তবে আমাদের দেশের অনেকগুলি গ্রামে শিক্ষার আলোক বিকীর্ণ হইবে। বেকার সমস্যার সমাধান সহজ কাজ নয়, এই পথে তাহার কিছুটাও যদি দূর হয় তবে

আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ বাঁচিয়া যাইবে। ম্যাট্রিক হইতে আরম্ভ করিয়া বি-এ পাশ বহু নরনারী আজ বেকার। তাহাদের সম্মুখে কোন পথ নাই, আজ যদি সরকারের এই সংস্থাটি কার্যকরী হয় তবে কর্তৃপক্ষ দেশের এক পরম দুর্গতির অবসান করিবেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রবিক্ষোভ

আমরা ভাদ্র সংখ্যায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আন্দোলন সম্পর্কে লিখিয়াছিলাম। কার্তিক সংখ্যা লিখিতে বসিয়া দেখিতেছি, পারদীয় অবকাশের পরও অবস্থার পরিবর্তন হয় নাই, বরং অবনতি হইয়াছে। ছাত্র আন্দোলন মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে, এখন সহরের দুর্বৃত্ত সম্প্রদায় এই বিক্ষোভের সুযোগ লইয়া যে অশান্তি ও উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে সহরের জীবন বিপর্যস্ত হইয়াছে, লোকের প্রাণের আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। শিক্ষার কথা তো ছাড়িয়াই দিই, স্বাভাবিক কাজকর্ম, চলাফেরা সব বন্ধ। এই পরিস্থিতি ভাবিবার বিষয়। দেখিতেছি, পাটনা বক্তৃতা সভায় পণ্ডিত নেহেরু বলিতেছেন, ছাত্র-জীবন প্রস্তুতির সময়, তাহারা এই সময়ে যদি ভুল পথে গিয়া অথবা দাবী করে এবং তাহার ফলে নিজেদেরই কল্যাণের পথে বিঘ্ন ঘটায়, তাহা হইলে তিনি তো নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। তাহাতে ছাত্রদেরই ক্ষতি। কিন্তু ক্ষতি শুধু কি ছাত্রদেরই? আর তাহাতেই কি এই উচ্ছৃঙ্খলতার, এই বিক্ষোভ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটিবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃ-পক্ষ, ছাত্রসমাজ ও ছাত্রদের অভিভাবক এই তিনে মিলিয়া আজ মীমাংসার উপায় বাহির করিতে হইবে, আর দেরি করা চলে না।

ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা-সফর

কেন্দ্রীয় সরকারের আনুকূল্যে, শিক্ষা বিভাগের পরিচালনায় ৮০০ আটশত ছাত্রছাত্রী শিক্ষা-সফরে বাহির হইয়াছে। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, পাটনা, কলিকাতা, সব বড় বড় সহরের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠান, ও স্থানীয় বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি পরিদর্শন করিবে। কেন্দ্রীয় সরকার আংশিক ব্যয়ভার বহন করায় ছাত্রছাত্রীদের মাথাপিছু ১০৲ টাকা মাত্র দিতে হইয়াছে। এই টাকায় তাহারা উত্তর ভারতের প্রায় সব বড় বড় সহরই ঘুরিয়া দেখিবে। দেশভ্রমণ ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না, ইহার মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নাই। এইরূপ ভ্রমণের সুযোগ ছাত্রছাত্রীর জীবনের অমূল্য সম্পদ। যাঁহারা এই সুযোগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের আমরা অভিনন্দিত করিতেছি। দেশের মাটি স্পর্শ করিলে শুধু চলে না, দেশের মানুষ ও তাহার জীবনযাত্রার সঙ্গে ইহাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় হউক।

সৌরাষ্ট্রে লোকভারতী

সৌরাষ্ট্র ভারতের অন্তর্গত গুজরাতের একটি ছোট প্রদেশ। সৌরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রী নানাভাই ভাট কিছুদিন আগে সরকারি কাজ ছাড়িয়া দেন। শুনিয়াছি, নিজের আদর্শ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার সুযোগ সুবিধার জন্যই তাঁহার এই পদত্যাগ। সম্প্রতি কয়েকটি আদর্শবাদী শিক্ষাব্রতীকে লইয়া তিনি লোকভারতী নামে একটি শিক্ষায়তনের বুনিয়াদ স্থাপন করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বোচ্চ আদর্শ এই শিক্ষায়তনের আদর্শ। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের, এবং অনাড়ম্বর জীবন ও সৌন্দর্যের সমন্বয় সাধন করা এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। সংঘর্ষের স্থানে সামঞ্জস্য স্থাপন, ভারতীয় সংস্কৃতির যাহা বিশেষ অবদান, তাহা হইবে লোকভারতীর ছাত্রদের সাধনার বিষয়।

জনসাধারণের জীবন পরিশ্রমের জীবন। মনের ধর্ম যেমন চিন্তা করা, বিচার করা, দেহের ধর্ম তেমনই পরিশ্রম করা, হাত-পা খাটানো। এই দেহের পরিশ্রম যদি বাস্তবিক ফলপ্রসূ হয়, তবে

সমাজের কল্যাণ হইবে, বুদ্ধিজীবি ও শ্রমজীবির মধ্যেকার কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়া যাইবে। সেজন্য লোকভারতীর কর্মসূচীতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের নিত্যকর্মের মধ্যে শারীরিক পরিশ্রমের কাজকে খুব বড় জায়গা দেওয়া হইবে।

জীবনকে পূর্ণতার পথে লইয়া যাওয়া, শান্তিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস করাই তো শিক্ষার উদ্দেশ্য। সেজন্য অন্নবস্ত্র, আশ্রয়ভূমি, স্বাস্থ্য ও আনন্দ, জীবনের পূর্ণতা সাধনের এই প্রধান চারিটি প্রয়োজন সাধনের দিকে লোকভারতীর দৃষ্টি থাকিবে। বিশেষভাবে গ্রামের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রামের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই শিক্ষায়তন কাজ করিবে।

এই শিক্ষা বুনিয়াদী শিক্ষারই অগ্রগতি, সেজন্য বুনিয়াদী বা উত্তর-বুনিয়াদী পাশ ছাত্র পাইলেই ভাল হয়, নতুবা স্কুল ফাইন্যাল বা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ছাত্রকে প্রবেশার্থীদের জন্য গৃহীত একটি নির্বাচনী পরীক্ষার পর মনোনীত করা হয়। এই নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রবেশার্থীর সাধারণ জ্ঞান, সামাজিক মনোভাব, আচার ব্যবহার ও রুচির বিচার করিয়া দেখা হয়। এই পরীক্ষার জন্য ছাত্রকে দুই এক সপ্তাহকাল শিক্ষকদের সঙ্গে বাস করিতে হয়।

এখানকার শিক্ষা বাস্তব জীবনের শিক্ষা, সেজন্য ব্যবহারিক শিক্ষাপদ্ধতি জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া কাজের মাধ্যমে পরিচলিত হয়। (১) কৃষি, গোপালন, সুতা কাটা, কাপড় বোনা; (২) গ্রামীন ইঞ্জিনিয়ারিং ও মলসেচ, অথবা (৩) গ্রামের স্বাস্থ্য ও 'হাইজিন', এই তিনটির যে কোন এক বিষয় ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য। দিনে চার পাঁচ ঘণ্টা এই বিষয়গুলির জন্য এবং ইহা ভিন্ন অন্য সমাজসেবার কাজের জন্য হাতে কলমে খাটিয়া দিতে হইবে। এই বাস্তব কাজের মধ্যেই তাহার শিক্ষার বুনিয়াদ রচিত হইবে ও চরিত্র গঠিত হইবে। হাতে-কলমে শিক্ষার ফল সে গ্রামের কাজে, গ্রামবাসীর সেবার প্রয়োগ করিবে। ছাত্র স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের যেটি গ্রহণ করিবে তাহা ব্যতীত তাহাকে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মাতৃভাষা এবং ইংরেজি বা সংস্কৃত অথবা ভারতীয় অপর কোন ভাষা শিখিতে হইবে। উচ্চ শিক্ষা ব্যতীত জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতি সম্ভব নয়, তাই কৃষির মাধ্যমে ইহারা উচ্চ শিক্ষার সকল দিকেই দৃষ্টি দিয়াছেন।

ছাত্র দিনে পাঁচ ঘণ্টা খাটিয়া যাহা উপার্জন করিবে তাহা হয় তাহার ছাত্রবেতন নয়ত খাওয়া খরচের জন্য ধার্য হইবে—ইহাতে পিতামাতার ব্যয়ভার আংশিক ভাবে লাঘব হইবে। সরকার খরচের অর্ধেক বহন করিবেন, বাকি অর্ধেক দেশবাসী বহন করিবেন। খরচের বিষয়ে একটি কথা উল্লেখযোগ্য। গ্রামের জন্য পরিকল্পিত এই শিক্ষায়তনে গৃহ আসবাব প্রভৃতি সবই গ্রাম্য পরিবেশে, গ্রামের জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া নির্মাণ করা হইতেছে, কিন্তু তাহা যাহাতে সুদৃঢ় অথচ মনোরম, কালোপযোগী অথচ অনাড়ম্বর, একদিকে কৃষিকার্যের উপযুক্ত অন্যদিকে আনন্দদায়ক হয়, সেদিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দিতেছেন। কাজেই প্রাসাদোপম গৃহ প্রভৃতি নির্মাণের বালাই অথবা খরচ নাই। ইহারা আশা করেন যে প্রাথমিক খরচের পরে বৎসর বৎসর ছাত্রদের জন্য যে ব্যয় হইবে তাহার সবখানি না হইলেও অনেকখানি ছাত্রেরা নিজেরাই সংগ্রহ করিবে।

লোকভারতীর পরিকল্পনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্পর্ক। মনে হয় এ বিষয়ে ইহারা আমাদের প্রাচীন গুরুগৃহের আদর্শকেই সম্মুখে রাখিয়াছেন। যিনি গ্রামের জীবনকে বরণ করিয়া, গ্রামের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ, শিক্ষকতাকে নিজেরই শিক্ষার বিকাশ মনে করিয়া ছাত্রের মধ্যে নিজের আদর্শের পরিপূর্ণতা দেখিবার জন্য এই পথে আসিবেন, তাঁহাকেই ইহারা

শিক্ষকপদে মনোনীত করিবেন। শিক্ষকের জীবনে নূতন জীবন লাভ করিয়া যেন ছাত্রসমাজ কল্যাণের পথে চালিত হয়, আচারে ব্যবহারে, সংযম ও শীলে যেন তাহারা নূতন ভারতের বুনিয়াদ রচনা করিতে পারে।

লোকভারতী সবে চারি মাস কাজ করিয়াছে, পরিকল্পনাটি তিন বৎসরের, আমরা আশা করি ইহাদের পরীক্ষা সফল হইবে, তিন বৎসরে ইহারা যতটা অগ্রসর হইতে পারিবেন, ততটাই দেশের লাভ।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

বিগত অক্টোবর মাসের শেষাশেষি, কার্তিকের গোড়ায় জয়পুরে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের উনত্রিংশ অধিবেশন হইয়া গেল। মাতৃভূমির জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য প্রভৃতির সঙ্গে প্রবাসী বাঙালীর যোগ রক্ষায় ও ভাবের আদান প্রদানের উদ্দেশ্যেই এই প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরি উপলক্ষে বাহিরে ঘুরে থাকিলেও বাঙালী মনে প্রাণে বাঙালী, স্বয়ম্ভূখো তাহার মন। দীর্ঘ দিন প্রবাসে থাকিতে গিয়া অনেকে সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দায় পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাদের কথাবার্তায় প্রবাসের সুর ফুটিয়া ওঠে, খাওয়া-দাওয়া জীবন যাত্রার রীতিনীতিতে অনেকখানি বাহিরের প্রভাব পড়িতে বাধ্য, কিন্তু সংস্কৃতির জগতে প্রবাসী বাঙালীও নিতান্তই বাঙালী। তাই এই সম্মেলনগুলি প্রবাসী বাঙালীর অতি আনন্দের জিনিস।

অন্য দিকে, এই সম্মেলন শুধু বাঙালীর সঙ্গে বাঙালীর মিলনের জন্য নয়, সারা ভারতের যেখানে বাঙালীরা বসবাস করিতেছেন এই উপলক্ষে সেখানকার অধিবাসীদের বাঙলা ও বাঙালীর শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ভারতের প্রদেশগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন নয়। পরস্পরের মধ্যে বহু মিল ও সাদৃশ্য আছে, একের অন্যের কাছ হইতে অনেক কিছু দেওয়া ও নেওয়ার আছে, এই সকল সম্মেলন পরস্পর প্রীতি ও সৌহার্দের, ভাবের ঐশ্বর্যের বিনিময়ে সার্থক উৎসবে পরিণত হয়। যে বৃহত্তর ভারত আজ আমাদের কাম্য, তাহার ভিত্তিভূমি রচিত হইবে এই সব কল্যাণকর অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া। সর্বভারতের সঙ্গে বাঙলা দেশের যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক তাহাকে দৃঢ় ও মধুর করিয়া তুলিতে পারিলে শুধু যে বাঙালীর কল্যাণ হইবে তাহা নয়, সমস্ত ভারতবাসীর কল্যাণ হইবে। কিন্তু বাঙালীকে আত্মবিস্মৃতির হাত হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে, তাহার সাহিত্য শিল্প, তাহার লোকসংগীত, তাহার শিক্ষা দীক্ষা, ত্যাগ ও বীর্য ভুলিলে চলিবে না। একদিন যে বাঙালী সকল বিষয়ে অগ্রণী ছিল, স্বাধীনতার বাণী যাহার কণ্ঠে সর্বাগ্রে উচ্চারিত হইয়াছিল, আজও সে তাহার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে, যদি সে তাহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও সর্বভারতীয় সংস্কৃতিকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে।

সম্মেলনের অভিভাষণ

মূল সম্মেলনের উদ্বোধন কালে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস প্রাচীন ঐতিহ্যসমৃদ্ধ রাজস্থানের মধ্যমণি এই জয়নগরের সঙ্গে বাঙালার ঐতিহাসিক সম্পর্কের কথা তুলিয়া বলেন যে, এই সুন্দর নগরটি নির্মাণেও বাঙালীর হাত ছিল, বাঙলার সাহিত্য ও সাহিত্যিকগণ রাজস্থানবাসীকে নানা ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আজও বাঙালী যদি মাতৃভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় ভাষার উন্নতি ব্যাপারে অগ্রণী থাকেন তবে সমগ্র দেশের পক্ষে কল্যাণ হইবে।

মূল সভাপতি শ্রীমহেশ দাস বাঙলা সাহিত্যের শাশ্বত সাধনার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, বাঙালী কোথাও প্রবাসী নয়, ভারতের রাজ্যে রাজ্যে তার সাহিত্যের গতি, তার প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় সাহিত্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়। সেই মহান সর্বভারতীয়

ঐতিহ্যের যোগ্য উত্তরসাধক হওয়াই এই নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আকাঙ্ক্ষা। রাজস্থানের বীরত্ব কাহিনী, মারাঠার শৌর্য বীর্যের গাথা বাঙলা সাহিত্যকে যুগে যুগে প্রেরণা দিয়াছে, বাঙালীর মনে দেশপ্রেমের জোয়ার আনিয়াছে, দেশের জন্য আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে, অবসাদ ও জড়তা দূর করিয়া সারা ভারতকে এক মিলনের রাখিবন্ধনে বাঁধিয়াছে।

বাঙালী লেখক নিপুণ লেখনীতে মর্মস্পর্শী ছবি আঁকিয়া সারা ভারতের অন্তরাত্মাকে আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। সাহিত্যের মধ্য দিয়া ভারতের জীবনদর্শন, সর্বভারতীয় সংস্কৃতি বিচিত্র রূপে রসে রঙে বিকশিত হইয়া উঠিলে বাঙলা ভাষা সমৃদ্ধ হইবে, বাঙালী জাতি আপনার অন্তরের বাণী খুঁজিয়া পাইবে, সারা ভারতের কল্যাণে বাঙালীর মনীষা সার্থকতা লাভ করিবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীঅবনীকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি কথা আমাদের বিশেষ ভাবে ভাল লাগিয়াছে। "বাঁচিবার জন্য ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে গিয়া যখন গৃহহারা বাঙালীকে প্রবাসী হইয়া বাস করিতেই হইবে, তখন প্রাদেশিকতার মনোবৃত্তি মুছিয়া ফেলিয়া স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত অভিন্নভাবে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে। তবেই তাঁহারা অবাঙালীদের নিকট সমাদর পাইবেন, মিলনের পথ প্রশস্ত হইবে।" আমাদের মনে হয়, প্রবাসী বাঙালী যদি নিজের শিক্ষা দীক্ষা ঐতিহ্যের অভিমানে স্থানীয় অধিবাসীদের দূরে দূরে রাখিয়া নিজেদের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেন, তবে প্রদেশে প্রদেশে মিলনের সেতু ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিবে, প্রশস্ত হইবে না এবং ফলে উভয়েরই ক্ষতি। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার, শিক্ষার নূতন পরিকল্পনা ইত্যাদি সূত্রেই বাঙালী রাজস্থানে প্রথম সমাদর ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বাঙালীর বহু কৃতপ্রতিষ্ঠ কৃতী সন্তান রাজস্থানের শিক্ষা-বিভাগে যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। তাঁহারা বাঙলার সংস্কৃতি অব্যাহত রাখিয়া ঐদেশের হিতকর নানা কার্যের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছেন।

আমাদের বিশ্বাস, প্রবাসী বাঙালীরা যদি শক্তি সঞ্চয় করেন, তবে দেশের ও প্রবাসের নানা সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন, কেননা অংশের শক্তি সমগ্রের শক্তির উৎস, এক অংশ সতেজ ও সবল হইলে সমগ্রের উপর তাহার প্রভাব পড়া অনিবার্য।

তটিনী দাস

গভীর দুঃখের সহিত বেথুন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীমতী তটিনী দাসের মৃত্যু সংবাদ জানাইতে হইতেছে। শুধু শিক্ষাব্রতী বলিয়া নয়, সমসাময়িক বলিয়া, বন্ধু বলিয়া শ্রীমতী দাসের বিয়োগ ব্যথা আরও গভীর হইয়াছে।

তটিনী দাস ৺শ্যামাচরণ গুপ্তের জ্যেষ্ঠ কন্যা। আমাদের সময়ে তটিনী গুপ্তার নাম ঘরে ঘরে, শিক্ষানুরাগী সুধীজনের মুখে মুখে ফিরিত। মেয়েদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন উচ্চ স্থান অধিকার করেন। ম্যাট্রিকুলেশন, আই. এ, বি. এ, এবং এম. এ—সবগুলি পরীক্ষায় ইহার কৃতিত্ব আমাদের পরম গৌরবের ছিল। পরবর্তী জীবনে বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ায় তিনি নিজের কলেজের সেবা ও তাহার মধ্য দিয়া মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিতে পারিবেন মনে করিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। দীর্ঘকাল ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকিয়া মেয়েদের শিক্ষার ও সমাজের নানা রকম সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত ছিলেন। অধ্যক্ষপদের গুরুত্ব ও সাংসারিক নানা কর্তব্য পালনের জন্য তিনি নিজের চিন্তা ও

অভিজ্ঞতার কথা লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল, দেশবাসী তাঁহার নিকট যাহা আশা করিত, তাহা পূর্ণ হইতে পারিল না। তাঁহার শোকার্ত আত্মীয় পরিজনদের আমরা গভীর সমবেদনা জানাইতেছি।

নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলন

আগামী বড়দিনের বন্ধে কলিকাতায় নিখিল ভারত শিক্ষাসম্মেলনের ২৮-তম বার্ষিক অধিবেশন হইবে। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও ডাঃ রাধাবিনোদ পাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ডাঃ কে. জি. সৈয়াদীন মূল সম্মেলনের সভাপতিত্ব করিবেন। বয়স্কশিক্ষা বিভাগের সভানেত্রত্ব করিবেন শ্রীমনাথনাথ বসু। এবারকার সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মাধ্যমিক, বৃত্তিমূলক ও বয়স্কশিক্ষার আলোচনা হইবে—শিক্ষার সকল স্তরেই আজ নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, এই সম্মেলন যদি সেই সব জটিলতা বিবেচনা করিয়া পথ নির্দেশ করিতে পারেন তবেই উহা সার্থক হইবে।

প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান সমস্যা

(পঠন ও লিখন)

[শ্রীসুবোধকুমার সেনগুপ্ত]

প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান সমস্যা সম্বন্ধে ইতিপূর্বে শিক্ষাপত্রিকাতে আলোচনা করা হয়েছে, কি করে বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দিতে পারা যায়, সে সম্বন্ধে সেখানে উদাহরণসহ উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু যে আত্তীয় কর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট পাঠের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তা বৎসরের প্রথম ভাগেই অর্থাৎ মার্চ মাসের মধ্যেই শিশুদের আয়ত্ত করে ফেলা উচিত। তাহলে বৎসরের আর বাকি ন'মাস কি করে তারা পঠন-লিখন শিক্ষা করবে তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। যে আত্তীয় কর্মের কথা সেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল, সেই আত্তীয় কর্মে শিশুদের আগ্রহ যদি তখন পর্যন্ত কেন্দ্রীভূত থাকে তাহলে শিশু সেই আত্তীয় কাজ করে যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, তার কারণ কর্মের মাধ্যমে শুধু পঠন, লিখন, অঙ্ক সেখানে উদ্দেশ্য নয়, কর্মের নিজস্ব শিক্ষামূলক সম্ভাবনার জন্যই শিশুরা সেই সমস্ত কর্মগুলি করে যাবে। আপাত দৃষ্টিতে সেই কর্মগুলি সমস্যার শিক্ষার দিক হতে উদ্দেশ্যমূলক না হলেও কর্ম হিসাবেই সেগুলির মূল্য শিশুজীবনে যথেষ্ট। কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুদের মাংসপেশীগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সেই জন্যই শিশুরা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী যদি ছবি আঁকা, কাগজ কাটা, মাটি দিয়ে পুতুল ও অন্যান্য দ্রব্য তৈয়ারি করা, বা মাটির জিনিসে রং করার কাজ করতে চায় তাহলে তাতে শিক্ষকের যথেষ্ট উৎসাহ থাকবে। ক্রমে কঠিন পাঠও যে সেই সমস্ত কর্ম হতে তৈরি না করা যায়, তাও নয়। তবে পুনরুক্তির সম্ভাবনা তাতে থাকে যথেষ্ট। পুনরুক্তির ফলে শব্দগুলির দৃশ্যরূপ শিশুমনে বিভিন্নে যাওয়ারও প্রয়োজন আছে। কিন্তু শব্দের পুনরুক্তি যেখানে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়, সেখানে সেই সমস্ত শব্দসম্বন্ধীয় পাঠ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়, কারণ

অত্যধিক পুনরুক্তি শিশুরা পছন্দ করবে না। তাহলে ওদের জন্য কর্মমূলক পাঠের কি ব্যবস্থা করা যায়?

মাটি দিয়ে পুতুল গড়া বা হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠোকা যেরূপ কর্ম, প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করাও সেরূপ কর্ম। পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে শিশুরা বহু জিনিস শিক্ষা করে। কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের অনেক বস্তু কি এবং কেন, শিশুর জানা থাকলেও কিংবা শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনার ফলে পরিবেশ শিশুর পরিচিত হলেও, প্রথমে পরিবেশের একটি অংশকে পঠন ও লিখন শিক্ষা দেবার জন্য ব্যবহার করা উচিত হবে। সমগ্র প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর একবারে পাঠ রচনা করে পঠন লিখন শিক্ষা দিতে গেলে পাঠদান বিফলতায় পর্যবসিত হবার সম্ভাবনা আছে, তার কারণ পঠন ও লিখন শিক্ষা দেবার জন্য যেমন পাঠ রচনায় বাক্যের মধ্যে পরিচিত শব্দ থাকা প্রয়োজন, তেমনি সেই পরিচিত শব্দগুলি বারবার বিভিন্ন বাক্যে ব্যবহৃত হওয়াও প্রয়োজন। বিরাট পরিবেশে বিভিন্ন ইউনিট সংক্রান্ত পাঠ শিশুদের পরিচিত শব্দ দ্বারা রচিত হলেও প্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তির অভাবে প্রথম অবস্থায় শব্দগুলির মূর্তরূপ শিশুমনে বিভিত্তে বসবে না, ফলে বহু শব্দ একবারে শিখতে গিয়ে শিশু নানা অসুবিধার মধ্যে পড়বে। পরিবেশের গাছ, পুকুর, বাগান, মাঠ, বাড়ী ঘর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ইউনিটে পরিচিত বাক্যের কাঠামোর মধ্যে নূতন শব্দ শেখাবার যদি বন্দোবস্ত করা যায়, তবে তাকে পঠন লিখন শিক্ষা দেবার পথ সুগম হবে। এখন পরিচিত বাক্যের কাঠামো বলতে কি বোঝায়, তা নীচে ব্যাখ্যা করা হল।

পূর্বের কর্মগুলি অনুসরণ করার ফলে, ধরা যাক, শিশুরা লিখতে ও পড়তে শিখেছে, 'আমি আম পেড়েছি'। তারপরে পরিবেশ পরিচিতির পর পরিবেশের আমগাছকে অবলম্বন করে পরিচিত বাক্যের কাঠামোর মধ্যে অনায়াসে শব্দ যোজনা করে তিন্নার্থক বাক্য রচনা করা যায়, এবং তাতে শিশুদের শেখাতে খুব বেশি কষ্ট হয় না। যদি আমগাছকে অবলম্বন করে পাঠ রচনা করা যায়, 'আমি আমগাছ দেখেছি', তাহলে শিশুদের শিখতে খুব কষ্ট হবে কি? আংশিক পরিচিত বাক্যের কাঠামোর মধ্যে নূতন পরিচিত শব্দ যোজনা করে নূতন পাঠ তৈরি হল, শিশুদের পড়তে বা লিখতে শিখতেও খুব যে অসুবিধা হল তাও নয়, আর নূতন শব্দসম্বলিত নূতন বাক্য শিখতে আগ্রহের অভাবও বোধ করলনা।

প্রাকৃতিক পরিবেশকে এভাবে পঠন লিখন শিক্ষাদানে ক্রমশ কঠিন পাঠরচনার কাজে লাগান যেতে পারে। পরিবেশ পরিচিতিতে শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের অন্ত থাকে না। অতএব সেদিক থেকেও পাঠরচনার মূল নীতি ব্যাহত হল না। প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও শিশুর পঠন লিখনের আগ্রহ অন্যভাবে জাগ্রত করা যেতে পারে।

শিক্ষক শিক্ষিকা যেমন কতকগুলি হাতুড়ি, পেরেক, রং, তুলি, মাটি, কাঁচি, কাগজ, তকলি তুলা ইত্যাদি দিয়ে শিশুদের জন্য কর্মের পরিবেশ রচনা করে শিশুদের আগ্রহ বর্ধিত করে দিয়ে তাদের পড়া ও লেখার প্রতি প্রবণতার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি শিক্ষক যদি আরও নূতন নূতন কর্মের পরিবেশ সৃষ্টি করেন, তাহলে পঠন লিখনের বিষয়বস্তুর আর অভাব ঘটে না। এখানে বিশেষ ভাবে বলে রাখা দরকার যে, যেসকল কর্মের কথা পরে উল্লেখ করা হবে, সেগুলি দেখতে অনেকটা Project বা সমস্যামূলক কর্মের মত মনে হলেও ঠিক Project নয়। কারণ Project-এর ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিশুদের সমবায় আলোচনার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, সেই অবস্থা এখানে সৃষ্ট হবে না। Project-এ কর্মপরিকল্পনায় শিশুদের থাকে

সম্পূর্ণ দায়িত্ব, এখানে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ইঙ্গিত দ্বারা নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিশুদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে রেলগাড়ীর কথা। রেলগাড়ীর Project দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর শিশুরা পরিচালনা করবে, তার পরিকল্পনা করবে, পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করবে, আর সর্বশেষ যা কিছু তারা করল তারও সমালোচনা শিশুরাই করবে। কিন্তু এত কাজ ও দায়িত্বের ভার কি প্রথম শ্রেণীর অনিয়ন্ত্রিত মাংসপেশীযুক্ত শিশুদের উপর দেওয়া চলে? নিশ্চয়ই নয়, তার বড় কারণ তার maturation হয় নাই, দ্বিতীয় কারণ এই বয়সের শিশুমন এখনও কোন বড় কাজের জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি। অতএব কাজের বেশির ভাগ শিক্ষককেই করে দিতে হয়, বাকি কাজটুকু শিশুরা শিক্ষকের ইঙ্গিতেই করে থাকে। শিক্ষক কার্ডবোর্ড এবং অন্যান্য বাজে জিনিস দিয়ে রেলগাড়ী এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় জিনিস তৈরি করে দেখিয়ে দিলে শিশুরা সেগুলি দেখে দেখে রেলগাড়ী, লাইন, ইঞ্জিন, সিগনাল, স্টেশন, টিকিট ইত্যাদি তৈরি করবে। ঐরূপ অল্পবয়স্ক শিশুদের তৈরি জিনিস হয়তো দেখতে মোটেই সুন্দর হবে না, কিন্তু তাতেও শিশুরা মোটেই দমবে না। নিজেদের তৈরি জিনিস তাদের যথেষ্ট আনন্দ বর্ধন করবে, শিশুদের আগ্রহ ও ঔৎসুক্য উদ্রেক করতে রেলগাড়ী কম নয়, অতএব সেই সংক্রান্ত লেখা পড়ার কাজ শিশুরা আনন্দে করবে, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই।

রেলগাড়ী সম্বন্ধে কয়েকটি পাঠের নমুনা দিয়ে দেওয়া হল।

পাঠ ১

আমরা রেলগাড়ী দেখব।
দাদা রেলগাড়ী দেখাবেন।
আমরা রেলগাড়ী দেখব।

পাঠ ২

আমরা রেলগাড়ী খেলব।
আমরা রেলগাড়ী তৈরি করব।
রাম লাইন তৈরি করবে।
বাপী টিকিট তৈরি করবে।

পাঠ ৩

আমরা রেলগাড়ী রেলগাড়ী খেলব।
আমরা রেলগাড়ী চালাব।
রাম টিকিট বেচবে।
বাপী রেলগাড়ী চড়বে।
সে টিকিট কিনবে।

এ ভাবে শিশুদের উপযোগী রেলগাড়ী সম্বন্ধে অনেক পাঠ তৈরি করা যায়। মনে রাখতে হবে শিশু চতুর্থ মাসে এরূপ খেলা খেলছে, তার কর্ম ও পড়া-লেখার অভিজ্ঞতা অনেকটা হয়েছে, সেই অবস্থারই পাঠগুলি দেওয়া হল।

এই রকমভাবে নানা ইউনিটের কর্ম মারফত শিশুদের পঠন ও লিখন শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। সংখ্যার ধারণা এবং সাধারণ মৌখিক যোগ-বিয়োগও শিশুরা শিখতে পারবে।

প্রথম শ্রেণীর উপযুক্ত আরও কয়েকটি project জাতীয় কর্মের ইউনিটের কথা এখানে উল্লেখ করা হল। শিক্ষক শিক্ষিকা এই জাতীয় কর্ম শিশুদের সাহায্যে পরিচালনা করে শিশুদের বক্তব্যগুলিকেই কতগুলি পাঠের রূপ দিয়ে শিশুদের পঠন ও লিখন শক্তির বৃদ্ধিতে সাহায্য করিতে পারেন। সাধারণ যোগ-বিয়োগ অঙ্কও তাতে প্রচুর ভাবে থাকবে। শিক্ষক শিক্ষিকা অনায়াসে সাধারণ কর্মের ভেতর দিয়ে শিশুমন হতে অঙ্কভীতি নিরসন করতে পারেন। সে যাহোক, এখন কর্মের ইউনিট গুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল।

(ক) পুতুলের বাড়ী (খ) পুতুলের দোকান (গ) পুতুলের বিয়ে (ঘ) চিড়িয়াখানা (ঙ) গোয়ালঘর (চ) হাঁস ও মুরগি পালন (ছ) ফল ও শাকসব্জি (জ) দোকানঘর।

শুধু যে project জাতীয় কর্মের মাধ্যমেই শিশুদের পঠন লিখন শিক্ষা দেওয়া যায়, তা নয়। শিশুরা প্রতিদিন যে যে খবর তাদের শ্রেণীতে এসে বলবে, সেই খবরগুলিকেই একটু অদল বদল করে পাঠ হিসাবে শিক্ষক শিক্ষিকা বড় কাগজে বড় বড় করে লিখে শ্রেণীকক্ষে টাঙিয়ে রাখবেন। শিশুরা ঐগুলি পড়বে ও লিখবে। তাছাড়া শিশুদের কাছে গল্প বলে, সেই গল্প খুব সংক্ষিপ্ত অথচ শিশুদের পঠন লিখন ক্ষমতা অনুযায়ী করে বোর্ডে লিখে দিতে পারেন। শিশুরা ঐ সংক্ষিপ্ত গল্প পড়তে ও লিখতে আনন্দ বোধ করবে। তাছাড়া গল্প নাটকে রূপায়িত করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলে শিশুরা অভিনয় সংক্রান্ত নিজস্ব অংশটুকু পড়তে ও লিখতে ত শিখবেই, অন্যের অংশটুকুও আগ্রহাতিশয্যে শিখে নেবে। বলা বাহুল্য গল্পকে এমনভাবে নাটকে রূপায়িত করা উচিত হবে যে, শ্রেণীর প্রতি বালকবালিকাই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে। সেরূপ ব্যবস্থা না হলে অন্তত পক্ষে বিভিন্ন দলে দুই তিনটি নাটকাভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। নাটকাভিনয় ছাড়াও শিশুরা কবিতা ও ছড়া আবৃত্তি, গান ও ছন্দাঙ্গভঙ্গীর সাহায্যেও পঠন লিখন শিক্ষা করে থাকে। প্রথম শ্রেণীর শিশুরা সমস্ত রকম কর্ম মারফত যতগুলি নূতন শব্দ শিখা করে তা নিয়ে যদি তারা একটা অভিধান প্রস্তুত করতে পারে, তাহলে খুব ভাল হয়।

প্রথম শ্রেণীর শিশুদের লিখন পঠনের বিভিন্ন কর্মমূলক অভিজ্ঞতা ও আনন্দপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে শিশুরা পড়তে ও লিখতে শিখবে; এবং এইরূপ অভিজ্ঞতার মধ্যে লেখা ও পড়ার সম্ভাবনা যে প্রচুর ভাবে বর্তমান তা সহজেই বোধ হয় সকলে স্বীকার করে নেবেন। শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থার উৎকর্ষ স্বীকার করে নিয়েও এ সম্বন্ধে আরও একটু আলোচনা করতে পারা যায়। প্রথম কথা হচ্ছে যে সকল বিভিন্ন কর্মের ইঙ্গিত এখানে দেওয়া হল, তাদের কার্যকরী করা কতটা সম্ভব তাই বিচার্য। শুধু কর্মের পরিকল্পনা কার্যকরী করা নয়, সমস্ত কর্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট পাঠগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সমস্ত কাজ বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-মণ্ডলীর দ্বারা সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব কি না তা ভাববার বিষয়। এঁদের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা সংক্রান্ত ট্রেনিং খুব কম শিক্ষক শিক্ষিকাই পেয়েছেন এবং যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরাও সুযোগের অভাবে তাঁদের অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ভালভাবে করতে পারছেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় শতকরা ৯৯ জন শিক্ষকই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থার নূতন কর্মপদ্ধতিতে অনভিজ্ঞ। তাঁদের উপর কি পুস্তকহীন শিক্ষার মত এক গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হচ্ছে? অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে "ছবির বই" অন্তর্গত যে সকল পুস্তক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, সে সকল বই থেকেই শিক্ষক একখানি বেছে নিয়ে শিশুদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন। ফলে অবস্থা আরও জটিলতর হয়েছে। যে বইগুলি শুধু ছবির বই হিসাবেই অনুমোদিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবগুলি বই পাঠ্যপুস্তক হিসাবে কখনই অনুমোদিত হতে পারে না। যে সমস্ত বই বর্তমানে শিক্ষকগণ প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক হিসাবে তালিকাভুক্ত করে থাকেন তাদের মধ্যে অনেকগুলিই পাঠ্যপুস্তক রূপে অবাঞ্ছিত, এ বিষয়ে সন্দেহের বোধ করি অবকাশ নেই। তাছাড়া নতুন ধরনের যে সব পুস্তক ছবির বইয়ের তালিকার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলি শিক্ষক নূতন শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে পড়াতে পারছেন না। এই যখন অবস্থা, তখন প্রথম শ্রেণীতে লিখন পঠনের পাঠদানের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়?

আমার নিজের মতে বর্তমান অবস্থার পটভূমিকায় প্রথম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক যারা প্রয়োজন। পদ্ধতি ও শিশুচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ শিক্ষককে শুধু নির্দেশ দ্বারা বা "শিক্ষণ ব্যবস্থা-কার" সাহায্যে পুস্তকহীন শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়া চলতে পারে না। তাহলে পাঠ্যপুস্তক কিভাবে রচিত হবে, তাও এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। শিশুর শিক্ষাই যেখানে বড় কথা, সেখানে শিশুর আগ্রহের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর আগ্রহ কি কি কর্মে কেন্দ্রীভূত হয়, তা আমাদের কিছুটা জানা আছে। অতএব তাদের উপর নির্ভর করেই পুস্তক রচনা সুরু করতে হবে। শিশুর উদ্ঘাপিত কর্মকে অনুসরণ করে পাঠ রচনা করলে উহা আদর্শ স্থানীয় হয়, কিন্তু সেরকম ব্যবস্থা যেহেতু কার্যকরী হবার উপায় নেই, সেই হেতু মনের ভাল হিসাবে আগ্রহকে খুঁজে বের করে পাঠ্যপুস্তক লিখতে হবে।

———

বানান ভুল ও তার প্রতিকার

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়

ভাষা ব্যবহার দুক্ষেত্রেই চলে, নির্জনে এবং জন-সমাবেশে।

নির্জনে যা একা একা যখন আমরা ভাষা ব্যবহার করি, তখন তা স্মৃতিকে সাহায্য করে, কল্পনাময়ী মনকে মুক্ত করে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সামনে চিন্তাকে প্রত্যক্ষরূপে বা ছবির চেহারায় তুলে ধরে।

একের অধিক লোকের মধ্যে যখন আমরা ভাষা ব্যবহার করি, তখন তার কাজ কয়েকটা দিকে বয়ে চলে। তখন আমরা বলি, শুনি, লিখি, পড়ি এবং ভাবি। তবে ভাবনার অংশটা কম।

বলা-লেখা-পড়া তিনের প্রধান কাজ প্রতীকের সঙ্গে পরিচয় করা। এই চিন্তা-প্রতীক যার যত বেশি সহজে সৃষ্টি হয়, ভাষা আর চিন্তা সম্বন্ধে তার তত বেশি নিপুণতা।

বানানের প্রধান কাজই এই প্রতীককে ঠিক মতো ব্যবহার করা। লেখার যেমন বানান, বলার তেমনি উচ্চারণ, শোনার তেমনি ধ্বনি। উচ্চারণ, ধ্বনি আর বানান পরস্পর এক সম্বন্ধ করে রেখেছে। এ সম্বন্ধে বন্ধন নেই, প্রবাহ আছে।

উচ্চারণ অনুযায়ী আমরা স্বর ব্যঞ্জন, হ্রস্ব দীর্ঘ অক্ষরমালা গড়েছি। আর, এই লিপি আমাদের শিক্ষাতে এক ঐতিহ্য গড়ে ফেলেছে। এই ঐতিহ্যের বিরোধী হওয়া আমাদের সময়-সাপেক্ষ, কাজেই অক্ষরের রূপ বদল করা, বানান পদ্ধতিতে নতুনত্ব আনা খুব সহজ নয়। তা ছাড়া, মানুষের মুখের উচ্চারণ এত দ্রুত বদলে যায় যে চলিত উচ্চারণের সঙ্গে বানানের মিল করে চলা খুব কাজের হবে বলে মনে হয় না। পরিবর্তন প্রবাহের মধ্যেও একটা স্থায়ী-সুর বা মান খুঁজতে হয়-ই।

শব্দ বা ভাষা ব্যবহারে কেউ যদি ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে তবে অপর পক্ষও চিন্তার নানা অসংলগ্নতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছায়। এই জন্যই ধারাকে অনুসরণ করে উচ্চারণ করা এবং বানান লেখা শিক্ষা-জগতে একান্ত প্রয়োজন।

ঠিকমতো বানান লেখার পক্ষে ঠিক মতো উচ্চারণ করাই প্রথম সহায়। তারপর আমরা অভ্যাসের মারফৎ বানানের স্বয়ং-ক্রিয় দিকটিকে স্নায়ু শক্তির মধ্য দিয়ে আহরণ করব। অনেক সময়

আমরা বিধান দেই, 'যখনই বানান সম্বন্ধে গোলে পড়বে, তখনই বারবার নানাভাবে ঐ শব্দ লিখে দেখ, যেটি দেখতে ভালো বলে মনে হবে, সেইটি ঠিক বানান বলে জানবে!' এ বিধানটিতে আমরা চোখের প্রতীক স্মৃতি আর হাতের স্নায়ু-শক্তির উপর নির্ভর করি। কিন্তু নিয়মটি অনেক সময় বড় গোলমাল করে। একটি ছেলের কথা জানি, সে শব্দের অদ্ভুত-অদ্ভুত বানান লিখে বলত যে 'দেখতে তো ভালো দেখা যাচ্ছে।' অক্ষরের কোন্ বিন্যাসকে সে সুন্দর দেখে, সেইটিই এখানে ভাববার কথা। বানানের সুন্দর—বিন্যাসের সুন্দর নয়, প্রতীক আর অভ্যস্ততার পরিচিতি। কাজেই বিশেষ শব্দটি বারবার দেখা চাই, বারবার লেখা দরকার, বারবার শুনতে হবে। ধ্বনি-উচ্চারণ আর অক্ষরবোধ সমানভাবে চালাতে হবে।

এই অভ্যাস গঠনে শিক্ষকের চেয়েও সমাজের দায়িত্ব অনেকখানি। সাইন-বোর্ড থেকে আরম্ভ করে সাহিত্য-পত্র পর্যন্ত সমান ঘরে চলছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, বানান সম্বন্ধে এদের কোন অংশেই সমতা রক্ষা করে চলে না। ভাষা-ব্যবহারের এই উচ্ছৃঙ্খলতা প্রথমে রোধ করা দরকার। অভ্যাসের বন্ধন এমনি করে দৈনিক ছেলেদের নবীন-মন থেকে ভেঙে পড়ে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনেও তাদের এই সমতা লক্ষ্য করা হয় নাই। কোন বই আধুনিক বানান-নিয়মে, কোন বই প্রাচীন, কোন বই চলিত ভাষায় কোন বই সাধুতে, কোন বই প্রাচীন ধরণে, কোন বই ছাপান হয় 'লাইনো'-তে। প্রতীকের বিসর্গ ঘটানো কিশোরচিত্তের পক্ষে বড় অপরাধ। অনেক শিক্ষক এই সব ব্যতিক্রমকে বড় সমাদর দৃষ্টি নিয়ে দেখেন। সেদিন এক ওষুধ কোম্পানীর মালিককে এক প্রধান শিক্ষক ধমকে দিয়েছিলেন—

—আপনি মোর নাম 'নিলা' রেখেছেন কেন?

—আপনাকে কৈফিয়ৎ দেব কেন?

—আমার ছেলেদের ভুল-বানান দেখানো হয়।

—এ 'নিলা' সে 'নীলা' নয়। আমার কোম্পানীর নামের আদি অক্ষরগুলো জুড়ে দিয়েছি।

তিনি অর্থ-বিহীন করে জুড়েই চললেন। অথচ তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি। সমাজের লোকের এই ঔদাসীন্য সুধীজনের পরিচায়ক নয়। প্রধান শিক্ষকের মনোবৃত্তি খুব ভালো লেগেছিল। সিনেমার 'নামাবলী'-তে ও এমনি ভুল বহু থাকে। এই সব ব্যবসায়ীরা মনে করেন, 'ভুল' বানানে মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। ব্যবসায়ীদের টাকার দিকে মন, পরিমিত টাকায় অল্প পর্যন্ত হয়তো তাঁরা মানুষের মনোযোগ পান, কিন্তু কিছুদিন পর আর মনোযোগ পাবেন কিনা মনস্তত্ত্বের সেই দিকটি তাঁরা ভেবে দেখেন না। এই ইচ্ছামূলক নির্বুদ্ধিতাকে একমাত্র সরকারই বন্ধ করতে পারেন। কেবল 'গ্যাজেট' 'গঙ্গা' দেখানোতেই উৎসাহ থামিয়ে দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

বানানে ভুল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ আছে ছেলে-মেয়েদের ব্যক্তিগত দিকে।

আমরা সকলেই লক্ষ্য করেছি, লেখার সময়ে আমরা শব্দ নীরবে উচ্চারণ করি। লেখার তালের সঙ্গে প্রকাশ করবার আগ্রহ অনেক সময়ই সমান-ভাবে যায় না, বিশেষ করে প্রথম শিক্ষার্থীদের পক্ষে। প্রকাশের আগ্রহ হাতের আগে আগে জোর কদমে চলে। হাতের সঙ্গে মনের এই সমন্বয় না ঘটলেই বানানে ভুল এসে পড়ে। এটি অজ্ঞতার দরুণ ভুল নয়, অক্ষমতা জনিত। রচনা লেখা বিশেষ করে অভ্যাস করতে হয়, এই ত্রুটি সংশোধন করতে হলে। আমাদের ইস্কুল-পাঠনায় রচনার দিকটি বড় অবহেলা করা হয়, শ্রুতলিপিও উপরের দিকে থাকে না। রচনা আর শ্রুতলিপিতে ছেলেদের অভ্যস্ত করাই এ ত্রুটি সংশোধন করার প্রধান উপায়।

রচনার ভাষাও আমরা বেঁধে দেব। ছেলেদের

সাধুভাষায় অভ্যস্ত করলে এই ত্রুটি অনেকটা দেরে যেতে পারে। চলিত ভাষা দ্রুত লয়ে চলে, তা ছাড়া সে কথ্য ভাষা। হাতের চেয়ে কথার স্রোত এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। কিন্তু সাধুভাষা বিলম্বিত লয়ে চলে। ক্রিয়ার রূপের মধ্যে আমরা নির্ভাবনায় মনটা রাখতে পারি। চিন্তার দ্রুততাকে জোর করে হাতের তালে বেঁধে রাখা যায়।

কোন কোন ছেলে যেখে বানান ভুল করে গোঁয়ার্তুমি করে। তারা ঠিক বানান জানে, তবু ভুল লেখে। এর কারণ অনেক থাকলেও, কয়েকটা বেশ সহজেই ধরা যায়। প্রথম কারণ, নতুনত্ব করবার প্রয়াস। 'সন্ধ্যা' 'সন্ধা', 'দারিদ্র' 'দারিদ্র্য' দুটোই চলে, কিন্তু যেটি স্বভাবত চলে সেদিক দিয়ে তারা ঘেঁসে না। এমন এক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল, 'ও-রকম তো সকলেই লেখে!' অন্যের থেকে নিজেকে একটু পৃথক করে নেওয়ার মনোবৃত্তি থেকে তারা ভুল বানানের ফাঁদে পড়ে। এই রকম ভুলকে সারানোর ক্ষমতা মনস্তাত্ত্বিকের আছে। দ্বিতীয় কারণ, পাঠকের চোখকে অথবা আঘাত করবার প্রয়াস। তাদের আঘাত দেওয়ার যুক্তি এই ঠিক বানানের যুক্তি তারা খুঁজে পায় না বলেই। যেমন 'চক্ষু' না লিখে 'চোক্ষু' লিখল, 'দুঃখ' বদলে লিখবে, 'দুক্ষ'। আত্মসাম্যের প্রকাশ যখন তারা যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারে, তখন ঐ দিকে তাদের মন চালিয়ে দেয়; এই অভ্যাসের বশবর্তী হ'য়ে পরিশেষে তারা যুক্তির অভ্যাস প্রয়োগ না করতে পারলেও, আত্মসাম্যের বজায় রেখে যায়। মনোবিদেরা এসব সংশোধন করতে পারেন বলে দাবী করেন। কিন্তু ইস্কুলের শিক্ষকদের (আমাদের দেশে) সত্যিই তো আর এত খুঁটিয়ে দেখবার অবসর নেই। তৃতীয় কারণ, অনেক ছেলের নিজের রচনার প্রতি মমতা অত্যধিক। লেখায় কাটাকুটি করা তাদের পছন্দ নয়। রবীন্দ্রনাথও কোন অংশ কাটতে হলে ছবি করে কাটতেন। কিন্তু এরা হাত থেকে যেমনটি এল তেমনটিই রেখে যায়। এমনি করে বানানের দিকে ঠিক নজর রাখবার অভ্যাস তাদের হয়ে যায়।

ছেলেদের রচনা লেখার সময়কার মনের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে বানানের এই উচ্ছৃঙ্খলতার আরও অনেক কারণ পাওয়া যাবে। রচনা লিখতে বসে তারা চারটি অবস্থার সম্মুখীন হয়। (১) কি লিখব? (২) কেমন ভাবে লিখব? (৩) কেমন ভাবে বানান লিখব? (৪) কি রকম লিখলে লেখার বক্তব্য স্পষ্ট হবে? এই সমস্যার সমাধান করতে প্রকৃতির নিয়মে তারা সহজ পথকেই অবলম্বন করে। যেখানে বক্তব্য বড়, সেখানে বানানের দিকে তারা ঘুমন্ত। একই প্রবন্ধে দেখা গেছে, ব্যাকরণের অংশে যে-বানানটি শুদ্ধ করে লিখে গেল, অনুবাদেও সেটি ঠিকই লিখল, কিন্তু রচনা লিখতে ঐ শব্দ বহু যায়গায় ভুল করেছে। এখানে তার অজ্ঞতা বলে মনে করা যেতে পারেনা, অভ্যাসের ত্রুটিও নয়; এখানে সে ভুল করে, কারণ, তার মনের পক্ষে অত সমস্যার অভিযোজন ঘটে ওঠে না। যে পারে সে হয়ত ভালোই, কিন্তু যে পারে না সে শিছিয়ে-পড়া নয়। কিশোর-চিত্তের ক্ষমতা অনুযায়ী এই সব ভুলকে আমাদের উপেক্ষা করতেই হবে। বাক্য-গঠনের নিয়মও ভঙ্গ করে তারা ঐ একই নিয়মে।

বানান ভুলের প্রধান কারণের তৃতীয় অংশটি শিক্ষকের আচরণে।

উপরে যে-উপেক্ষার কথা বললাম, শিক্ষকের সেই মনোবৃত্তি থেকেই কিন্তু ছেলেদের ভুল করবার প্রবণতা এসে যায়। সহজমতা এবং বিরক্তি বশত আমরা এক রকমের বানান ভুল বহুস্থানে ঘটে গেলে, কয়েকটা কেটে দিই, কয়েকটা তেমনি রাখি। আমাদের সহ্য করবার অঙ্কেই তারা ভুলটা আঁকড়ে

বলে। শিক্ষকের কর্তব্য হবে, যখনই ভুল পাওয়া যাবে তখনই শুধরে দেওয়া। এমনি করে যত্নের মতো আমরা বানান ভুল কেটে যাব-ই।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষকের উচ্চারণের ত্রুটির জন্যে ছেলেরা বানানে ভুল করে বলে। একটি ছেলে 'দরিদ্র' লিখল—'দরিদ্দু', 'দিগ্বিজয়ী' হ'ল 'দিগ্যিজয়ী'। উচ্চারণের সময় বেশ করে যদি কানে পৌঁছে দেওয়া যায় অক্ষরের উচ্চারণগুলো, তবে নিশ্চিতই ফল পাওয়া যাবে। এখানে সঙ্গে সঙ্গে শব্দ-গঠন প্রকৃতি, মূল-শব্দ বিশেষ করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু বিপদও আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও বোধ হয় এই বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর দ্বিতীয় ভাগের প্রথমেই বলে নিয়েছেন—সমস্ত শব্দের মূলগত অর্থ বলতে যাওয়া ছাত্রের পক্ষেও যেমন বিপদ শিক্ষকের পক্ষেও। অনেক মূলেরই মূল আজ আর নেই। তা ছাড়া, দেখতে হবে কোন্ বয়সে শব্দ-বিশ্লেষণ বোঝা সম্ভব। বিশ্ব-কে আমরা 'ব' ফলাও বলিনা, 'ওয়াও'-ও নয়। এখানে চোখের সামনে শব্দটি তুলে ধরা ছাড়া উপায় নেই। হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরে আমরা নাচার। এই সব ক্ষেত্রেই আমাদের বানান সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা রয়ে গেছে বলে মনে হয়। কিন্তু ইস্কুলের ভেতর সে-কাজ নিশ্চয়ই নয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বানান ভুলের এইসব চরিত্রের দিকই দেখা যায় বেশি। নানা কারণে ছাত্রদের বানান ভুল শুধরে দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু ভাষার চেহারা যথাযথ বজায় রাখতে হলে, সমাজ-ছাত্র-শিক্ষককে এদিকে বিশেষ নজর রাখতেই হবে।

এতক্ষণ আমরা রচনায় বা লিখনে ছেলেরা বানান ভুল করে কেন, সে কথা কিছুটা বললাম। কিন্তু পঠনের ত্রুটির জন্যেও ছেলেরা অনেক সময় বানান ভুল করে। এ ত্রুটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া না গেলেও, এটি ছেলেদের এত ছোট বেলা থেকে জন্মে যায় যে, বড় হয়ে সে ত্রুটি সংশোধন করা শক্ত।

প্রথমত আমাদের মেনে নিতেই হবে হরফের লেখা উচ্চারণের ক্রিয়ার সঙ্গে খুব মিল রেখে চলে না। ইংরেজির যে হরফে 'আ' হয় বাংলার ঠিক সে হরফে নয়। তবু একই শব্দ আমরা ঐ ভিন্ন আকৃতির হরফ দিয়ে তো করে থাকি। কাজেই হরফের সাক্ষাৎ ঘটা মাত্র যে আমরা শব্দ উচ্চারণ ঠিক-ঠিক করতে পারব, এমন সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে হরফ আর স্বর সাপেক্ষ-প্রতিবর্ত হয়ে আমাদের মনে আসা চাই। যে-দেশে বিভিন্ন হরফের বিভিন্ন ভাষা আমাদের শিখতে হয়, সে দেশে এই সাপেক্ষ প্রতিবর্ত পদ্ধতি তেমন সহজও নয়। কাজেই কেবল হরফের সঙ্গে স্বরের যোগ বজায় করলে চলবে না, পরিবেশ-শক্তিও এখানে এসে স্থান করে নেবে। হরফ-স্বর-পরিবেশ একসঙ্গে আমাদের চোখ-গলা-মন-কে ঠিক মতো বেঁধে দেবে; তবেই আমাদের শব্দ-লেখা সফল হবে। মোটামুটি কথায় চোখকে আমাদের বিশেষ অভ্যস্ত করতে হবে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আমরা যখন পড়ি, তখন আমাদের চোখ পংক্তির উপর স্বচ্ছন্দ-গতিতে চলে না, চোখের গতি লাফে লাফে চলে। এই লক্ষন-গতিরও নিয়ম আছে। লক্ষন-গতির প্রবাহ বিশেষ-বিশেষ হরফে এসে বাধা পায়, স্থির হয়।

কিন্তু এ-ও দেখা গেছে, পরিচিত শব্দকে আমরা খুব বেশি নজর করে পড়ি না, তার সামগ্রিক চেহারা আমাদের মনে শব্দ-বোধ আনে, আমরা তখন উচ্চারণ করি। এই সময়, একটি বর্ণ উচ্চারণ করতে আমাদের যে-সময় লাগে সমগ্র শব্দটাও সেই সময়ই নেয়, বেশি নয়। একটা অর্থ-যুক্ত সাধারণ শব্দ আর একটা অর্থবিহীন শব্দ নিয়েই আমরা এ ব্যাপার পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারি।

শব্দের উপর চোখের এই চালনা সহজ-

প্রতিতেও যেমন হয় না, তেমনি সমগ্রভাবেও চলে না। শব্দের বিশেষ একস্থানে আমরা জোর দিয়ে থাকি। আর সব হরফগুলো আমাদের চোখের কেন্দ্র থেকে আড়ালে গিয়ে থাকে সেতারের ঝঙ্কারের মতো। এই খানেই বানান ভুলের ক্ষেত্র জুটে যায়। অনেক ছেলে-মেয়ে হরফের প্রকৃত উচ্চারণ যোগ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে; বাঁ-থেকে-ডাইনে চোখের চলাচল তেমন করে উঠতে পারে না; আবার এই অক্ষমতার জন্যে পড়ায় বিরক্তি জন্মে, তেমন চেষ্টা থেকেই বিরত হয়। একটি মেয়ে 'বরফ' কথাটার 'ফ' কিছুতেই মন দিয়ে দেখতে চাইত না, অথচ উচ্চারণ ঠিক করত; কিছুদিন পর তাকে 'ফ' লিখতে দিয়েছিলাম, সে প্রথমটাতে তো পারলই না, অনেক সাধা-সাধনার পর 'ফ' আর 'চ' ছাড়া-ছাড়া করে লিখল; তার আগে তিনবার 'ফ' কাটাকুটি করল, কপাল আঁচড়াল, ঠোঁটে বিরক্তির চিহ্ন দেখাল। এই বিরক্তি এলে উচ্চারণ আর বানান খুব ব্যাহত হয়।

খুব তাড়াতাড়ি যারা পড়ে তারা বানান ভুলের এই ফাঁদে পড়ে। খুব নজর দিয়ে শব্দগুলো পড়তে পারে না। চিত্তাকর্ষক গল্প এই জন্যে বানান খুব শেখাতে পারে না, কিন্তু তার মধ্যে কিছু পদপদ যদি নতুন নতুন শব্দ যোগ করা যায়, তবে তার উপর তাদের বিশেষ নজর পড়বে। ক্রত পঠন এমনি আয়াসেই রচনা করা উচিত।

আসল কথা, শব্দের মধ্যে চোখের জোর যেখানটায় পড়ে সেইটি আমরা মনোযোগ দিয়ে দেখি। বানানের কারচুপি যদি এখানে থেকে থাকে তবে সে বানানটি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম। কিন্তু অন্যত্র যদি বানান-বৈশিষ্ট্যটুকু থাকে তবে সেখানে যাতে চোখের ঐ নজরটা পড়ে তার চেষ্টা করতে হবে।

আর চোখের এই স্বভাব নির্ধারণ করতে হলেই আমাদের নানা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অভীক্ষা করে দেখতে হবে, ছোট শব্দে বেশি নজর, না বড় শব্দে? শব্দের ডাইনে-বাঁয়ে ছেলেরা কতদূর পর্যন্ত দেখতে পায়?

অনেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন—অপরিচিত শব্দ, চলতি অর্থের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত শব্দ, ব্যর্থক শব্দ, অনাবশ্যক শব্দ প্রভৃতির উপর আমাদের দৃষ্টি পড়ে। একজন শিক্ষকের কথা জানি, যিনি ইংরেজি-ব্যাকরণ পড়ানোয় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তিনি preposition-এর বিশিষ্ট ব্যবহার বড় বড় ঔপন্যাসিকের কাহিনী থেকে সংগ্রহ করতেন। কিন্তু এ তত্ত্ব আগে অভিজ্ঞ পাঠকের মনে, ছেলেদের বোধ হয় অতটা মন লাগে না।

সরব পাঠে বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি। কারণ, উচ্চারণ দৃষ্টির পিছনে পড়ে থাকে। উচ্চারণ করতে করতে দৃষ্টিটা এগিয়ে চলে, ফলে মনটা পিছনের চেয়ে সামনের দিকে থাকবার করে বেশি। যা দেখব তাই তো যত্নবৎ উচ্চারণ করছি; কাজেই দৃষ্টির দিকে মনটা পড়ে থাকে—অথচ সব মনটা দেওয়া যায় না। ফলে 'দেখা' খুব স্পষ্ট হয় না, আবছা। যাদের দর্শন প্রতীকধর্মী, তারা এ ব্যাপারে অনেকটা বেঁচে যায়। কিন্তু সরব পাঠে এ ত্রুটি থাকলেও, তাকে আমরা প্রথম দিকে বাদ দিতে পারি না। বরঞ্চ মনের সঙ্গে হরফের যোগ জন্মাতে হলে সরব পাঠ চাইও বটে।

কোন্ কোন্ ছেলের পড়া বানান-কে লক্ষ্য করে চলছে, তা অনেকটা কিন্তু তাদের চোখের ঘোরা-ফেরা দেখলে বোঝা যায়। যারা ভালো বানান করতে পারে না, তারা শব্দের ডাইনে চোখ ফেরায় আবার পিছনে চোখ টেনে আনে, শেষে মাঝ খানটাতে রেখে; কিন্তু যারা ভালো তারা চোখকে ডাইনের দিকেই চালিয়ে যায়, কেবল বিশেষ যায়গাটা একটু জোর দিয়ে দেখে

নেয়। এই নিয়মে আমরা বানান-মনোযোগী ছাত্র তৈরি করতে পারি। চোখটা যাতে সামনেই এগিয়ে চলে সেই শিক্ষাই দিতে হবে।

একটা কথা স্বীকার করব, চোখের 'ভাইনে' অর্থে আমি 'এগিয়ে' বাংলাই বলছি। উর্দু-আরবী-পার্শী-র বেলায় বিপরীত অর্থে হবে।

উচ্চারণ, লিখন, পঠন এই তিন দিক নজর করে আমরা ছেলেদের বানান বিষয়ে সতর্ক করে তুলতে পারি।

বাংলার প্রথম উত্তর-বুনিয়াদী শিক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদল

[শ্রীসুধীনচন্দ্র মাইতি]

আত্মশক্তিক্ষয়কারী পরাবলম্বী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভারতের লক্ষ লক্ষ নরনারী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতেছে, শিক্ষিত বলিয়াও গণ্য হইতেছে, কিন্তু ভারতের অন্ন ও জীবন সমস্যা জটিল হইতে জটিলতর হইয়া জীবনকে হাহাকারপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে; অন্ন ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া জনসাধারণ কোনঠাসা হইতে চলিয়াছে, অপর পক্ষে তথাকথিত শিক্ষিতগণ শোষণ ও অন্যায় শাসনে স্ব স্ব বিদ্যা জাহির করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাহাও আবার সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক নহে, আপনা আপনি কামড়াকামড়ি করিয়া দল পাকাইয়া শিক্ষিত বেকারগণ অবশ্য দুর্নীতির আশ্রয় লইয়া গ্রাম ও শহর জীবনের নৈতিক ও আর্থিক ভারসাম্য সংকট আনয়ন করিতেছেন।

এই শোচনীয় পরিণতি হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করিবার উপায় হিসাবে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী অভিনব বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ছাত্রেরা শোষণ-শাসন-হীন, জীবনের আবশ্যক অন্ন ও বস্ত্রে স্বাবলম্বী সমাজগঠনে সহায়তা করিয়া, সমাজকে নৈরাশ্য অন্ধকার হইতে স্বাচ্ছন্দ্যের আনন্দলোকে টানিয়া তুলিবে। ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক আকাঙ্খা।

১৯৩৮ সাল থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষাদান কাজ আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র সেবাগ্রাম, পরে ক্রমান্বয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে উহা ছড়াইয়া পড়ে।

বাংলা দেশে বেঙ্গল রিলিফ কমিটি এবং পরে শিশুরক্ষা সমিতির তত্ত্বাবধানে কয়েকটি শিশুসদনে উক্ত শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়।

আবাদের খাগড়া আবাসিক বুনিয়াদী বিদ্যালয় ঐ সদনগুলির মধ্যে অন্যতম। ১৯৪৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এখানে বুনিয়াদী শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে ছাত্ররা এখানকার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সেবাগ্রামে যাত্রা করে উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য। ইহারাই বাংলার সর্ব প্রথম উত্তর বুনিয়াদী দল। তাহারা ১৯৫৩ সালের জুলাইয়ে চার বৎসরের পাঠ্যক্রম সমাপনান্তে ফিরিয়া আসিয়াছে, এক বৎসর স্ব স্ব ক্ষেত্রে কাজ করিবার পর উপাধি লাভের যোগ্য হইবে, এই বৎসরে দুই জনকে সেবাগ্রাম গ্রামীন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করা হইবে, এক জনকে শান্তিনিকেতন কলাভবনে ভর্তি করা হবে। বাকি আট জন কোন প্রতিষ্ঠান বা স্ব স্ব গ্রামে গঠনমূলক কাজে ও জীবিকা অর্জনে প্রবৃত্ত হইবে। ইতিমধ্যে ছাত্রগুলির অভিভাবকগণ চিন্তা

করিতেছেন, সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতের ন্যায় ইহারা সরকারের চাকুরি কেন পাইবে না?

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সরকার যদিও এই শিক্ষায় যথোচিত সম্মান ও অধিকার দিয়াছেন, কিন্তু বাংলা দেশ অনুরূপ সম্মান ও যোগ্যতা স্বীকারে উদাসীন। উপযুক্ত কর্মী, সেবাপরায়ণ শিক্ষা-প্রাপ্ত কিশোর ছাত্রদলকে কে স্বাগত করিবে? সমাজের সুধী ব্যক্তিদের শুভপ্রাহিতার শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই কিশোর বন্ধুগণ সমাজকে শোষণ না করিয়া সেবা ও সততায় পরিপুষ্ট করিবে। স্বীয় অন্নবস্ত্র সংস্থান করার ক্ষমতা তাহারা অর্জন করিয়াছে। এখন তাহাদের সমাজের সেবা করার সুযোগ দিলে ক্ষীয়মান সমাজ উপকৃত হবে।

পুস্তক-পরিচয়

[শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন]

কৃষি বিজ্ঞান। দ্বিতীয় খণ্ড। রায় ৺রাজেশ্বর দাসগুপ্ত বাহাদুর প্রণীত। রমেশচন্দ্র দাসগুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও পরিবর্তিত। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়। ১৯৪৩। মূল্য ১০৲ টাকা। স্বর্গীয় রাজেশ্বর দাসগুপ্ত কৃষি বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কৃষি বিজ্ঞানে অনুরাগী ছিলেন এবং বাংলা ভাষায় কৃষি বিজ্ঞান লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে, দ্বিতীয় প্রকাশিত হইল। তৃতীয় খণ্ড এখনও অপ্রকাশিত। আশা করা যায়, বর্তমান যুগে বাংলা দেশে কৃষির আবশ্যকতা সমধিক উপলব্ধি করা হইবে এবং তৃতীয় খণ্ড শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

এরূপ গ্রন্থের সমালোচনা আমাদের পক্ষে এখানে সম্ভব নয়। শুধু ইহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এবং পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ডাইলজাতীয়, রাঙ্গাদি জাতীয় তৈল জাতীয়, আফিংএর মত চেষ্টজ, ধনেজিরার মত মসলা, ধান পাট প্রভৃতির মত তন্তুপ্রদ, আলুর মত কন্দ জাতীয়, নেপিয়ার ঘাসের মত পশুখাদ্য জাতীয়, ইক্ষুর মত শর্করা, রেশমের মত পশুজ প্রভৃতি, পানের মত প্রয়োজনীয় ফসল; গ্রীষ্ম, বর্ষা, ও শীতকালের সবজি; বিলাতি সবজি, কৃষিবচন সংগ্রহ, পঞ্চাশ রকমেরও বেশি ফলের চাষ সমস্তই এই খণ্ডে আছে। কোন্ মাটিতে কিরূপ চাষ দিতে হয় তাহারও ব্যবস্থা গ্রন্থকার দিয়াছেন। চাষের পরম শত্রু পোকা এবং পরম বন্ধু লাঙ্গ; এই দুই বিষয়েও প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ দেওয়া আছে। যাহারা কৃষি বিষয়ে কিছু জানিতে চাহিবেন তাঁহাদের পক্ষে ইহা নিতান্তই উপযোগী হইবে। কৃষিবিজ্ঞান এখন আমাদের শিক্ষাস্তরে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সুতরাং এরূপ পুস্তকের সমাদর হইবে বলিয়া আশা করি।

পরিশিষ্টে ফসল, সবজি ও ফল চাষের আয়ব্যয়ের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। বর্তমান কালে আয় ব্যয়ের অঙ্কে যে পরিমাণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে ইহার নির্দেশ খুব বেশি কাজে লাগিবে না তবে চাষের খরচ ও ফসলের পরিমাণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা হয়তো মোটামুটি ঠিক।

শব্দ-সূচী অবশ্যই পাঠকের কাজে লাগিবে।